বেজবরুয়াযুগের অসমীয়া সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব

[১৮৮৯-১৯৪০ খৃষ্টাব্দ]

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ, ডি উপাধির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা নিবন্ধ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
LIBRARY
RAJARAMMOHUNPUR

গবেষক

রমেন কুমার রায়

১৯৮২

[illegible]

[illegible]

[[illegible]]

ST - VERE

[illegible]

[illegible]

Ref
89.24
[illegible]

STOCK TAKING - 2011

Acc. no. 82786

23 AUG 1983

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিষয় সূচী

		পৃষ্ঠাংক
উপক্রমণিকা	—	১
প্রথম অধ্যায় অসমীয়া সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।	—	৮
দ্বিতীয় অধ্যায় যুগস্রষ্টা বেজবরুয়ার বহুমুখী সাহিত্য কৃতির পরিচয়। বেজবরুয়া যুগের অসমীয়া সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।	—	১৫
তৃতীয় অধ্যায় বেজবরুয়া যুগের সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের পরিচয়।	—	২৫
চতুর্থ অধ্যায় বেজবরুয়া যুগের অসমীয়া সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয় ও বিস্তৃত বিশ্লেষণ।	—	
(ক) কাব্য	—	৪১
(খ) নাটক	—	১৪৩
(গ) উপন্যাস	—	১৭৭
(ঘ) ছোট গল্প	—	২৪০
(ঙ) রসরচনা	—	২৬২
উপসংহার	—	২৭৫
পরিশিষ্ট		
(ক) আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত অসমীয়া গ্রন্থের তালিকা	—	২৮৮
(খ) আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা	—	২৯৪
গ্রন্থপঞ্জী	—	২৯৬

উপক্রমণিকা

উনবিংশ শতকের শেষ দুই দশক এবং বিংশ শতকের প্রথম চার দশক কালসীমার মধ্যে রচিত অসমীয়া সাহিত্যের কাব্য - নাটক - উপন্যাস - ছোটগল্প ও রসরচনা যদিও আমাদের বক্ষ্যমাণ তুলনামূলক আলোচনার বিষয়বস্তু, তবু আমরা পটভূমিরূপে অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসের একটি রূপরেখাও প্রথম অধ্যায়ে তুলে ধরে ঐ আলোচনার সূচনা করেছি। কিন্তু সূচনারও সূচনা আছে। যে দেশের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা, সেই দেশের সর্বাঙ্গীন ইতিহাসটুকুও জানা থাকা ভাল মনে হয়। কি সেই দেশের গড়ন, কি তার জাতিগত ভাষাগত বৈশিষ্ট্য, কোথায় তার স্বাতন্ত্র্য, কি তার রাজনৈতিক উত্থান পতনের স্বরূপ - এই সব বৃত্তান্তও উক্ত পটভূমিকাকে স্পষ্ট করে তুলতে সাহায্য করে বৈ কি। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, আধুনিক পর্বের সাহিত্য আলোচনার জন্য অত প্রাচীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপট টেনে না আনলেও চলে, সাহিত্যের ইতিহাসের পটভূমিই তো যথেষ্ট। তবু আমরা আসামের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এঁকে দিলাম এই উপক্রমণিকায়। এ যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় - "সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো"। (যোগাযোগ)। বলা প্রয়োজন, এক্ষেত্রে প্রবীণ ঐতিহাসিকদের পরিবেশিত তথ্যাদিই আমাদের প্রধান উপকরণ।

ভারতের পূর্ব সীমান্ত রাজ্য আসাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে রমণীয়। পর্বত, অরণ্য, উপত্যকা, সমভূমি, নদী- সব মিলিয়ে এ যেন ইংরেজ কবি স্কটের ভাষায় -

> Meet nurse for a poetic child !
>
> Land of brown heath and shaggy wood,
>
> Land of mountain and of flood.

আসামের উত্তরে চীন, পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বাংলা দেশ। এই ভৌগোলিক অবস্থান এই দেশের ভাষা ও সাংস্কৃতিক অবয়ব গড়তে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

আদি কাল থেকে এক ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন ভাষাভাষী-অধ্যুষিত দেশ ও জাতিসমূহ, তাই এর সংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটেছে চীন, তিব্বত, ভূটান, ব্রহ্মদেশ, বাংলা দেশের সঙ্গে। আসামের প্রাণপ্রবাহ ব্রহ্মপুত্র নদ আসামকে করেছে উর্বরা, তার উচ্ছল জলধারা নীচে নেমে এসে মিশে গেছে বাংলার পদ্মা-গঙ্গার বুকে। প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যে সমৃদ্ধ আসাম দীর্ঘকাল ধরে প্রলুব্ধ করেছে প্রতিবেশী দেশ সমূহের অধিবাসীগণকে। এই বহিরাগতরা তাদের নিজ নিজ সংস্কৃতি সঙ্গে এনেছিল এবং কালক্রমে তা মিলিয়ে দিয়েছিল আসামের সংস্কৃতির সঙ্গে। গড়ে উঠলো এক মিশ্র সংস্কৃতি।

পৌরাণিক যুগে এদেশের নাম ছিল 'প্রাগজ্যোতিষ', ঐতিহাসিক যুগে এর 'কামরূপ' নাম পাই। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের কবি কালিদাস প্রাগজ্যোতিষের সঙ্গে 'কামরূপ' নামেরও উল্লেখ করেছেন তাঁর 'রঘুবংশ' কাব্যে। সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বলে গেছেন - কামরূপ ছিল এক বিস্তৃত রাজ্য। দশম শতাব্দীতে রচিত 'কালিকা পুরাণে'র বর্ণনা থেকে জানা যায় - প্রাচীন কামরূপের পরিধি ছিল সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে সমগ্র উত্তর বঙ্গ অর্থাৎ কোচবিহার, রংপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমান 'আসাম' নামের উদ্ভব সম্বন্ধে পণ্ডিতরা একমত নন। 'আসাম বুরুঞ্জী'তে 'আহাম' ও 'আচাম' নাম পাওয়া যায়। স্যার এডওয়ার্ড গেইট এবং হেমচন্দ্র বরুয়ার মতে আসামের অর্থ হলো 'peerless, unparalled' - অনেকে বলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে (১২২৮ খৃঃ) 'টাই' জাতির আহোম শাখা সুকাফা নামে জনৈক রাজকুমারের নেতৃত্বে ব্রহ্মদেশের 'শান' অঞ্চল থেকে এসে এদেশে রাজত্ব স্থাপন করেন। তাই তাঁদের এদেশে বলা হত আশান, আসাম, আচাম। ডঃ বাণীকান্ত কাকতি মনে করেন 'আসাম' শব্দটি 'আচাম' শব্দের সংস্কৃত রূপ মাত্র। 'টাই'ভাষায় 'চাম' অর্থ পরাজিত, অ-উপসর্গযুক্ত হয়ে তা হলো 'আচাম' অর্থাৎ অপরাজিত। বিজেতার পরাক্রম সূচক এই শব্দটি কালক্রমে বিজিত দেশের নামে পরিণত হয়েছে। অন্যমতে উপত্যকাময় অসমতল ভূমি বলে এর নাম অ-সম, তা থেকে আসাম।

হেমচন্দ্র বরুয়া বলেন - "The principal races that have migrated into this land are Austro-Asiatics, Dravidians, Tibeto-Burmans, Mongoloids and Aryans"[1].

ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় এদের মধ্যে এদেশে প্রথম আসে অস্ট্রো-এশিয় জাতি, যাদের পরিচয় রয়েছে আসামের খাসী ও জয়ন্তীয়া পাহাড় অঞ্চলের অধিবাসীর মধ্যে। মহাকাব্য পুরাণ ইত্যাদির মতে আসামের আদি অধিবাসীরা ছিল নিষাদ, কিরাত প্রভৃতি যাদের বলা হত 'ম্লেচ্ছ' 'অসুর'। ডঃ বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া বলেন - "The earliest inhabitant of Assam spoke and Indo-Chinese language of the Mon-khmer family, which is, according to Schimdt, a branch of the Austric family of languages"[2].

কিন্তু সেই আদিভাষা এবং অনুরূপ ভাষা সমূহের সঙ্গে বর্তমান অসমীয়া ভাষার সম্পর্ক কিছু আছে কি? খাসিয়া ভাষা বা বড়ো ভাষার প্রচলন এখনো কিছু কিছু থাকলেও তা আর্য ভাষার অসমীয়া রূপের মধ্যে ক্রমেই আত্ম বিলোপ করে চলেছে। স্যার এডওয়ার্ড গেইট বলেন - "The Ahoms have abandoned their tribal dialect in favour of Assamese, and the Rabhās, Kachāris and other tribes are following their example "[3].

বাংলা এবং ওড়িয়ার মতো ভারতীয় আর্যভাষার মাগধী অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত অসমীয়া ভাষা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে সুষ্ঠীয় রূপ পেতে থাকে, অবশ্য মধ্য ভারতীয় আর্য থেকে তার প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন — একথা বলা হয়েছে রাজা ভাস্কর বর্মণের সময়ে আগত পরিব্রাজক হিউএনসাঙের বিবরণীতে। বলা বাহুল্য, ভারতীয় আর্য ভাষার অন্যতম শাখা আধুনিক অসমীয়া ভাষায় ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গেছে অস্ট্রিয়, খাসী, বড়ো, কাছারি এবং 'টাই' বা আহম ভাষার নানা বিচিত্র শব্দ। ডঃ সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন - "ভাষার দিক হইতে দেখিলে অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষার মত প্রাচীন মুণ্ডা কোন মনখ্মের ভোটব্রহ্ম নরগোষ্ঠীর (কিরাত) ভাষা প্রভাবিত প্রাচীন আর্য ভাষার অপভ্রংশ ও জটিল

সংমিশ্রণ।"[8] বাংলা ভাষা ও অসমীয়া ভাষার এই চরিত্রগত সাদৃশ্য স্বীকার করে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় - এই দুটি প্রতিবেশী রাজ্যের ভাষার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ কি ছিল ? এ সম্বন্ধে ভাষাচার্য ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন - "The common dialect in North Bengal and Assam continued as one speech, as a member of the Bengali-Assamese group of dialects. In the 15th century it split up into two sections, Assamese and North Bengali, when Assamese started on a literary career and an independent existence of its own by not acknowledging the domination of literary Bengali already established in East Bengal as well "[5].

অসমীয়া জাতির জনতত্ত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত হলো - ভারতবর্ষের জনপ্রবাহে মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর স্পর্শ একমাত্র আসাম ছাড়া কোথাও তেমন গভীর ভাবে লাগেনি। এই মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মুখাকৃতি গোল নয়, নাক চেপ্টা, গণ্ডাস্থি উন্নত, দেহ ও মুখমণ্ডল কেশবিহীন। ডঃ নীহার রঞ্জন রায় বলেন - " উত্তর পূর্ব আসামে এবং উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মিরি, নাগা, বড়ো বা মেচ প্রভৃতি লোকদের ভিতর কোচ পালিয়া রাজবংশী প্রভৃতি লোকদের ভিতর ইহাদের একটি ধারা প্রবাহ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। আসামে এই ধারা সর্বত্রই, সমাজের সকলস্তরেই প্রবহমান, তবে উচ্চ বর্ণগুলির ভিতর গোল মুণ্ড আনপাইন এবং কিছু পরিমানে দীর্ঘমুণ্ড আদি-নর্ডিক ধারাও সুস্পষ্ট। এই শেষোক্ত দুই ধারাই আসামের হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি।"[6]

আসামে আর্যদের আগমন কবে ঘটেছিল, তা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা শক্ত, তবে একথা সত্য যে অস্ট্রিক, নিগ্রোবটু, কিরাত, বড়ো, ভোটচীনাদের পরেই আর্যরা এদেশে এসেছিল। তার আগেই আর্যেতর সংস্কৃতির একটি ভিত্তি প্রথম গড়ে উঠেছিল।

ধীরে ধীরে সেই সংস্কৃতির ধারা প্রবল ও সমুন্নত আর্যসংস্কৃতির সমুদ্র সঙ্গমে এসে মিলে গেল। আর্য-অভ্যাগমের পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস এখানে আমরা সংক্ষেপে তুলে ধরছি।[৭] বরাহরূপী বিষ্ণু ও ধরিত্রীর পুত্র তথা বিদেহরাজ জনকের পালিত পুত্র নরক কিরাত রাজ ঘটককে পরাজিত করে প্রাগজ্যোতিষের রাজা হলেন এবং বিদেহ থেকে ব্রাহ্মণ নিয়ে এসে সেখানে হিন্দু ধর্মের সূচনা করলেন। নরকের পর রাজা হলেন মহাভারত খ্যাত ভগদত্ত। প্রবল পরাক্রমশালী পাণ্ডবদের বশ্যতা তিনি স্বীকার করেননি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি দুর্যোধনের পক্ষ নিয়েছিলেন এবং অর্জুনের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে নিহত হন। তাঁর পুত্র বজ্রদত্ত প্রাগজ্যোতিষের রাজা হয়ে অর্জুনের সঙ্গে ত্রিরাত্র যুদ্ধ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয় আনুমানিক খৃঃপূর্ব দশম শতাব্দীতে, সেই হিসাবে বজ্রদত্তের সময় সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দী। এর পর নানা পুরাণ ধর্মগ্রন্থে একাধিক রাজার উল্লেখ থাকলেও তাঁদের পরিচয় আদৌ সুস্পষ্ট নয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকেই আমরা কামরূপের ধারা বাহিক রাজন্যবর্গের সুস্পষ্ট পরিচয় পাচ্ছি। আনুমানিক ৩৫৫ খৃষ্টাব্দে কামরূপের রাজা হলেন সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক পুষ্যবর্মণ। তিনি রাজা নরকের বংশধর বলে দাবী করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ বংশের নাম হলো বর্মণ বংশ। এই বংশের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ভাস্কর বর্মণ ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। তাঁর রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক হিউএনসাঙ কামরূপে এসেছিলেন। ভাস্কর বর্মণের কামরূপ রাজ্য বর্তমান আসাম উপত্যকা, জয়ন্তীয়া, কাছাড়, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহের কিয়দংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে ঐতিহাসিক স্যার গেইট অনুমান করেন। তিনি সম্ভবত ৫৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এই অকৃতদার নৃপতির মৃত্যুর পর অন্তর্বিরোধে বর্মণ বংশের পতন ঘটে।

ভাস্কর বর্মণের পর শালস্তম্ভ নৃপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শালস্তম্ভ রাজবংশ কামরূপে ৮০০ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা ত্যাগ সিংহের কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। তাই অমাত্যবর্গ ব্রহ্মপাল নামক জনৈক

রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। তিনি ১১০০ শতাব্দীতে প্রথম দিকে পাল রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশের শেষ রাজা ধর্মপাল গৌড়ের রাজা রামপাল কর্তৃক বিজিত হন। পালবংশের বিলোপের পরে দ্বাদশ শতাব্দীতে বৈদ্যদেব রাজা হন। তারপর 'দেব' উপাধিধারী কতিপয় রাজা কিছুকাল রাজত্ব করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় তিব্বত অভিযানের পর প্রত্যাবর্তনের পথে বখতিয়ার খিলজী কামরূপ রাজ পৃথুর সঙ্গে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ব্রহ্মদেশের 'শান' অঞ্চল থেকে এসে আহোম নামে 'টাই' জাতির একটি শাখা আসাম অধিকার করে নেয়। 'আসাম' নামটি আহোম শব্দ থেকে এসেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী কামতা রাজ্য শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাব হুসেন শাহ কামতারাজকে পরাজিত করে কামরূপ অধিকার করেন। আসামের উত্তর পূর্বে আহোম রাজারা দীর্ঘকাল ধরে উপজাতিদের ও মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করছিলেন। সপ্তদশ শতকে বাংলার সুবেদার মীরজুমলা আসাম আক্রমণ করেন; কিন্তু আহোমদের প্রতিরোধে ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে সন্ধি করতে বাধ্য হন। কিন্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি নানা কারণে শক্তিশালী আহোম রাজ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই বিনষ্ট হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ব্রহ্মদেশ আসাম আক্রমণ করে এবং কিছুকাল শাসন করে (১৮১৯ - ১৮২৪)। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সমগ্র আসাম অধিকার করে নেয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আইন বলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম স্বতন্ত্র একটি প্রদেশরূপে গঠিত হয়, কিন্তু প্রবল গণ আন্দোলনের ফলে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সেই ব্যবস্থা রদ হয়ে যায়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে অন্যান্য প্রদেশের মত আসামকেও স্বায়ত্ত শাসিত প্রদেশ বলে ঘোষণা করা হয়। সমগ্র ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ভাবে যুক্ত হয়ে আসামের জনগণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

আসামের ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে এবার আমরা অসমীয়া সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অনুসরণ করব এবং তারপর বেজ বরুয়া যুগের সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হব।

সূত্রনির্দেশ

~~1. History of Assamese literature - Dr. Birinchi K. Barua, P.5~~

1. Assamese literature - Dr. Hem Barua, P.12.

2. History of Assamese literature - Dr. Birinchi K. Barua, P.5.

3. History of Assam - Sir E. A. Gait, P. 1.

৪। অসমীয়া সাহিত্য - ডঃ সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬।

5. Origin and development of the Bengali Language - Dr. Suniti K. Chatterjee, Vol.I, P.98.

৬। বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব (প্রথম ভাগ) - ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, পৃঃ ৪৬।

৭। রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোচনায় Sir E. A. Gait-এর History of Assam - গ্রন্থটির সহায়তা নেওয়া হয়েছে সর্বাধিক।

প্রথম অধ্যায়

অসমীয়া সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস এবং অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। উভয় ভাষাই প্রাচীন ভারতীয় আর্য অর্থাৎ বৈদিক ও সংস্কৃত স্তর অতিক্রম করে মধ্য ভারতীয় আর্য অর্থাৎ প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা সমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, সে প্রায় হাজার বছর আগে। বাংলা ও অসমীয়া ভাষার লিপিও(Script) একই, যাকে বলা হয় কুটিল লিপি। এই কারণে গোড়া থেকেই উভয় ভাষার পাঠ ও বোধগম্যতায় বিশেষ বাধা কখনো সৃষ্টি হয়নি। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখি, প্রাচীন সাহিত্যের চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অবদান উভয় সাহিত্যই নিজেদের সম্পদ বলে গণ্য করে, যেহেতু উদ্ভব যুগে উভয় ভাষারই প্রকৃতি প্রায় একরূপ ছিল, তখনো স্বাতন্ত্র্য-লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেনি। ধর্ম ও সামাজিক চেতনাও ছিল প্রায় একরূপ। অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসকার ডিম্বেশ্বর নেওগ মন্তব্য করেছেন, 'পূব ভারতত অসমীয়া আরু বাংলা ভাষায়ো এই যুগর শেষ ভাগতহে নিজর স্বকীয়া গঢ় লবলৈ ধরে। সেই কারণে অল্পলৈকে বাংলা সাহিত্যের ভিতরুয়া বুলি ধরা বৌদ্ধগান আরু দোহার দরে শূণ্য পুরাণ, কৃষ্ণকীর্তন, আরু গোপীচন্দ্রর গানকো আমি অসমীয়া সাহিত্যর অন্তর্গত বুলি ধরিছো, কিয়নো সেই বোরত বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য তেতিয়া ফুটি উঠা নাই পূব ভারতীয় বা বৃহত্তর কামরূপীয় ভাষার প্রাধান্য ভাল দরে রক্ষিত হৈছে। মরহ বা লাগে কবীন্দ্র সঞ্জয় আরু অনন্ত কন্দলীর দরে ষোড়শ শতিকার অসমীয়া কবি সকলক বঙালীয়ে বঙলা বোলা কথাই ইয়াকেহে প্রমাণ করে যে অসম বঙ্গ আদি বর্তমান ভৌগোলিক প্রদেশ বোধ জন্ম হোয়ার আগলৈকে অন্ততঃ অসম, বঙ্গ আদি সদৌ পূব ভারতর ভাষা মূলক আরু সাংস্কৃতিক ঐক্য অটুট আছিল।' ১

অসমীয়া সাহিত্যের যুগ বিভাগ করা হয়ে থাকে এই ভাবে:-

(ক) আদি যুগ বা বৌদ্ধ যুগ।

(খ) প্রাক্ বৈষ্ণব যুগ বা মধ্য যুগ।

(গ) বৈষ্ণব যুগ বা শঙ্করী যুগ।

(ঘ) বিস্তার যুগ বা শঙ্করোত্তর যুগ।

(ঙ) বর্তমান যুগ বা আধুনিক যুগ।

লক্ষণীয় এই যে বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগের সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য বিশেষ নেই। অসমীয়া সাহিত্যে যেমন মহাপুরুষ শঙ্করদেবকে ~~কেন্দ্রে~~ কেন্দ্র রেখে প্রাক-শঙ্কর ও শঙ্করোত্তর যুগ বিভাজন করা হয়েছে, বাংলা সাহিত্যেও তেমনি মহাপ্রভু চৈতন্য দেবকে কেন্দ্র রেখে প্রাকচৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগ নির্দিত হয়েছে। উভয় সাহিত্যেই বিশেষ ধারা সমূহ বর্তমান। যেমন রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের অনুবাদ-কাব্য, বৈষ্ণব-কাব্য, লোক সাহিত্য প্রভৃতি, এবং এর অধিকাংশের উপরই উভয় সাহিত্যের দাবী রয়েছে প্রবল ভাবৈক্য ও রচনা-সাদৃশ্যের জন্যে। এ নিয়ে অবশ্য পন্ডিতদের মধ্যে বিচার বিতর্কের অবকাশ রয়েছে, তবুও সাধারণ ভাবে এই সাদৃশ্যপূর্ণ লক্ষণগুলিকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। ডঃ মহেশ্বর নেওগের মতে অসমীয়া ভাষা পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক ভাষার রূপ পেয়েছে ১৪শ শতাব্দীতে। 'ইয়ার আগতে অসমীয়া ভাষার পরিস্কার রূপর নিদর্শন পোয়া না যায়।'২ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় বৌদ্ধগান ও দোহা এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার মিশ্ররূপ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ যদিও বা থাকে, তৎপরবর্তী অন্যান্য সাহিত্যিক নিদর্শন গুলিতে বাংলা ভাষা ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক দিক থেকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ঐ ১৪শ শতকেই।

উভয় সাহিত্যেই আধুনিক যুগ সূচিত হয় শাসক রূপে ব্রিটিশ শক্তির অভ্যাগমে। বাংলা দেশে ইংরেজ শাসন ~~প্রতিষ্ঠিত~~ স্থাপিত হয় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে। তারপর অর্ধশতাব্দী পরে ইংরেজী শিক্ষা- সভ্যতা প্রসার সূত্রে বাংলা গদ্যের সূচনা করে সাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন খৃষ্টান মিশনারীগণ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করে। বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্রিকাও প্রকাশ করেন খৃষ্টান মিশনারীগণ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে, তাদের নাম 'দিগদর্শন' (মাসিক পত্র) ও 'সমাচার দর্পণ' (সাপ্তাহিক পত্র)। অপরদিকে আসামে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় আরো পরে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে। লক্ষণীয় এই যে অসমীয়া ভাষা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন 'আসাম বুরঞ্জী' লিখেছেন বাংলায় । অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ' 'আসাম বুরঞ্জী' (১৩৬৯ বাং) গ্রন্থটি থেকে আমরা হলিরামের বঙ্গভাষাপ্রীতির নিদর্শন পেয়েছি। হলিরামের গ্রন্থের ভূমিকায় ডঃ বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া লিখেছেন-' বৃটিছে অসম দেশে অধিকার করার পিছতেই (১৮২৯ খৃষ্টাব্দত) প্রতিবেশী বঙ্গভাষা আয়ত্ত করি সেই ভাষাত বিজ্ঞান সম্মত

প্রণালীত ইতিহাস রচনা করিব পরা ক্ষমতাই হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনর বুধিবেত্তা রসগ্রাহী মনর পরিচয় দিয়ে।(১) .....পুথির বহু ঠাইত অসমীয়া শব্দ প্রয়োগ করি ঢেকিয়াল ফুকনে বঙ্গ আরু অসমীয়া ভাষার মাজত এক সম্বন্ধ সেতু বান্ধিবলৈ ব্যবস্থা করিছিল। ঢেকিয়াল ফুকনে তেওঁর পুথিত সেই সময়ুর বঙ্গালী গদ্য লেখক সকলর সংস্কৃত ভারাক্রান্ত ভাষা ব্যবহার করা নাই। তেওঁর গদ্য সমকালীন অসমীয়া গদ্যর দরে সরল। ...ঢেকিয়াল ফুকনে তেনে সর্বজন বোধ্য অনাড়ম্বর গদ্যতেই 'আসাম বুরঞ্জী' রচনা করিছে।...' আসাম বুরঞ্জীর রচনারীতির সৌন্দর্য অনলঙ্কার সারল্য আরু বাহুল্য বর্জিত ভাষা বিদ্যাসাগরীয় গদ্যর সমকক্ষ।'(২)

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের রচনা রীতির একটু নমুনা দেওয়া গেল- ' ঐ ফুকন প্রথম মুরশিদাবাদে গিয়া জগৎ শেঠের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতা গেলেন। সে স্থানে আত্মকর্ম সিদ্ধির কোন লক্ষণ না দেখিয়া শ্রীহট্টের পথে ব্রহ্মদেশে গিয়া রাজার পক্ষ হইতে মন্ত্রীকে নষ্ট করার কারণ আবার রাজার নিকট সহায়তা যাচ্ঞা করিলেন। ব্রহ্ম রাজা তাহা স্বীকৃত হইয়া কতক সৈন্য সমেত ফুকনকে আসাম প্রেরণ করিলেন। তিনি ব্রহ্ম রাজ দত্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে আসামে পহুঁছিয়া জয়পুর প্রভৃতি স্থান আক্রমণ করিলেন। (পৃ: ৪৭)।৩ তাঁর ভাই যজ্ঞরাম ফুকন 'সমাচার দর্পণ' ৩০ জুলাই ১৮৩১, সংখ্যায় ইংরেজী কবিতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। একে তাঁদের বঙ্গ ভাষার প্রতি আসক্তির নিদর্শন বলা চলে। তাই বাঙ্গালীদের সাংস্কৃতিক অগ্রবর্তিতা তখন অনস্বীকার্য ছিল। আসামে বিদেশী শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের আগমন ঘটে এখানে।

এই সব নবাগতদের মধ্যে বঙ্গবাসী বঙ্গভাষীদের কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। আসামে বাংলা ভাষার বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সম্ভব হয় ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় এর আনুকূল্যে। তাঁরা রাজকার্যে ও শিক্ষাদান কার্যে বাঙ্গালীদের নিয়োগ করেছিলেন অধিক পরিমানে। আদালতে ব্যবহৃত হতে লাগলো বাংলা ভাষা, বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হলো বাংলা ভাষা ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে । ঐতিহাসিক বলেন:-

" The amlahs of Bengal replaced the official aristocracy when the latter proved themselves incapable of discharging their duties under the alien government. The Task of the new recruits was all the more easier when in April 1831 Government of Bengal made Bengali in place of Persian the Language of the court........ Before long, the newcomers from Bengal not only made the revenue and judicial departments their sole preserve, but their services became equally indispensable to the newly started Government Schools for dearth of local teachers specially to impart instructions in Bengali which had since made the medium of instruction ".[4]

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে আইন হল, ভারতবর্ষের সর্বত্র স্থানীয় মাতৃভাষা বিদ্যালয়ে ও আদালতে চলবে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত সেই আইন আসামে কার্যকরী করা হল না। ধীরে ধীরে এই নিয়ে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে লাগলো আসামে, তাতে নেতৃত্ব দিলেন স্বদেশ প্রেমিক আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন। তিনি তাঁর " Observation on the Administration of province of Assam"-এ আদালতে ও বিদ্যালয়ে বাংলার পরিবর্তে অসমীয়া ভাষা প্রবর্তনের স্বপক্ষে প্রবল যুক্তি দেখালেন। [৫] অবশেষে শাসন কর্তৃপক্ষ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ঘোষণা করলেন, অতঃপর আদালতে ও বিদ্যালয়ে অসমীয়া ভাষাই চলবে। এটি ঠিক বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপতা নয়, এই অসন্তোষ ছিল বাঙালীর ও বাংলা ভাষার আধিপত্যের বিরুদ্ধে, যা একান্ত স্বাভাবিক, অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের যুগোপযোগী সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে একটা বড় প্রতিবন্ধক ব্রিটিশ সরকার সৃষ্টি করেছিলেন পূর্ববর্তী ভাষানীতির দ্বারা। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার আশংকায় অসমীয়া দেশ প্রেমিক ও চিন্তাবিদ্‌রা শংকিত হয়ে ছিলেন। নতুবা বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের আকর্ষণ কিছু কম ছিল না। ঐতিহাসিক বলেন, " Inspite of their animosity against linguistic domination, the intelligentia was not slow in adopting Bengali dress, customs,

usges and even food habits. To counteract the evils of Westernisations, this was welcomed even by the orthodox section of the community who felt proud to show their common heritage with their progressive neighbours.[6]

আসামে অসমীয়া ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় খৃষ্টান মিশনারীবৃন্দ মিশনারীদের দানও অক্ষ অবশ্য স্বীকার্য। বাংলার মতই আসামেও তাঁরা মুদ্রযন্ত্র স্থাপন করে অসমীয়া ভাষায় ব্যাকরণ অভিধান, নানাজ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রকাশ করে অসমীয়া সাহিত্যিকদের সিসৃক্ষু মনের উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন। ডিম্বেশ্বর নেওগ সত্যই বলেছিলেন যে মিশনারীগণ " not only liberated the spirit of Assamese from the bondage of old World ideas in the ~~xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx~~nd domain of thought, but they also removed the confines of the language and made it quite suitable for modern use".[7]

তাঁদের প্রচার মাধ্যম ছিল ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মাসিক পত্র 'অরুনোদই' যা অসমীয়া ভাষায় প্রথম সংবাদ পত্র। এর ২৮ বছর আগে বাংলাতেও প্রথম সাময়িক পত্র 'দিগ্দর্শন ও' সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করেছিলেন মিশনারীগণ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, Folk tales of Bengal গ্রন্থের রচয়িতা রে: লালবিহারীদে-র সম্পাদনায় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বাংলায় 'অরুণোদয়' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল।[৮] 'অরুনোদই' পত্রিকা বেঁচেছিল ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। যদিও তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দিগ্দর্শন ইত্যাদির মত খৃষ্টধর্ম প্রচার, তথাপি ~~xxxxxx~~ ডঃ মহেশ্বর নেওগের ভাষায়, ' এই কাকতেই অসমীয়া পাঠকর মানসিক দিগন্ত প্রসারিত করিছিলে আরু ই আমার সামাজিক রাজনৈতিক ~~xxxx~~ জীবনর বহুতো ঘটনার সাক্ষী হৈ রল...।[৯] অসমীয়া ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ আনন্দরাম ~~xx~~ ঢেকিয়াল ফুকন এই 'অরুনোদই'র লেখক ছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ~~xxxx~~ বাংলায় 'আসাম বুরঞ্জী'র লেখক হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন তাঁর পিতা। আনন্দরামের সাহিত্যকীর্তি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, তবে 'অরুনোদই' পত্রিকা এবং আনন্দরামের

প্রধান কৃতিত্ব হলো নিজ ভাষা সম্পর্কে অসমীয়া সাহিত্যিকদের আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করা । অসমীয়া ভাষার আত্মপ্রতিষ্ঠার এই আন্দোলনের ফলেই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের শুভ সূচনা হলো । গড়ে উঠলো নতুন রচনা - শৈলী ।

সাহিত্যের বিচিত্র শাখা , যেমন উপন্যাস , নাটক, জীবনী, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, সমাজ চেতনা মূলক ব্যঙ্গ রচনা , কাব্যের আধুনিক রূপ ক্রমেই দেখা দিতে লাগলো । এই নতুন যুগের উদ্গাতা হলেন হেমচন্দ্র বরুয়া (১৮৩৫ - ৯৭)। ইংরেজী শিক্ষিত এই সাহিত্যিক শুধু ভাষা - সংস্কার ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করেই ক্ষান্ত হলেন না , সমাজের দোষত্রুটির তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে লিখলেন 'বাহিরে রং চং আরু ভিতরে কোয়া ভাতুরী 'নামক উপন্যাস ও কানীয়া -কীর্তন' নামক নাটক । ডঃ মহেশ্বর নেওগের মতে , 'তেওঁর নিজর ভাষা শৈলী নিটোল ওজঃ সম্পন্ন আরু প্রখর, সি অসমীয়া সাহিত্যর উচ্চাঙ্গর সম্পদ ।'[১০] এই সাথে গুণাভিরাম বরুয়ার (১৮৩৭ - ৯৪) নামও উল্লেখযোগ্য । কলিকাতায় শিক্ষিত এই সাহিত্যিক বাংলা দেশের বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্ম সমাজের সামাজিক আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন । তার ফলে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে বাংলায় রচিত উমেশ চন্দ্র মিত্রের'বিধবা বিবাহ' (১৮৫৬) নাটকের মত একই বিষয়ে প্রায় একই সময়ে একটি নাটক লিখেছিলেন , নাম 'রামনবমী' (১৮৫৭)। এটি অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম আধুনিক সামাজিক নাটক। তাঁর অপর সামাজিক নাটক 'বিবাহ রহস্য' । গুণাভিরাম রচিত 'আনন্দ রাম ঢেকিয়াল ফুকনর জীবন চরিত'(১৮৮০) একটি অপূর্ব সরস রচনা । ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখক রূপেও তাঁর প্রতিষ্ঠা কম নয় , 'অসম অতীত আরু বর্তমান'প্রবন্ধ তাঁর উজ্জ্বল নিদর্শন ।রমাকান্ত চৌধুরীর (১৮৪৬ - ১৮৮৯) কৃতিত্ব হলো , তিনিই প্রথম মধুসূদন দত্ত প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ অসমীয়া ভাষায় সার্থক অনুকরণ করলেন তাঁর 'অভিমন্যু বধ কাব্যে' (১৮৭৫) । প্রায় একই সময়ে ভোলানাথ দাসও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করেন 'সীতা হরণ কাব্য' । তাঁর খণ্ড কবিতা সংকলন 'কবিতামালা' ও 'চিন্তাতরঙ্গিনী'র কবিতা গুলির মনোরম লিরিক সুর,শব্দ চয়ন নৈপুণ্য ও ছন্দ সুষমা নব্য কবিতার আদর্শ নির্দিষ্ট করেছিল । যা হোক , এই ভাবে হেমচন্দ্র বরুয়া , গুণাভিরাম বরুয়া

প্রভৃতি সাহিত্যেরথী অসমীয়া সাহিত্যে আধুনিক রোমান্টিক যুগ তথা বেজবরুয়া - যুগের আবির্ভাব ত্বরান্বিত করে তুললেন । পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা অসমীয়া সাহিত্যের আধুনিক যুগ নির্দেশক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার পরিচয় তুলে ধরছি বিশেষ ভাবে , কেননা বেজবরুয়া যুগে সৃষ্ট অসমীয়া সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব নিরূপণই আমাদের অভিপ্রেত ।

সূত্র নির্দেশ

১। শ্রী সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের -- 'অসমীয়া সাহিত্য' গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃঃ ২০ ।

২। অসমীয়া সাহিত্যের রূপরেখা -- ডঃ মহেশ্বর নেওগ , পৃঃ ১৫ ।

৩। আসাম বুরঞ্জী — হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন । অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত (১৩৬২ বাং)

4. Political History of Assam . Ed. by S.K. Barpujari & A.C. Bhuyan , Page 62 - 63.

5. Ibid , Page 121 .

6. Ibid, Page 126 - 7.

7. New Light on the History of Assamese Literature -- Dimbeswar Neog. Page 345 - 6.

৮। বাংলা সাময়িক সাহিত্য (১৮১৮ - ৬৭) — ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় , পৃঃ৫৭ ।

৯। অসমীয়া সাহিত্যের রূপরেখা — ডঃ মহেশ্বর নেওগ , পৃঃ ২৪২ ।

১০। ঐ । — ঐ পৃঃ ২৪২ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুগস্রষ্টা বেজবরুয়ার বহুমুখী সাহিত্য-কৃতির পরিচয় ও বেজবরুয়া যুগের অসমীয়া সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ঃ

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জন্ম হয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে । এই সময় সমগ্র আসামের সরকারী ভাষা ছিল বাংলা । যেহেতু বঙ্গের মানুষ আসামের পূর্বেই বৃটিশ শাসনাধীনে আসে, তাই বঙ্গবাসীগণ আসামের জনগণের পূর্বেই ইংরোজী শিক্ষার সুযোগ পায়, নগর জীবনের সংস্পর্শে আসে । ১ কলকাতা তখন বৃটিশ ভারতের রাজধানী । কলকাতার নাম তখন ভারতবাসীর মুখে-মুখে । ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য বহু মানুষ কলকাতা আসতেন, আসতেন আসামবাসী অসমীয়া ভাষীরাও । বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি দেখে তাঁরা মাতৃভাষা অসমীয়ার উন্নতি-সাধনে দৃঢ় সংকল্প হন । ২ এঁদের মধ্যে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরনীয় । তিনি কলকাতায় থেকে কলেজীয় শিক্ষালাভ করেন । ৩ বেজবরুয়া আইন পড়েন, ইংরেজী নিয়ে এম.এ.ও পড়েন, তবে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে ডিগ্রী নেননি । বেজবরুয়া যে কলকাতায় কলেজীয় শিক্ষালাভের জন্য আসেন, তা তখন বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র । এই সময় সাহিত্যে বঙ্কিম চন্দ্র, মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ; রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্ত রঞ্জন দাস, ধর্মে শাশ্বত শাশ্বত জীবনের বাণী শোনাচ্ছেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, বিজ্ঞানে নবআবিষ্কারের প্রেরণা দিচ্ছেন স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় । কলকাতা প্রবাসী অসমীয়া ছাত্রগণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন উন্নতি করে জন্মভূমি আসামের মুখ উজ্জ্বল করবার জন্য প্রেরণা পান এঁদের সকলের কাছ থেকে । ফলস্বরূপ তাঁদের 'টি-পার্টি' থেকে প্রসূত হলো অ.ভা.উ.সা সভা অর্থাৎ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা । ৪ তাঁদের উদ্যোগে প্রকাশিত হলো 'জোনাকী' পত্রিকা ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১২ ই ফেব্রুয়ারী । এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা । দ্বিতীয় সম্পাদক ও সর্বপ্রধান লেখক ছিলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া । বেজবরুয়ার সাহিত্যিক হাতে খড়ি এই 'জোনাকী' পত্রিকায় । 'লিতিকাই' প্রহসনটি এই 'জোনাকী'র পাতাতেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় । এরপর দীর্ঘকাল তিনি নাটক তথা প্রহসন রচনা থেকে

82786 23 AUG 1983 UNIVERSITY OF NORTH BENGAL LIBRARY

বিরত থাকেন । বেজবরুয়ার অক্লান্ত লেখনী প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কত রচনাই না সৃষ্টি করেছে । অধিকাংশ রচনা উদ্দেশ্যমূলক হলেও তাঁর রচনাসমূহ অসমীয়া সাহিত্য ভাণ্ডারের অতীব মূল্যবান বস্তু । রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্য কর্ম নিয়ে আলোচনা করতে গেলে মনে প্রশ্ন উদিত হয় রবীন্দ্রনাথ কি লিখেছেন তা নয়, তিনি কি লেখেন নি, তাই । আসামরত্ন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া সম্পর্কেও আলোচনা করতে গেলে অনুরূপ প্রশ্ন মনে আসে । লক্ষ্মীনাথও রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্যের বিভিন্ন রাজপথে এমনকি অলিতে গলিতেও বিচরণ করেছেন । তিনি গল্প লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, জীবনচরিত লিখেছেন, আত্মজীবনী লিখেছেন । তাঁর প্রতিভার বহুমুখিতা বিস্ময়কর । বেজবরুয়ার জন্ম হয়েছিল লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিনে । তাই তাঁর নাম হয়েছিল লক্ষ্মীনাথ । সত্যিই তিনি লক্ষ্মীনাথ হয়েছিলেন । জীবনে প্রচুর অর্থউপার্জন করেছেন সুহৃদ বি.বরুয়ার ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে । লক্ষ্মী যাকে কৃপা করেন, সরস্বতী তাকে নাকি পরিত্যাগ করেন । লক্ষ্মীনাথের ক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রবাদটি সত্য বলে প্রমাণিত হলো না । বিধাতার মত খেয়ালী নেই, রসিকও নেই । তাঁর কৃপায় পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, মূক মুখর হয় । তাঁর ইচ্ছায় নীরস কাষ্ঠ - ব্যবসায়ীও সরস সাহিত্যের কারবারী হয় । বলা বাহুল্য বেজবরুয়া কাষ্ঠ ব্যবসায়ী ছিলেন । উকিল - মোক্তার - শিক্ষক - ডাক্তার সাহিত্যের সেবা করে বরেণ্য হয়েছেন খুব শোনা যায়, কিন্তু কোন কাষ্ঠ ব্যবসায়ী একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে সম্বর্ধিত সম্মানিত হয়েছেন এমন নজির বিরল ।

'জোনাকী' যুগের লেখক বললে লক্ষ্মীনাথ বাদে আরও দুজনের কথা মনে পড়ে । তাঁরা হলেন হেমচন্দ্র গোস্বামী ও চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা । 'জোনাকী' কে কেন্দ্র করে এক সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠে । এই সাহিত্যিক গোষ্ঠীর পুরোধা ছিলেন লক্ষ্মীনাথ । ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 'জোনাকী যুগ' বলে অভিহিত । ড: মহেশ্বর নেওগ তাকেই ''বেজবরুয়া যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন । এই যুগকে ইংলন্ডের রেষ্টরেশন যুগের সঙ্গে তুলনা করলে লক্ষ্মীনাথকে বলতে হয় 'জোনাকী যুগে'র ড্রাইডেন । রেষ্টারেশন যুগের সমস্ত বৈশিষ্ট্য যেমন ড্রাইডেনের মধ্যে নিহিত, তেমনি 'জোনাকী যুগের' সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্মীনাথের মধ্যে বিদ্যমান । রোমান্টিক যুগের বার্তাবাহী এই 'জোনাকী' পত্রিকা বিংশ শতাব্দীর অসমীয়া চিন্তামানসের শুভ উদ্বোধক । [৬] এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় বঙ্গের বঙ্গদর্শন পত্রিকা (১৮৭২) । বাঙালীর জাতীয় জীবনে এই পত্রিকাটির প্রভাব অপরিসীম । এই পত্রিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

বলেছেন - "যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল, তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগত কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। .... বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরেজী শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল, বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল .... আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে মহিমরশ্মি নিপতিত হইল। ৭ অসমীয়া জীবনে "জোনাকী" ও অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

লক্ষ্মীনাথ অসমীয়া ছোট গল্পের জনক। বেজবরুয়ার ছোট গল্পের সংকলন তিনটি -'সুরভি' (১৯০৯), 'সাধুকথার কুকি'(১৯১০) ও'জোনবিরি'(১৯১৩)। এই সংকলন তিনটিতে প্রায় ষাটটির মত গল্প সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রাচীন সাধুকথা ও আধুনিক অসমীয়া গল্পের সেতুবন্ধন করেছিলেন বেজবরুয়া মহাশয়। এই সময় বিশ্ব জুড়ে ছোট গল্পের সমাদর। চেখভ, মোপাসাঁর গল্প মাত্রেই লোভনীয় বস্তু। এঁরা বেজবরুয়ার সামান্য পূর্বের। তাঁর সমসাময়িক সুবিখ্যাত ভারতীয় গল্পলেখক রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচাঁদ প্রভৃতি। গল্পলেখক হিসেবে লক্ষ্মীনাথ নিশ্চয়ই বিশ্ববিখ্যাত ওইসব সারস্বত সাধকদের সমকক্ষ ছিলেন না, কিন্তু তবুও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় কৃতী লিখিয়েদের সঙ্গে লক্ষ্মীনাথের নামটিও উল্লেখ করতে হয়। বেজবরুয়া প্রহসনও লিখেছেন। যেমন - 'লিতিকাই'(১৮৯৯), 'নোমল', 'পাঁচনি', 'চিকরপতি- নিকরপতি'(১৯১৩) প্রভৃতি। বেজবরুয়ার লিতিকাই 'জোনাকী'র প্রথম সংখ্যা থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। ৮ বেজবরুয়ার লিতিকাই একটি সার্থক প্রহসন।

বেজবরুয়া উপন্যাসও লিখেছেন। উপন্যাসের রাজপথে তিনি জীবনে একবারই বিচরণ করেছেন।'পদুমকুঁবরী' তাঁর একমাত্র উপন্যাস। বস্তুত অতীত ঐতিহ্যপ্রীতির সুস্পষ্ট লক্ষণ এই উপন্যাসেই সূচিত হয়েছে, যদিও উপন্যাস রচনায় তিনি তেমন সফলতা লাভ করতে পারেন নি। ৯ প্রবন্ধকার হিসেবে বেজবরুয়ার নাম না করলেই নয়। তাঁর'তত্ত্বকথা' — কৃষ্ণকথা' 'ভগবৎকথা' — অসমীয়াভাষী কোনোদিন বিস্মৃত হতে পারবে না। বেজবরুয়ার অধিকাংশ ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ প্রবন্ধ বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কীয়।

ব্যক্তিনিষ্ঠ লঘুরচনার জন্যও বেজবরুয়ার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরনীয় । বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের' মত তাঁর 'কৃপাবর বরুয়া' অমর সৃষ্টি । বেজবরুয়ার কৃপাবর বরুয়ার কাকতর টোপোলা' (১৯০৪) প্রথম অসমীয়া হাস্যরসাত্মক রচনা । ১০

বেজবরুয়া কবি । বেজবরুয়ার কবিতা - কোষ 'কদমকলি' । এতে বিভিন্ন ভাব ও রস সমৃদ্ধ ৮১টি কবিতা স্থান পেয়েছে । এর অনেক কবিতাই অসমীয়ার মুখেমুখে । (যেমন -'আমার জন্মভূমি', ধনবর আরু রওনী', 'রতনীর বেজার প্রভৃতি)। এই কবিতা সংকলনে এমন কয়েকটি কবিতা আছে যা সত্যই প্রশংসনীয় ।

বেজবরুয়া শিশু সাহিত্যিক । অসমীয়া শিশু তাঁর 'জুনুকা', 'বুঢ়ী আইর সাধু', 'ককা দেউতার নাতি লা' রা' র কথা কখনো ভুলতে পারবে না । 'জোনাকী যুগে'র যে সমস্ত লেখক শিশুসাহিত্য রচনায় আগ্রহ দেখিয়েছেন, বেজবরুয়া তাঁদের অন্যতম ।

বেজবরুয়া জীবনবৃত্ত এবং আত্মজীবনীও লিখেছেন । তাঁর এই শ্রেনীর রচনা হল - (১) ডাওরীয়া দীননাথ বেজবরুয়ার জীবনী (২) শ্রী শংকরদেব (৩) মহা - পুরুষ শংকরদেব আরু শ্রী মাধবদেব (৪) মোর জীবন সোঁয়রন । সর্বশেষটি তাঁর আত্মজীবনী । অসম্পূর্ণ হলেও গ্রন্থটি অসমীয়া সাহিত্যের একটি মূল্যবান সম্পদ ।

উপদেশাত্মক রচনাও কিছু লিখেছেন বেজবরুয়া । 'কামতকৃতিত্ব লভিবর সংকেত' ও'বাখর' এই জাতীয় রচনা । ইতিপূর্বে বেজবরুয়ার 'লিতিকাই' প্রহসনের কথা বলা হয়েছে । এর প্রকাশকাল ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ । এরপর দীর্ঘ বিশ বছরেরও অধিককাল বেজবরুয়া নাটকের রাজপথে পদক্ষেপ করেন নি । আবার ১৯১৫ - খৃষ্টাব্দে তিনি রচনা করেন 'চক্রধ্বজ সিংহ', 'বেলিমার' ও'জয়মতী কুঁয়রী', অসমীয়া সাহিত্যের তিনটি মূল্যবান মুক্তা, বললে অত্যুক্তি হয় না ।

বেজবরুয়া একজন কৃতী সমালোচক । এই প্রসঙ্গে স্মরনীয় তাঁর 'সামাজিক', 'অসমীয়া জাতি' ইত্যাদি প্রবন্ধ । তাঁর রচনাশৈলী, শব্দ নির্বাচন, উপমার সার্থক প্রয়োগ অতুলনীয় - তা না জানলে অসমীয়া সাহিত্যের রসাস্বাদন অসম্পূর্ণ থেকে যায় । রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি, অথচ বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন এমন ব্যক্তি যেমন বিরল, তেমনি বিরল অসমীয়া পাঠক যিনি বেজবরুয়া অধ্যয়ন করেন নি । যাহোক কী কারণে বেজবরুয়া অসমীয়া সাহিত্যে যুগস্রষ্টারূপে স্বীকৃত তা আলোচনা করা প্রয়োজন ।

অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সম্পর্কে আজ আর কেউ অবিদিত নন । এই ভাষা ও সাহিত্য আর পাঁচটা আঞ্চলিক ভাষার মতই দ্রুত পদক্ষেপে উৎকর্ষের পথে এগিয়ে চলেছে । এই অগ্রগতিতে 'জোনাকী যুগে'র শ্রেষ্ঠ পুরোধা লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । ডঃ মহেশ্বর নেওগ যথার্থই বলেছেন –" বেজবরুয়ার ব্যক্তিত্ব আরু বহুমুখী সাহিত্য প্রতিভাই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের এটি সমষ্টিত্ব বা ঐক্যগুণ দান করিছে "। ১১ তাঁর প্রযত্ন ও অনমনীয় ব্যক্তিত্বে এই 'জোনাকী যুগ' সমুজ্জ্বল । এই সময়ে তিনি অসমীয়া সাহিত্যে হিমালয়ের মত উচ্চশির । এই যুগের সমস্ত সারস্বত সাধকের উপরই তাঁর অনুশাসন কম বেশী পরিমাণে বর্তেছিল । বাংলার সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মতই লক্ষ্মীনাথ দীর্ঘকাল ধরে অসমীয়া সাহিত্যিকদের উপর নেতৃত্ব করেছিলেন । এই কারণেই ডঃ মহেশ্বর নেওগ অতি সঙ্গতভাবে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কালকে 'বেজবরুয়া যুগ' নামে চিহ্নিত করেছেন । ১২

বেজবরুয়া বঙ্গের বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন । ১৩ তাঁর পত্নীর নাম প্রজ্ঞাসুন্দরী । তাঁদের দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল । বেজবরুয়ার প্রতিভার বিকাশে তাঁর পত্নীর অবদান কম নয় । বেজবরুয়ার মৃত্যু হয় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে । তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রভাব ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে । এই সময় অসমীয়া সাহিত্যের প্রাণ বীণায় একটি পরিবর্তনের সুর ধ্বনিত হয় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের উত্তাল রাজনৈতিক অবস্থা সূত্রে এই পরিবর্তন অসমীয়া সাহিত্যের রোমান্টিক ভাবধারা থেকে অতি আধুনিক ভাবধারার অভিমুখে সংক্রমণের ইঙ্গিতবাহী ।

বেজবরুয়া যুগের অসমীয়া সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যও আলোচনা করা প্রয়োজন । বেজবরুয়াকে ইতিপূর্বে রেস্টোরেশন যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক ড্রাইডেনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । রেস্টোরেশন যুগের অনেক বৈশিষ্ট্য জোনাকী যুগে দেখা যায় । তাই বলে আক্ষরিক ভাবে জোনাকী যুগকে রেস্টোরেশন যুগ বলা যাবে না । রেস্টোরেশন যুগে প্রবন্ধ সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় । সমালোচনা সাহিত্য একটি সুস্থ রূপ পরিগ্রহ করে । 'জোনাকী যুগে'ও অনুরূপ দেখা যায় । রেস্টোরেশন যুগের সমস্ত বৈশিষ্ট্য যেমন ড্রাইডেনের মধ্যে বিদ্যমান, জোনাকী যুগেরও সমস্ত বৈশিষ্ট্য বেজবরুয়ার মধ্যে দৃষ্ট হয় । কিন্তু প্রশ্ন, তাহলে 'জোনাকী যুগ' অর্থাৎ 'বেজবরুয়া যুগের' অসমীয়া সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কী ?

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইংরেজী

সাহিত্যের প্রেরণার স্থল ছিল ফরাসী ও ল্যাটিন সাহিত্য । প্রায় সেসময়ের সব ইংরেজ কবি–লেখকই ফরাসী ও ল্যাটিন জানতেন । কেবল ইংরেজ নয়, ইউরোপের বহির্ভূত বহুদেশের সারস্বত সাধকগণ ওই ভাষা দু'টি শ্রদ্ধার সঙ্গে অধ্যয়ন করতেন । এই সময়ের ইংরেজী কবিতায় প্রাণের স্পর্শ ততটা অনুভূত হয় না, হৃদয় নয় বুদ্ধিকেই এই সময় শ্রেষ্ঠ কবিতার শিরোপা দেওয়া হত । স্বাভাবিকভাবেই এই সময়ের কবিতায় শব্দবিলাস প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয় । এই ধরণের বিলাসিতার সংক্রমণ অসমীয়া সাহিত্যেও দৃষ্ট হয় । বেজবরুয়ার 'কদমকলি'র অর্ন্তগত 'চন্দ্রাধার দ্বন্দ্ব', 'খোয়া খোয়া', 'ভারতবর্ষীয় জাতীয় সংগীত', 'বৃন্দাবন চন্দ্রবলী সংবাদ', 'ছয়ঋতুর ডাক', ইত্যাদি কবিতা রেস্টোরেশন যুগের ব্যঙ্গাত্মক কবিতার আদর্শে রচিত বলে অনুমান করা যায় । কারণ বেজবরুয়ার পূর্বে এই জাতীয় কবিতা অসমীয়া সাহিত্যে দেখা যায় নি । ১৪

শ্রী হেমন্ত কুমার শর্মা যথার্থই বলেছেন, " আধুনিক অসমীয়া কবিতার সৃষ্টির গুরিতেই হ'ল পরবর্তী অসমীয়া কবি সকলর পোনপটীয়াকৈ পাশ্চাত্য কবিতা অধ্যয়ন আরু তার হুবহু অনুকরণ ফল ।'' ১৫

'জোনাকী যুগে'র সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে রোমান্টিক ভাবধারা স্পষ্ট । এই রোমান্টিক ভাবধারা ইউরোপে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এসেছে ,। অসমীয়া ভাষায় এই ভাবধারা এসেছে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহায়তায় পরিপুষ্ট বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন থেকে । উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের অসমীয়া লেখকগণ ইংরেজী ও বাংলা উভয় সাহিত্যই সাগ্রহে অধ্যয়ন করতেন । ১৬

বর্তমান বিশ্ববিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে সংকুচিত হয়ে এসেছে । এখন প্রতিটি মানুষ কেবল দেশের সাহিত্য পাঠেই তৃপ্ত থাকে না, বিশ্বের অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত স্বীকৃত সারস্বত সাধকদের সাহিত্য কৃতির সঙ্গেও পরিচিত হতে চায় । বর্তমানে অসমীয়াদেরও অনুরূপ আগ্রহের অংকুরোদ্গম হয় 'জোনাকী যুগে'র অসমীয়া সাহিত্যে । একথা স্বীকার করতেই হবে 'জোনাকী'ই অসমীয়া সাহিত্যসেবীদের পাশ্চাত্যমুখী করে তোলে । নবজাগৃতির আন্দোলন সূচিত হয় এই 'জোনাকী' পত্রিকায় । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যে মিলনের সেতু রচনাও হয় এই পত্রিকার মাধ্যমে ।

পরিবর্তনশীলতা প্রাণের লক্ষণ । এই পরিবর্তন হতে হবে স্বতঃস্ফূর্ত ।রেস্টোরেশন যুগের সাহিত্যিকগণ রোমান্টিক ছিলেন না । কারণ তাঁদের রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে সনাতনী ভাব যার অন্য নাম ক্লাসিক । রেস্টোরেশন যুগকে মানুষ উদ্‌বাহু হয়ে স্বাগত জানালেও তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি । পরেই এসেছে অন্য এক যুগ । এই যুগের স্পন্দন

যাঁরা ধরতে পেরেছেন তাঁরা হলেন গ্রে, কলিনস; বার্ণস প্রমুখ কবি । এঁরাই প্রথম রেস্টোরেশন যুগের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন । কোলরিজ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকাশ করলেন "দি লিরিক্যাল ব্যালাডস্"১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে । এই বছরটি ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত স্মরণীয় । 'দি লিরিক্যাল ব্যালাডস্" রোমান্টিক যুগের সূচনা করে । এই বিশ্বখ্যাত কাব্য সংগ্রহের ১৯টি কবিতা ওয়ার্ডসওয়ার্থের বাকী ৪টি কোলরিজের । এই ২৩টি কবিতার ডানায় ভর করেই রোমান্টিক চেতনার মর্ত্য সঞ্চরণ । সেইসঙ্গে এল আরেক পরিবর্তন স্রোত । একদা যে কবিতার বেসাতি ছিল মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি, সেই কবিতা হৃদয় ও কল্পনার বশংবদ অনুগত জন হয়ে গেল । কবির প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে মূক মুখর হয়ে উঠল । তাঁরা সারা বিশ্বে শুনতে পেলেন এক মহাসংগীতের অনুরণন। শিশু ও প্রকৃতি তাঁদের কাছে পরম বিস্ময় ও আনন্দের প্রস্রবণ হয়ে দেখা দিল । তমসাচ্ছন্ন অতীতের মুখেএঁরা দিলেন ভাষা । অনুভব করলেন ব্যথিত পতিতদের অন্তর বেদনা ।মহা প্রকৃতি অপূর্ব সৌন্দর্য্য ও সত্যের উৎস হয়ে প্রতিভাত হল । ওয়ার্ডসওয়ার্থ অতিসাধারণ বস্তু বা ব্যক্তিতে অসাধারণত্ব আরোপ করে প্রকৃতি পূজায় আত্মনিয়োগ করলেন, আরোপ করলেন স্বাভাবিকতা । কোলরিজ আশ্রয় নিলেন অতি – প্রাকৃতিকে । কবি শেলী প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠলেন । বীরবেশে আত্মমুক্তির কামনায় যোগ দিলেন বাইরণ । সৌন্দর্য্য সাধনায় ধ্যানমগ্ন হলেন কীট্‌স । দূরাতীতের বুক থেকে মধু আহরণ করলেন স্যার ওয়াল্টার স্কট । আর এই সব বাক্ দেবীর 'বরপুত্র'দের মধ্যে দেখা গেল রুশোর বৈপ্লবিক জীবন দর্শন, জার্মান দার্শনিক কান্ট ও হেগেলের তুরীয়বাদ আর ফরাসী বিপ্লবের সাম্য - মৈত্রী - স্বাধীনতার অমোঘবাণী ।'জোনাকী' যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে এই প্রভাব বিশেষ করে অনুভূত হল । কিন্তু কী করে ? চন্দ্রপ্রসাদ শইকীয়া বলেন –''আধুনিক যুগত, দ্বিতীয় মহাসমরর প্ৰায় কিছু বছরর আগলৈকে, অসমীয়া সাহিত্যই মূল চারিটা উৎসর পরা নিজর সমল বিচারি লৈছিল - ভারতীয় সংস্কৃতি আরু সভ্যতা, অসমর প্ৰাচীন সংস্কৃতি আরু বুরঞ্জী, ইংরাজী সাহিত্য আরু শেষত বঙালী সংস্কৃতি আরু সাহিত্য" । ১৭ ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মাও বলেছেন -"পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবধারা অসমলৈ উনবিংশ শতাব্দীর আগছোয়াতে আমদানী হল যদিও প্ৰকৃত সৃষ্টিধৰ্মী সাহিত্যর প্ৰভাব শেষর ফালেহে ভালকৈ প্রবেশ লাভ করে আরু সেই প্ৰভাব বহুক্ষেত্ৰত বিলাতর পরা পোনে পোনে নাহি বঙ্গ – সাহিত্যর যোগেদিহে অসমত প্রবেশ করিছিল ।" ১৮ অসমীয়া সাহিত্যিকগণ মাইকেল

মধুসূদন দত্তের বিদ্রোহী ভাব কল্পনা; বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবির স্বদেশ প্রেম; বিহারীলালের আত্মলীনতা; রবীন্দ্রনাথের উন্নত রোমান্টিক কল্পনা ও বিশ্বানুভূতি; শরৎচন্দ্রের অপাংক্তেয় মানুষের প্রতি অপরিসীম টান - এসব কিছুর সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। তবে অসমীয়া সাহিত্যিকদের পরম কৃতিত্ব, তাঁরা কী বাংলা কী পাশ্চাত্য সাহিত্যকে অন্ধ অনুকরণ করেন নি, স্বীকরণের সঙ্গে স্বকীয়তা প্রদর্শনও করেছেন। যা ছিল পরের, প্রতিভার গুণে তা হল ঘরের। এই গুণ 'জোনাকী' যুগ' তথা 'বেজবরুয়া যুগে'র অধিকাংশ সাহিত্যিকের মধ্যে ছিল এবং সেইজন্য অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসে বেজবরুয়া যুগের সাহিত্যিকদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

বেজবরুয়া যুগের কবিগণ ইংরেজী অনুরাগ - মূলক কবিতার সংস্পর্শে এসে লিরিক বা খন্ড কবিতা রচনায় ব্রতী হন। প্রাক্ - বেজবরুয়া যুগের কবি বলদেব মহন্ত, রমাকান্ত চৌধরী প্রমুখের রচনায় কবির প্রাণস্পর্শের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁরা নব-কবিতার কোন ধারা সৃষ্টি করতে পারেন নি। পাশ্চাত্য কাব্যের রোমান্টিক লিরিক উচ্ছ্বাস বেজবরুয়া যুগের অসমীয়া কবিদের হাতে নতুন ভাবে ও রূপে প্রকাশিত হল। এই যুগের কবিগণ তাঁদের কাব্যবীণায় একটি নতুন সুর ধ্বনিত করলেন। তাঁরা স্বাধীনতার জয়গান গাইতে শুরু করলেন। প্রকৃতি, সৌন্দর্য, ব্যক্তিগত প্রেম - প্রণয় ও ক্ষুদ্র মানব কবিতার স্বতন্ত্র বিষয় বস্তু হয়ে উঠল। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত অসমীয়া কবির চোখেও সাধারণ অসাধারণ হয়ে প্রতিভাত হল। ধর্মানুশাসনের নির্মোক থেকে প্রেম মুক্তি পেলো। ব্যক্তিগত প্রেমকথা কবিতায় সাদর অভ্যর্থনা পেলো। দুর্বার হৃদয়বৃত্তি সর্ব বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে আত্মপ্রকাশে উন্মুখ হল। ভাষা - শৈলী জনগণের পরিচিত রূপ নিল। কাব্যের সংবেদনশীলতা প্রত্যক্ষ ও প্রাঞ্জল হল। তবে আনন্দের কথা, অসমীয়া লেখকগণ ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদ ও অধ্যাত্ম চিন্তাকে বর্জন করলেন না। ১১ চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার নিজস্ব গাম্ভীর্য ভূষিত ছন্দসঙ্গীতে গণতান্ত্রিক সুর বেজে উঠল। অনুরূপ সুর শ্রুত হল কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের 'চিন্তানল' ও চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার 'বীণবরাগীতে'। অসমীয়া জাতীয় সাধুকথা ও লৌকিক গীতি - কবিতার বিস্তৃত ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য পূর্ণ অনুসন্ধান না চললেও লোক কবিতার প্রভাব কিছু সংখ্যক কবির লিরিকে দেখা যায়। স্কটের উপন্যাসে দুর্গ,

রাজপ্রসাদ, ঐতিহাসিক স্থান প্রভৃতির সুনিপুণ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এইরূপ বর্ণনা স্কটের মত প্রনবন্ত না হলেও রজনীকান্ত বরদলৈর উপন্যাসেও দেখা যায়। স্কটের এই দৃরপনেয় প্রভাব কেবল বাংলা ও অসমীয়া সাহিত্যে নয়, রাশিয়া ও ফ্রান্সের সাহিত্যেও দেখা যায়। ২০

বেজবরুয়া পাশ্চাত্য ছোটগল্পের অনুকরণে অসমীয়া সাধুকথার নতুন রূপ দিয়ে এক শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করলেন। ভিক্টোরিয়া যুগের উপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের বিদুপাত্মক সৃষ্টি পিক উইকের আদর্শে এবং বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের' আদর্শে বেজবরুয়া 'কৃপাবর বরুয়া' (পরে বরবরুয়া) ছদ্মনামে এক রাগী পেটুক চরিত্র সৃষ্টি করে হাস্যরসের বিচিত্র ধারার অভিপ্রকাশ ঘটালেন। নিতান্ত নীরস বস্তুও অত্যন্ত সরস করে চিত্রিত হল। মানব প্রেম অনুরাগ, দেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয়ক কাব্য, সনেট, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্য কবিতা, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ছোটগল্প, আধুনিক নাটক, সমালোচনা, হাস্যকৌতুক তথা প্রহসন প্রভৃতি বিচিত্র সাহিত্য অসমীয় নব জাগৃতি আন্দোলনে সৃষ্টি হল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতা প্রবাসী অসমীয়া তরুণ ছাত্রগণ বাংলা নাটক ও অভিনয় দেখে অনুপ্রাণিত হন। তাঁরা বাংলা নাটক ও অভিনয়ের আর্দশ সামনে রেখে অসমীয়া নাটক লিখতে ও অভিনয় করতে প্রয়াসী হন। তাঁদের এবং অন্যান্য উৎসাহী ব্যক্তির প্রযত্নে আসামের প্রধান কয়েকটি সহরে কলকাতার রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে রঙ্গমঞ্চ ও নির্মিত হয়। প্রথমাবস্থায় এইসব রঙ্গমঞ্চের অধিকাংশই ছিল অস্থায়ী। কালক্রমে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত থাকে। আসামের রঙ্গমঞ্চ নির্মাণে অনেক বাঙালী নাট্য রসিকের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় - যেমন - গোপাল ওস্তাদ, বরদাপ্রসন্ন মজুমদার প্রভৃতি। ২১ ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ বেজবরুয়া যুগে রচিত অসমীয়া সাহিত্য নানান রোমান্টিক প্রচেষ্টার একটি যুগ। এই যুগের প্রভাব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে এই শতকের চতুর্থ দশকের শেষ দিক। আরেক নতুন যুগ আত্ম প্রকাশের ইচ্ছায় ব্যাকুল হয়ে উঠে, এটিই অতি - আধুনিক যুগ। এই আত্ম প্রকাশের ব্যাকুলতা অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণোচ্ছলতাকেই সূচিত করে, তবে তা আমাদের পরিকল্পিত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের আলোচ্য, বেজবরুয়া যুগের অসমীয়া সাহিত্য, যার সীমারেখা আমরা টেনেছি ১৯৪০ সাল অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত।

সূত্র

- সূত্র নির্দেশ -

১। অসমীয়া উপন্যাসের ভূমিকা – ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ নাথ শর্মা – পৃঃ ৩১ ।

২। 'সঞ্চয়নের ভূমিকা 'অসমীয়া কবিতার কাহিনী' - ডঃ মহেশ্বর নেওগ ।

৩। মোর জীবন সোঁওরন - লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া প্রথমভাগ, ষষ্ঠ, সপ্তম প্রভৃতি অধ্যা ।

৪। ঐ ১১৭

৫। ঐ ১১৯

৬। হেমেন বরগোহাঞি সম্পাদিত বিংশ শতাব্দীর অসমীয়া সাহিত্য পৃঃ ১১২ ।

৭। " শিক্ষা'', 'শিক্ষার হেরফের' – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - পৃঃ ২৮৬ (রবীন্দ্রচনাবলী, ১২ শ খণ্ড বিঃ ভাঃ সং)

৮। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যর জিলিঙনি - ডঃ শ্রী হরিচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৭৩ ।

৯। অসমীয়া উপন্যাসর ভূমিকা - ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা। পৃঃ ৬৪ ।

১০। হেমেন বরগোহাঞি সম্পাদিত বিংশ শতাব্দীর অসমীয়া সাহিত্য, পৃঃ১৬২।

১১। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য–ডঃ মহেশ্বর নেওগ, পৃঃ ২১ ।

১২। অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা – ডঃ মহেশ্বর নেওগ, পৃঃ ২৬৭ ।

১৩। মোর জীবন সোঁওরন – লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, ২।৩।

১৪। রসরাজ বেজবরুয়া – শ্রী শশী শর্মা, পৃঃ ৭৯।

১৫। অসমীয়া সাহিত্যত দৃষ্টিপাত – হেমন্তকুমার শর্মা, পৃঃ ২১৩ ।

১৬। ঐ

১৭। চন্দ্র প্রসাদ শইকীয়া সম্পাদিত 'পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া'র ভূমিকা ।

১৮। অসমীয়া নাট্য সাহিত্য – ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা, পৃঃ ১০৯ ।

১৯। অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা – ডঃ মহেশ্বর নেওগ, পৃঃ ২৬৮-৬৯ ।

২০। অসমীয়া সাহিত্যর ঐতিহাসিক উপন্যাস –ডঃ শৈলেন ভরালী, পৃঃ ৬।

২১। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যর জিলিঙনি – ডঃশ্রীহরিচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ১১২-২৭ ।

তৃতীয় অধ্যায়

বেজবরুয়া যুগের সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের পরিচয়

বেজবরুয়া যুগের সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ এবং তার বিভিন্ন ভাব ও রূপের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটটি সামনে থাকলে তবে আমরা অসমীয়া সাহিত্যের উপর বাংলা সাহিত্যের প্রভাব নিরূপণে সক্ষম হব । তাই এখানে আমরা ঐ সময়ের বাংলা সাহিত্যেরপ্রধান দিক্ গুলি এবং উল্লেখযোগ্য স্রষ্টাদের সৃষ্টির উল্লেখমাত্র করব, বিস্তৃত আলোচনা নয়, যেহেতু এই সমস্ত তথ্য সর্বজনবিদিত । এই সাহিত্যিকদের প্রভাব অসমীয়া সাহিত্যিকদের কার কার উপর কি ভাবে পড়েছে, তা' বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে পরবর্তী অধ্যায় সমূহে । 'জোনাকী'র প্রকাশ কাল অর্থাৎ ১৮৮৯ সাল থেকেই বেজবরুয়া যুগের সূচনা কেন ধরা হয় তার আলোচনা পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে । বাংলা সাহিত্যে অনুরূপ আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছে XXXXXX আরও অন্ততঃ ত্রিশ বছর আগে থেকে অর্থাৎ মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনার সূচনা থেকে । শর্মিষ্ঠার রচনা কাল ১৮৫৯ সাল । সেই নব্য সাহিত্য আন্দোলনের লক্ষণীয় পরিণতি আমরা নির্দেশ করছি রবীন্দ্রনাথের তিরোধান কাল অর্থাৎ ১৯৪১ সাল পর্যন্ত আশী বৎসর । উল্লেখ্য এই যে বেজবরুয়া রবীন্দ্রনাথের তিন বৎসর পূর্বেই ১৯৩৮ সালে তিরোহিত হন ।

কলকাতাতে বিজয়ী ইংরেজগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই নাট্যাভিনয় শুরু করেন । বলা বাহুল্য, ইংরেজের ইংরেজী নাট্যাভিনয় দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী তরুণের দল রঙ্গমঞ্চে নাটকাভিনয়ে প্রয়াসী হয় । প্রথম দিকে ইংরেজী নাটক, তারপর সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ অভিনীত হতে থাকে । বাংলা নাটকাভিনয় তারও পরের কথা ।

বাংলা দেশে সর্বপ্রথম নাটমঞ্চে বাংলা নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন এক রুশীয় ভদ্রলোক, নাম হেরাসিম লেবেডফ (অথবা জেরাসিম ?) চীনে বাজারের কাছে ডোমতলা লেনে তিনি 'বেঙ্গলী থিয়েটার' স্থাপন করেন । এই নাটমঞ্চে "ডিজগাইজ" (১৭৯৫) এবং 'লাভ ইজ দি বেস্ট ডকটর, (১৭৯৬)

নামক দু'টি ইংরেজী নাটক প্রহসনের বাংলা অনুবাদ করিয়ে বাঙালী অভিনেতা - অভিনেত্রী দিয়ে তিনি অভিনয় করিয়েছিলেন । সেই থেকে বাংলা নাটকের শুভযাত্রা শুরু হয়েছে । আধুনিক বাংলা নাটকে প্রাণসঞ্চার করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত । মধুসূদনের পূর্বে যেসব নাটক - প্রহসন রচিত হয়েছে তার মধ্যে যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস'(১৮৫২), তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২), ও রাম নারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব'(১৮৫৪) উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' (১৮৫৬) শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় ।

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের প্রথম আবির্ভাব নাট্যকার রূপে, তাঁর মতে 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে'। তাই তিনি উৎকৃষ্ট নাটক লিখতে ব্রতী হয়েছিলেন । তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) নাটকটির উপজীব্য বিষয় বহু জনশ্রুত মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্ভুক্ত শর্মিষ্ঠা - দেবযানী - যযাতি প্রণয়-বৃত্ত । মধুসূদনের দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী'(১৮৬০) গ্রীক পুরাণের বিখ্যাত গল্প 'আপল অব্ ডিসকর্ড' অবলম্বনে রচিত । তিনি ভারতীয় ছাঁচে পাশ্চাত্য গল্পটি পরিবেশন করেছেন । মধুসূদন এই নাটকের কলির উক্তিতে কয়েকছত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেন । সূচনা হল কাব্যে ছন্দোগত বিপ্লবের । কর্ণেল টডের 'এ্যানালস্ এ্যান্ড এ্যান্টিকুইটিস অব রাজস্থান' থেকে কাহিনী নিয়ে মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক (১৮৬১) রচনা করেন । এই নাটকের নায়িকা কৃষ্ণা আত্মহত্যা করে পিতা ও পিতৃরাজ্যকে নিশ্চিন্ত করেন । বাংলা নাটকের ইতিহাসে এই ট্রাজিক নাটকের স্থান বেশ উচ্চে ।

পাইকপাড়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার সিংহ ভ্রাতাদের অনুরোধে মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) এই দু'টি প্রহসন রচনা করেন । প্রথমটিতে নাগরিক কলকাতার তরুণ সমাজকে এবং দ্বিতীয়টিতে গ্রাম বাংলার ধর্মধ্বজী বৃদ্ধদের আক্রমণ করা হয়েছে । মধুসূদন মূলত: কবি, তথাপি নাট্যকার হিসেবে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় ।

মধুসূদন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের সূচনা করেন । তারপর দীনবন্ধু মিত্র সমসাময়িক সমাজজীবনের অতি উজ্জ্বল আলেখ্য রচনা

করেন । দীনবন্ধুর অমর সৃষ্টি 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) । নীলকর সাহেবদের নির্মম অত্যাচারের কথা এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে । প্রহসন তথা প্রহসনধর্মী নাটকও দীনবন্ধু লিখেছেন ,। যেমন -'সধবার একাদশী'(১৮৬৬), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', (xxxxx ১৮৬৬)'জামাই বারিক' (১৮৭২),। এতে তাঁর প্রতিভা আত্মপ্রকাশের যথার্থ পথ খুঁজে পেয়েছে । দীনবন্ধু কমেডি রচনায় সিদ্ধহস্ত । মধুসূদন থেকে ('শর্মিষ্ঠার' প্রকাশ কাল ১৮৫৯) গিরিশচন্দ্র ঘোষ (তাঁর প্রথম গীতিনাট্যের প্রকাশ কাল ১৮৭৭) পর্যন্ত কয়েকজন নাট্যকার নাট্যকার মঞ্চসফল অনেকগুলি নাটক রচনা করেন । তাঁরা হলেন মনোমোহন বসু , (১৮৩১ - ১৯১২) জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, (১৮৪৮ - ১৯২৫) রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯ - ১৮৯৪) এবং উপেন্দ্র নাথ দাস (১২৫৫ - ১৩০২ বাং) ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত আমরা দু'জন প্রতিভাশালী নাট্যকার পাই । এঁদের একজন নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮৪৪ - ১৯১১) xxx এবং অন্যজন রসরাজ অমৃতলাল বসু (১৮৫৩ - ১৯২৯)। গিরিশ চন্দ্র ছিলেন একাধারে নট - নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক । গিরিশচন্দ্রের 'অভিমন্যু বধ' (১৮৮১), 'জনা'(১৮৯৪), 'পান্ডব গৌরব' (১৯০০) মঞ্চসফল নাটক, এগুলি নানা স্থানে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় । তাঁর পৌরাণিক ও ভক্তিরসাত্মক নাটকে তাঁর অকপট হৃদয়ের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় । সমসাময়িক রাজনৈতিক ও স্বাদেশিক উত্তাপও তাঁর কয়েকটি নাটকে ফুটে উঠেছে । যেমন — 'সিরজউদ্দৌলা' (১৯০৬), 'মীরকাশিম'(১৯০৬) প্রভৃতি। সামাজিক নাটকও তিনি লিখেছেন । তাঁর 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯) সর্বাধিক জনপ্রিয় মঞ্চসফল নাটক । 'যোগেশের সাজানো বাগান শুকিয়ে' যাওয়ার কাহিনী এই নাটকে অত্যন্ত আবেগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে বিবৃত হয়েছে ।

গিরিশচন্দ্র উচ্চারণ ও অভিনয়ের সুবিধার জন্য ১৪ মাত্রার অমিত্রাক্ষর পদ্ পক্তিকে ভেঙ্গে ছোট ছোট ছত্রে বিভক্ত করেন । এই ছন্দোবৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যে 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিত । এই ছন্দ অমিত্রাক্ষর ছন্দের মতই একদা জনপ্রিয় হয়েছিল ।অমৃতলাল বসু রঙ্গ - নাটক ব্যঙ্গ প্রহসন রচনাতে সিদ্ধহস্ত x ছিলেন । সেজন্য তিনি 'রসরাজ' বলে পরিচিত ।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উন্মাদনার কালে ছোট বড় অনেক নাট্যকার জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক রচনা করেন । এই ধারার নাট্যকারদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের (১৮৬৩ - ১৯১৬) । 'তাঁর রচনার শুরু জাতীয়তাবোধে এবং উত্তরণ বিশ্ববোধের অমৃত লোকে ।। ১ দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক কয়টি নাটক রচনা করেন । যেমন – 'প্রতাপসিংহ'(১৯০৫), 'সীতা'(১৯০৮), 'মেবার পতন'(১৯০৮), 'সাজাহান'(১৯০৯), প্রভৃতি । বাংলার বাইরেও তাঁর নাটক অনূদিত হয়ে অভিনীত হয়েছে । দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ভাষা কাব্যময় অলংকারবহুল । তাঁর নাটকের জনপ্রিয়তা এখনও বিদ্যমান । তাঁর নাট্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'সাজাহান' । অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যেও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব কম নয় ।

এই সময়কার আরেকজন জনপ্রিয় নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৪ - ১৯২৭)। 'নন্দকুমার'(১৩১৪) , 'আলমগীর'(১৯২১), 'নরনারায়ণ' (১৩৩৩) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক । তাঁর নাটকে বহির্ঘটনাগত বিস্তারের চেয়ে অন্তর্মুখী দ্বন্দ্বসৃষ্টির প্রয়াসই বেশী করে পরিলক্ষিত হয় ।

রবীন্দ্রনাথও নাটক লিখেছেন । রবীন্দ্রনাথ মূলত: গীতিকবি , তাঁর নাটক তাঁর কাব্য প্রত্যয়েরই বাহন ।'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'(১৮৮৪), 'চিত্রাঙ্গদা'(১৮৯২), 'মালিনী'(১৮৯৬), 'ডাকঘর'(১৯১২), 'মুক্তধারা'(১৯২৫), 'রক্তকরবী' (১৯২৬), প্রভৃতি তাঁর নাট্যপ্রতিভার অবিস্মরণীয় কীর্তি । নাটকের কোন কোন শাখায় তিনি অসাধারণ এবং মৌলিক , বিশেষত: কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য ও রূপক - সাংকেতিক নাটকে ।

।। মহাকাব্য ।।

১৮৫৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয় । তিনি পুরাতন ধারার শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন । ইতিমধ্যে ইংরেজী শিক্ষাপ্রণালী দেশের সর্বত্র ক্রমশ: ছড়িয়ে পড়েছে, আয়োজন চলেছে বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের । পাশ্চাত্য জীবন - দর্শন ও কাব্যপ্রত্যয়ী বাঙালী

সারস্বত সাধককে নব দিগন্তে ব্যাকুল করে তোলে । রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ আধুনিক জীবনোল্লাসের দ্বার উন্মোচন করেন । বস্তুতঃ এঁরাই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী রেনেসাঁস তথা নবজাগৃতি আন্দোলনের নান্দী পাঠ করলেন । রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭ - ১৮৮৭) ইংরেজী ঐতিহাসিক আখ্যান-কাব্যের আদর্শে রাজপুত দেশ প্রেমের ঘটনা অবলম্বনে স্বদেশ - প্রেম - আশ্রিত ইতিহাসভিত্তিক 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) আখ্যানকাব্যের পত্তন করেন । এই হিসেবে বাংলা কাব্যে পালা বদল - এর রাজগৌরব সর্বপ্রথম রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়েরই প্রাপ্য । ২ তারপর এলেন নবজীবনের বার্তাবহ হয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ - ৭৩) । বাংলা কাব্যের অঙ্গনে তাঁর লেখনী - স্পর্শে প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠল । এতদিনের মধ্যযুগীয় ও ধর্মীয় জীবনপ্রত্যয় ও কাব্যাদর্শের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হল । সেই সঙ্গে নতুন কাব্যরূপ ও জীবন প্রত্যয় দেখা গেল । পাশ্চাত্য আদর্শে মধুসূদন মহাকাব্য (রীতিসিদ্ধ মহাকাব্য না হলেও যাকে মহৎকাব্য বলা চলে) আখ্যানকাব্য, পত্রকাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতি রচনা করে কেবল বাংলা সাহিত্যে নয় ভারতীয় অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্যেও অমর হয়ে আছেন । 'তাঁহা ইংরেজ' 'নব প্রমিথিউস' এই মহা-কবির অমর সৃষ্টি 'মেঘনাদ বধ কাব্য'(১৮৬০) । এই কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত । অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা হিসেবে বাঙালী পাঠক তাঁকে কোনোদিন বিস্মৃত হতে পারবে না । এই ছন্দে রচিত তাঁর প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমা সম্ভব'(১৮৬০)। তাঁর পত্রকাব্য 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ও (১৮৬২) এই ছন্দে রচিত । বাংলায় সনেট রচয়িতা হিসেবেও তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন । মধুসূদন বাংলাকাব্যে যুগপুরুষ । তিনিই রাবণ-মেঘনাদকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন ।'বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন স্বকীয় মানবতাবোধ এবং জাগ্রত বুদ্ধিতে ভাগ্য বিড়ম্বিত রাবণ ও মেঘনাদের মধ্যেই খুঁজিয়া পাইলেন মনুষ্যত্ব ও পুরুষকারের মহিমা'। ৩

নানান ধরণের কাব্য, লিরিক কবিতা , ব্যঙ্গরসের কবিতা, নাটকানুবাদ, কবিতানুবাদ প্রভৃতির দ্বারা একজন বঙ্গ সন্তান আধুনিক বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন, ইনি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । হেমচন্দ্রের অমর সৃষ্টি 'বৃত্র সংহার' (প্রথম খণ্ড ১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড - ১৮৭৭) ।'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র

পরেই এই কাব্যের স্থান । এই কাব্যে দেবতাদের স্বদেশপ্রেম ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা প্রীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় । তাঁর 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪) স্বদেশ প্রেমের কাব্য । তাঁর প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশ প্রেমাশ্রিত কয়েকটি কবিতা এখনও স্মরণীয় । তাঁর 'হতাশার আক্ষেপ', 'ভারত সংগীত' কবিতা এক সময় সাধারণ পাঠকের কণ্ঠস্থ ছিল । লং ফেলোর কবিতা 'The Psalm of life' -এর অনুবাদ 'জীবনসঙ্গীত' কবিতাটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল ।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭ - ১৯০৯) এক সময় সমগ্র দেশে 'পলাশীর যুদ্ধের (১৮৭৫) কবি বলে পরিচিত হয়েছিলেন । কেউ কেউ তাঁকে বাংলার বায়রণও বলতেন । 'পলাশীর যুদ্ধ' ইতিহাসাশ্রিত স্বদেশপ্রেমের আখ্যান কাব্য । তাঁর 'রঙ্গমতী' (১৮৮০) কাল্পনিক, রোমান্টিক ও স্বদেশপ্রেমের কাহিনী । নবীন চন্দ্রের রৈবতক - কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে'র (১৮৮৭ - ১৮৯৬) নামে সর্বজন বিদিত । শ্রী কৃষ্ণের পূত চরিত্র অবলম্বনে এই ত্রয়ীকাব্য রচিত । সেখানে শ্রেষ্ঠ মানব কৃষ্ণ - চরিত্রের মাধ্যমে ভাবী ভারতের সামাজিক/ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ঐক্য প্রচারিত হয়েছে নবযুগের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূল । নবীনচন্দ্রের অধিকাংশ রচনায় স্বদেশ প্রেম তথা মানব প্রেম প্রাধান্য পেয়েছে । সেই সঙ্গে বিশ্বচেতনাও তাঁকে প্রবুদ্ধ করেছে । ৪ রঙ্গলালের কাব্যে যে বীজ রোপিত হয়েছিল, মধুসূদন - হেমচন্দ্রে তা মহীরূহে পরিণত হয়ে নবীনচন্দ্র পর্যন্ত সগৌরবে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছিল, তারপর মহাকাব্যের এই ধারাটি বিস্মৃতির বালুকাতলে অবলুপ্ত হয়ে যায়, আসে গীতি কবিতার প্রবল প্রবাহ । গীতিরস বাঙ্গালীর মজ্জাগত । জয়দেব থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা কাব্য প্রধানত: গীতিরসসিক্ত । মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের অনুবর্তী নবীনচন্দ্র যখন মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তখনই এই মহাকাব্যের মহাস্রোতের পাশাপাশি দু'টি অনুদ্বেলিত স্রোত প্রবহমান ছিল বাংলা সাহিত্যে । এই স্রোতদ্বয়ের একটি গীতিকাব্য-ধারা, অন্যটি আখ্যানকাব্য-ধারা । আখ্যান কাব্যে ছিল মহাকাব্যের মত কাহিনীরস, ছিল গীতিকবিতার মত রোমান্টিকর কল্পনা প্রাধান্য। মহাকাব্যের মত আখ্যানকাব্যের ধারাটিও শুকিয়ে গেল । তার স্থানে গীতিকবিতার ধারাটি সুপ্রতিষ্ঠিত হল । ৫

।। গীতিকাব্য ।।

গীতি কবিতার জন্ম স্বতস্ফূর্ত ব্যক্তি অনুভূতি থেকে । গীতি কবিতা কবির ব্যক্তি - চেতনার রঙে রঙীন, মনের মাধুরিমা জড়ান । গীতিকবিতা আত্মলীন কাব্য । আধুনিক গীতিকবিতার প্রথম সচেতন কবি বিহরীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫ - ১৮৯৪) । পাঠকগণ মহাকাব্যের বিশাল প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করে অন্তর্লোকের সুদূর অভিসারে যাত্রা করলেন । বাংলা কাব্যের এই পালাবদলের যথার্থ সূচনা বিহারীলাল থেকে, যদিও মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' ও 'বঙ্গভাষার প্রতি' (১৮৬২) কবিতা দু'টিতে এই গীতিলক্ষণ কিছুটা আত্ম প্রকাশ করেছিল । বিহারীলালের 'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্য ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয় । এতে জড় প্রকৃতির একটি প্রাণময় সত্তা স্বীকৃত হয়েছে । তাঁর 'সারদামঙ্গল' (১৮৮৯) কবি - মানসীর একটি সু চিরস্থায়ী আলেখ্য । এই কাব্যটির দ্বারা রবীন্দ্রনাথও প্রভাবিত হয়েছেন । এই কাব্যই তাঁকে ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিদের গুরুস্থানীয় করেছে । রবীন্দ্রনাথ-সমসাময়িক গীতিকবিদের মধ্যে সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার (১৮৩৮ - ৭৮) অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০ - ১৯১৯) দেবেন্দ্রনাথ সেন , (১৮৫৮ - ১৯২০) গোবিন্দ চন্দ্র দাস (১৮৫৪ - ১৯১৮) প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ।

গীতিকবিতার চরম রূপ পাই রবীন্দ্রনাথে (১৮৬১ - ১৯৪১) । মাত্র বার বৎসর বয়স থেকে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন । ৮০ বৎসর পর্যন্ত তিনি গীতি কাব্যের প্লাবন বইয়ে দিয়েছেন । প্রাণশক্তির প্রচুরতায় ভাবাবেগের গভীরতায় রোমান্টিক মানসের কল্প - স্বর্গ - পরিক্রমায় রূপ -অরূপের লীলার তাৎপর্য বর্ণনায় তাঁর কাব্য অনবদ্য । রবীন্দ্রনাথ বহু কাব্য রচনা করেছেন । তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য - 'প্রভাত সঙ্গীত' (১৮৮৩), 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'নৈবেদ্য' (১৯০১), 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) , 'বলাকা' (১৯১৬) প্রভৃতি ।

১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ সালের রচনায় কবি সর্বপ্রথম রোমান্টিক স্বপ্নলোক থেকে মর্ত্যলোকে অবতরণ করলেন । এই পর্বের উল্লেখযোগ্য কাব্য

'সন্ধ্যা সঙ্গীত' (১৮৮২), 'প্রভাত সঙ্গীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান'(১৮৮৪), 'ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪), 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) । এই পর্ব থেকেই কবির কাব্যধারার যথার্থ বিকাশের সূচনা । 'প্রভাত সঙ্গীতের' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রবীন্দ্র কাব্যধারার একটি বিশিষ্ট কবিতা । এই কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের নব্য দৃষ্টিভঙ্গীর দ্যোতক হিসেবেও চিহ্নিত করা যায় । রবীন্দ্র কাব্যজীবনের প্রথম স্বকীয়তার সূচনা পরিলক্ষিত হয় 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে । এই কাব্যে রবীন্দ্র নাথের মর্ত্যপ্রীতি পরিস্ফুট হয়েছে ।

'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬) ও 'চৈতালী' (১৮৯৬) এই কাব্য চতুষ্টয় কবির ৩০ থেকে ৩৫ বৎসরের মধ্যে রচিত । 'মানসী' তে রবীন্দ্রনাথের কাব্য স্বরূপে স্থিত হতে চলেছে । এতে আছে চিত্ররীতি ও সঙ্গীত রীতির কবিতা । 'সোনার তরী'তে কবি - প্রতিভা পরিণতি লাভ করেছে । 'যেতে নাহি দিব', 'বসুন্ধরা', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা এই কাব্যের অন্তর্গত । রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা'কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'জীবন দেবতা', 'প্রেমের অভিষেক', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' 'এবার ফিরাও মোরে', 'উর্বশী' ।এই কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় জীবনদেবতার উপলব্ধি, ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা, বৃহৎ জীবনের জয়গান প্রকাশিত হয়েছে । 'কল্পনা' কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা 'দুঃসময়' 'স্বপ্ন', 'বর্ষামঙ্গল' প্রভৃতি । রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকায়' লিরিক প্রাধান্য । 'নৈবেদ্য' আইডিয়া প্রধান কাব্য । 'রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির' কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত । 'বলাকা' কাব্যের 'সাজাহান' 'ছবি', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কবিতা । 'পুনশ্চ' থেকে রবীন্দ্রনাথের নতুন কাব্যোপলব্ধি সূচিত হয় । এই কাব্য থেকেই গদ্য - কবিতার সূচনা, এবং 'শ্যামলী' পর্যন্ত গদ্য - ছন্দই রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশের বাহন হয়েছিল । ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন — "গত দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে বিশ্বসংস্কৃতির যে ধারাপ্রবাহ চলেছে, রবীন্দ্রকাব্য যে তারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তাতে কোন সন্দেহ নেই ।" [৬]

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আশীর্বাদ নিয়ে যাঁরা বাংলা কাব্যের অঙ্গনে

প্রবেশ করেছেন তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ছন্দোরাজা বলতেন। তাঁর 'কুহু ও কেকা' (১৯১২) কবিতা গ্রন্থটি সর্বজনবিদিত। কেবল মৌলিক কবিতা নয়, তিনি অনেক অনুবাদ কবিতাও লিখেছেন। (দ্রঃ 'তীর্থ সলিল' (১৯০৮), তীর্থরেণু' (১৯১০)। তাঁর কবিতায় ভাব গভীরতা ছিল না, ছিল রূপসৌন্দর্য, আপাত শ্রুতিসুখকর ধ্বনিসৌন্দর্য।

সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র - প্রভাবিত হলেও স্বকীয়তা বর্জিত নন, এবং রবীন্দ্রযুগেও যে তিনি কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন তা' সম্ভবতঃ ঐ স্বকীয়তার জন্যই। সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব বাংলা সাহিত্যের অনেক আধুনিক কবির মধ্যে অনুভূত হয়। যেমন - সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ প্রভৃতি। আঙ্গিক ও ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে 'তাঁর কবিতার মনোধর্মের অভাব অত্যন্ত শোকাবহ ভাবে আমাদের আঘাত করে'।[৭]

সত্যেন্দ্রনাথের সমসাময়িক আরেকজন কবি রণভেরী নিয়ে কাব্যের অঙ্গনে উন্মাদনা সঞ্চার করেন, ইনি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯ - ১৯৭৬)। দেশের সমস্ত মানুষকে তিনি যৌবনধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহীর' 'বল বীর বল উন্নত মম শির' এখন একরকম প্রবাদে পর্যবসিত। তাঁর 'অগ্নিবীণা' বঙ্গবাণীকে ঝংকৃত করেছে উচ্চ সুরে। নজরুল গানও লিখেছেন। তাঁর গান 'নজরুল-গীতি' নামে পরিচিত। একথা ঠিক তাঁর অনেক কবিতা 'ভাবালুতায় আবিল, অনর্গল অচেতন বাক্য বিন্যাসের রুদ্ধস্রোত',[৮] তবু অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যে নজরুলের উদ্দীপনাময়ী কবিতার প্রভূত প্রভাব লক্ষণীয়।

আরও দু'জন কবি এই গীতিকাব্য ধারায় স্মরণীয়। তাঁরা হলেন -- যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদার। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলা কাব্য - বীণায় একটি নতুন সুর তুললেন, তা হল দুঃখবাদ। সমসাময়িক বাংলা কাব্যে তাঁর প্রভাব পড়েছে ভাবের দিক থেকে নয়, রূপের দিক থেকে।[৯]

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় যেমন দুঃখবাদ প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি মোহিতলালের কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে তন্ত্রধর্মী নির্ভীক দেহবাদ।[১০] গীতিকাব্য ধারায় কয়েকজন মহিলা কবির নামও অবশ্যই স্মরণীয়। তাঁরা হলেন

গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী, কামিনী রায়, প্রিয়ংবদা দেবী, মানকুমারী বসু এবং স্বর্ণকুমারী দেবী । হিন্দু ঘরের কুলবধূর মর্মব্যথা, বৈধব্য যন্ত্রণা, পতিভক্তি, পারিবারিক জীবন - এই ছিল অধিকাংশ মহিলা কবির কাব্য রচনার বিষয়বস্তু । ১৯৩৪ সাল থেকে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের কাব্য সাধনা ভিন্নতর পথ সন্ধানে নিয়োজিত হয়, এবং একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্রধারা সৃষ্টি করে তোলে । এদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাস, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ্য ।

।। উপন্যাস ।।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ উপন্যাস রচিত হতে থাকে । অবশ্য ইতিপূর্বে প্যারিচাঁদ মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় উপন্যাস জাতীয় রচনার গোড়া পত্তন করেছিলেন । গল্প - আখ্যানকে দুইভাগে ভাগ করা হয় — রোমান্স ও উপন্যাস । রোমান্স কল্পনা প্রধান আখ্যান, উপন্যাস বাস্তবধর্মী কাহিনী । বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাণবাণী তথা জীবনরসে উদ্বোধিত করেন । এই মহৎ কর্মে তাঁর 'বঙ্গদর্শনের'(১৮৭২) ভূমিকা ছিল অপরিসীম । বঙ্গবাসী আত্মদর্শনের মন্ত্র খুঁজে পেয়েছিল এই মাসিক পত্রিকাটিতে।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৫ - ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত মোট ১৪ টি উপন্যাস রচনা করেন । তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'সীতারাম' । বঙ্কিমের উপন্যাসকে আলোচনার সুবিধার জন্য মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় । যদিও এই শ্রেণীবিন্যাস খুব সূক্ষ্ম নয় ।

১। ইতিহাস ও রোমান্স

২। তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস

৩। সমাজ ও গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস

ইতিহাস ও রোমান্স

দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, সীতারাম প্রভৃতি এই শ্রেনীর অন্তর্ভূক্ত। এরমধ্যে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে 'রাজসিংহ'কেই বুঝায়। বাকিগুলিতে আছে ইতিহাসের পটে সাধারণ মানুষের কথা। 'কপালকুণ্ডলা' তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ।

তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস

'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' এই জাতীয় উপন্যাস। 'আনন্দমঠ' বঙ্কিমের দেশাত্মবোধের মহাকাব্য। এই উপন্যাসের বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি এখনও কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত মানুষের মুখে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। 'দেবী চৌধুরাণী'র বিষয়বস্তু একটি মনোরম গার্হস্থ্য কাহিনী, সেই সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে সূক্ষ্মধর্মীয় অনুভূতি ও হিন্দুর সামাজিক আচার - আচরণের কথা।

সমাজ ও গার্হস্থ্য উপন্যাস

'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি এই শ্রেনীর উৎকৃষ্ট উপন্যাস। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' অনিবার্য রূপতৃষ্ণা ও রূপমুগ্ধ পুরুষ-রমনীর প্রবৃত্তি দমনে অক্ষমতার পরিণতি দেখান হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমের নৈপুণ্য প্রশ্নাতীত, এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বঙ্কিমের বিপুল প্রভাব অনস্বীকার্য।

বঙ্কিমের পরেই নাম করতে হয় রমেশ চন্দ্র দত্তের (১৮৪৮ - ১৯০৯)। তিনি সর্বমোট ৬টি উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির নাম — 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪), 'মাধবী কঙ্কণ (১৮৭৭), 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' (১৮৭৮), 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' (১৮৮৯),। এরমধ্যে প্রথম দু'খানি ঐতিহাসিক রোমান্স, 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ও রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' হল রমেশ চন্দ্রের দু'টি যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। তাঁর সামাজিক উপন্যাস 'সংসারে' (১৮৮৬) বিধবা বিবাহকে এবং 'সমাজে' (১৮৯৪) অসবর্ণ বিবাহকে সমর্থন করা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আরেক জন যশস্বী লেখক। তাঁর স্বর্ণলতা (১৮৭৪) উপন্যাসটি অত্যধিক জনপ্রিয় উপন্যাস। 'স্বর্ণলতার' অভিনয়যোগ্য সংস্করণ 'সরলা'। লেখকের জীবদ্দশাতেই গ্রন্থটির সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর একান্নবর্তী পরিবারের সমস্যা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। বঙ্কিমযুগে একাধিক উপন্যাস লিখে কিছুটা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি। এঁদের সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে না বলে আমরা সরাসরি পৌঁছে যাবো রবীন্দ্রনাথে, কেননা বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। তাঁর উপন্যাসে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণের বৈপ্লবিক নূতনত্ব সঞ্চারিত হয়। শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসটিকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক বলে চিহ্নিত করেছেন।[১১] বিনোদিনী বাল বিধবা। তার চিত্তে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আসক্তির জাগৃতি ও তার মানসিক পট পরিবর্তনের টানা-পোড়েন এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র (১৯১০) নাম তো সর্বজন বিদিত। একটা গোটা জাতির মানসিক সঙ্কটের এবং তা থেকে উত্তরণের কাহিনী এর মূল বক্তব্য। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) ও 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উগ্র স্বাদেশিকতার সঙ্গে নরনারীর চিত্ত বিক্ষোভ যুক্ত হয়ে গভীর সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। 'যোগাযোগ' (১৯২৯) দুটি ভিন্ন মানসিকতা ও সংস্কৃতির পরিবারে বৈবাহিক সম্বন্ধ থেকে উদ্ভূত সংঘাতের কাহিনী। আবার 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) এক কাব্যধর্মী রোমান্টিক কাহিনী। তারপর নাম করতে হয় শরৎচন্দ্রের। বাঙালী জীবনের সুখ দুঃখ ও অশ্রু-বেদনাকে সহানুভূতির রসে সিঞ্চিত করে এমন স্নিগ্ধ মধুর ও বেদনা বিধুর কাহিনী আর কেউ লিখতে পারেন নি। তাঁর সাহিত্যে মানুষের বেদনার ছবি এমন সুন্দরভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে যে তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাস একসময়ে বাংলার বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল - 'পল্লী-সমাজ' (১৯১৬), 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'গৃহদাহ' (১৯২০), 'শ্রীকান্ত' (১৯১৭-৩৩) প্রভৃতি। শ্রীকুমার

বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — শরৎচন্দ্র "আমাদের সমাজ ব্যবস্থার বৈষম্য ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া এক সঙ্গে স্বাধীন চিন্তা ও করুণ রসের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন, এই আত্মপীড়ন নিরত জাতির ভগবদ্দত্ত দুঃখ যে নিজ মূঢ়তায় কত বাড়িয়াছে, তাহা দেখাইয়াছেন"।[১২] মানুষের জন্যই সমাজ ও পরিবার। সেই সমাজ ও পরিবার যখন মানুষকে পিষে মারতে চেয়েছে, তখন তিনি মানুষেরই পক্ষ নিয়েছেন।

।। ছোটগল্প ।।

ছোট গল্প আখ্যানসর্বস্ব নয়। মানব জীবনের কোনো একটি কেন্দ্রীয় বিষয়ের উপর আলোকপাত করাই ছোট গল্পের লক্ষণ। বাংলা ছোট গল্পের জীবন দান করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনিই প্রথম সচেতন ভাবে ছোট গল্প লিখতে ব্রতী হন। তিনিই এর পথিকৃৎ এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের গল্প গ্রন্থ 'গল্প গুচ্ছ' তিন খন্ডে প্রকাশিত। বাঙালী জীবনের আধারে পরিবেশিত হলেও চিরন্তন মানুষের সুখ দুঃখ এতে স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ছোট গল্প লিখেছেন।'পোষ্টমাষ্টার', 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', 'ঠাকুর্দা', 'অতিথি', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'সুভা', 'স্ত্রীর পত্র' প্রভৃতি গল্প তাঁর অমর সৃষ্টি। ছোট গল্প রচয়িতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্থান টলষ্টয়, মোপাসাঁ, চেখভের পাশেই।

'রমাসুন্দরী', নবীন সন্ন্যাসী', 'সিন্দুরকৌটা', 'রত্নদ্বীপ' প্রভৃতি উপন্যাস লিখলেও বাংলা সাহিত্যে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩ - ১৯৩২) খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছে তাঁর সুন্দর ছোট গল্প সমূহের জন্য। তাঁকে কেউ কেউ বলেছেন বাংলার মোপাসাঁ। 'নবকথা'(১৮৯৯), 'ষোড়শী' (১৯০৬) প্রভৃতি তাঁর গল্প সংকলনের নাম। অন্তর্দৃষ্টি ও গভীরতা না থাকলেও তাঁর গল্পগুলি সুখপাঠ্য কথারসে ভরপুর।

ছোট গল্প শরৎচন্দ্রও লিখেছেন। যেমন —'মন্দির' (কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত), 'অভাগীর স্বর্গ' প্রভৃতি। এ গুলিকে ঠিক যথার্থ ছোট গল্প বলা যায় না।

।। প্রবন্ধ সাহিত্য ও রস রচনা ।।

বাংলা গদ্যের যথার্থ সূচনা যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই (১৮০১), তবু তার সাহিত্যিক রূপ উদ্‌ঘাটিত হল বিদ্যাসাগরের হাতে (১৮৪৮) । গদ্যরীতি যখন থেকে গভীর চিন্তা ও ভাব প্রকাশের উপযোগী হয়ে উঠল। তখন থেকে সৃষ্টি হতে লাগলো মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্য ।বিদ্যাসাগর , ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রভৃতির অনুশীলিত এই প্রবন্ধ সাহিত্য চিন্তা, যুক্তি, মনন ও সংযত প্রকাশ ভঙ্গির মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে । তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ গ্রন্থ হল —'বিবিধ প্রবন্ধ', 'কৃষ্ণ চরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব' প্রভৃতি । প্রবন্ধ সাহিত্যের পরিপূরকরূপে পাশে পাশেই গড়ে উঠলো রচনা সাহিত্য (Essais) যার প্রধান বৈশিষ্ট্য তত্ত্বগাম্ভীর্য বা তথ্যপ্রাধান্য নয়, রস রসিকতা ও সুনিপুণ প্রকাশ ভঙ্গির মুন্সিয়ানায় তত্ত্ব ও তথ্যের ভারকে লাঘব করা , পাঠককে যুগপৎ আনন্দিত ও বুদ্ধিদীপ্ত ক'রে তোলা । এক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র পথিকৃৎ । তাঁর 'লোক রহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' এই হিসাবে এখনো তুলনাহীন । 'কমলাকান্তের দপ্তরে' পাই বঙ্কিমের ব্যক্তিমানসের অভিব্যক্তি , গীতি কবিতার আবেগ , নাটকীয় পরিস্থিতির আভাস, গভীর দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন সব কিছু মিলিয়ে এক অপূর্ব উপভোগ্যতার আস্বাদ । তাই ভারতীয় নানা সাহিত্যে হরপ্রসাদ প্রভাব পড়েছে এই কমলাকান্তের দপ্তরের। বঙ্কিমের পরে মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় , চন্দ্রনাথ বসু , কেশব চন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের হাতে পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে । কিন্তু রচনা সাহিত্যে বা রস রচনার (আধুনিক নাম 'রম্য রচনা') আরও উজ্জ্বল রূপ পেলাম রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধে', কিন্তু তার স্বাদ একেবারে ভিন্নতর, তাই তার দোসরও নেই , অনুকারকও নেই ।

পরবর্তী চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা বেজবরুয়া-যুগে সৃষ্ট অসমীয়া সাহিত্য এই বাংলা সাহিত্য থেকে কিভাবে কতখানি পুষ্টিরস আহরন করেছে তার ধারাবাহিক আলোচনা করব কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও রসরচনা পর্যায় ভাগ করে। বলাবাহুল্য, সৃজনশীল সাহিত্যকেই অর্থাৎ 'লিটারেচার অব্ পাওয়ার'কেই ('লিটারেচার অব নলেজ' নয়) আমরা প্রভাব গ্রহণক্ষম সৃষ্টি বলে গণ্য করেছি এই আলোচনায়। তাই এতে স্থান পেয়েছে কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও রসরচনা।

তথ্যপূর্ণ xxxxx যুক্তিবিচার সমৃদ্ধ xx প্রবন্ধও রচনার গুণে রসসিক্ত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ঐ ধরনের প্রবন্ধকে আমরা এই বিস্তৃত তুলনামূলক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিনি, কেননা তাদের সীমারেখা (demarcating line) নির্ণয় করা শক্ত। তাই অসমীয়া সাহিত্যের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও বিবিধ সমালোচনা প্রভৃতি এই আলোচনার পরিধিভুক্ত হয়নি।

সূত্র নির্দেশ

১। 'ভূমিকা -' সাজাহান — অধ্যাপক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত-শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৪৭২ ২য় সং।

৩। নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি — ডঃ সুবোধ রঞ্জন রায়, পৃ: ২২।

৪। ঐ — ঐ পৃ: ৩৩।

৫। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৫১০ ২য় সং।

৬। ঐ পৃ: ৬১১, ২য় সং।

৭। কবিতার কথা— জীবনানন্দ দাস, পৃ: ২০।

৮। কালের পুতুল— বুদ্ধদেব বসু, পৃ: ১৫৭।

৯। বুদ্ধদেব বসু, 'যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, প্রবন্ধ, 'কবিতা পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৬১।

১০। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়— দীপ্তি ত্রিপাঠী, পৃ: ৫৯, ৩য় সং, ১৯৬৪।

১১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা— শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৩৯, ৫ম সং।

১২। ঐ — ঐ পৃ: ২৪২।

চতুর্থ অধ্যায়

বেজবরুয়া - যুগের অসমীয়া সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয় ও বিস্তৃত বিশ্লেষণ ।

(ক) কাব্য

আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য প্রতিষ্ঠায় ইংরাজী সাহিত্যই শ্রেষ্ঠ প্রেরণা রূপে কাজ করেছে সন্দেহ নেই । অবশ্য এই শক্তির পরিপুষ্টিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অবদানও অপরিসীম । বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নবীন চন্দ্র সেন সেই যুগের কেবল বঙ্গের নয় আসামেরও জনপ্রিয় লেখক ছিলেন । অনেকের মতে বাংলা, অসমীয়া প্রভৃতি সাহিত্যে আদৌ এপিক বা মহাকাব্য রচিত হয়নি । তবু মহাকাব্যোপম যে কাব্য লিখে ছিলেন মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে, তার প্রভাব লক্ষণীয় ভাবে পড়েছে অসমীয়া সাহিত্যে । নাটকে গিরিশ চন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র লাল অসমীয়া সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগকে প্রভাবিত করেছিলেন । বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসের 'বন্দেমাতরম্' গানে ও হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত' কবিতাতে জাতীয় ভাবের প্রথম প্রবল উন্মেষ ঘটে । পরাধীনতার গ্লানি ও বন্ধনমুক্তির আকুলতা উক্ত রচনাসমূহে যেভাবে ব্যক্ত হয়ে ছিল, তা অসমীয়া সাহিত্যের কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের 'চিন্তানল', ভোলানাথ দাসের 'কিয়নো জাগে আমার মন', আনন্দ চন্দ্র আগরয়ালার 'হে আই অসম কোয়াঁচোন মোক, বিয়নো সদায় দেখোঁ তয় শোক' ইত্যাদি কবিতাতেও মূর্ত হয়ে উঠেছে । বেজবরুয়ার 'বাণ বরাগী' কবিতায়ও জাতীয় গৌরবের ভাব লক্ষণীয় । তেমনি বেজবরুয়াযুগের গীতি কবিতায়ও যে বাংলা কবিতা প্রেরণা ও আদর্শ যুগিয়েছে তা ডঃ মহেশ্বর নেওগ স্বীকার করেছেন । তিনি বলেছেন -- " এই কালর লিরিক বা খন্ড কবিতার গঢ় আরু ভাবর পরিসরর প্রতিরূপ বঙ্গভাষাত অবিরল ভাবে স্পষ্টকৈ দেখা পোয়া যায়"।[১] মধুসূদন দত্তের অনুকরণে রমাকান্ত চৌধুরী ১৮৭৫ সালে 'অভিমন্যু বধ কাব্যে'[২] (১৮৮৮ সালে গ্রন্থকারে প্রকাশিত) অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন । বাংলায় এই ছন্দ প্রবর্তনের প্রেরণা পান ~~xxxx~~ মধুসূদন মিল্টনের Blankverse থেকে ।

শুধু তাই নয়, মিল্টনের 'প্যারাডাইস লষ্ট'র অন্তর্গূঢ় প্রভাবও মধুসূদনের কাব্যে পরিলক্ষিত হয়। মিল্টনের উক্ত রচনায় আদম এবং ঈশ্বর থেকেও শয়তানের চরিত্র উজ্জ্বল। মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য'ও দেখি, প্রকৃত বীর রূপে পরিকল্পিত মেঘনাদের চরিত্রের তুলনায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের রাম লক্ষ্মণের চরিত্র হয়ে পড়েছে নিষ্প্রভ। চন্দ্রধর বরুয়ার 'মেঘনাদ বধ' নাটকে মধুসূদনের ভাষা এবং চরিত্র চিত্রণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

হেমচন্দ্র গোস্বামী এই কালের একজন যশস্বী কবি। তাঁর 'আনন্দরাম বরুয়ার স্বর্গযাত্রা' কবিতাটি স্মরণ করিয়ে দেয় প্রখ্যাত বাঙ্গালী কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'স্বর্গারোহণ' কবিতাটিকে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই কবিতাটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে রচনা করেন। 'কবিতা দু'টির Poetic imagery লৈ মন করিলে, দুয়োজন কবিরে নামর যেনে মিল তেনে মনরো মিল, এনে লাগে'।[2] হেমচন্দ্রের কবিতায় দেশাত্মবোধের প্রকাশ সুস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় তাঁর 'বীরবাহু কাব্য' এবং তাঁর 'ভারত সঙ্গীত' কবিতাটি। পরাধীন ভারতে তাঁর এই কবিতাটি ছিল 'মুমূর্ষু জাতির পক্ষে সঞ্জীবনী মন্ত্র স্বরূপ'।[3] হেমচন্দ্রের ওজঃ গুণসম্পন্ন জাতীয় কবিতার প্রভাব পড়েছে আনন্দ চন্দ্র আগরয়ালার 'হে আই অসম কোয়াঁচোন মোক, কিয়নো সদায় দেখোঁ তয় শোক' প্রভৃতি কবিতায়। হেমচন্দ্রের রচনাবলী কেবল বঙ্গে নয় আসামেও জনপ্রিয় ছিল। 'এনে স্থলত অসমীয়া কবিতাত এওঁর প্রভাব পরা অসম্ভব ন হয়'।[4] সুতরাং অসমীয়া নব জাগৃতি + আন্দোলনে (Renaissance) আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের দিক্‌পালদের রচনার ভাবগত ও আঙ্গিকগত প্রভাব উল্লেখযোগ্য ভাবে সক্রিয় ছিল দেখা যায়। সেই তুলনায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনির্দিষ্ট বলে ডঃ মহেশ্বর নেওগ মনে করেন।[5] অপর দিকে শ্রী অতুল চন্দ্র বরুয়া লিখেছেন - "বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথর প্রভাব সমসাময়িক বা পরবর্তী কবি সকলর ওপরত পরা নিতান্ত স্বাভাবিক কথা"।[6] রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রভাব অসমীয়া সাহিত্যে যে কিছু কম নয়, আমাদের পরবর্তী বিশ্লেষণে তা উপলব্ধ হবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ছন্দোবৈচিত্র্য। রত্নকান্ত বরকাকতি এবং সূর্যকুমার ভূঞার কবিতার বিচিত্র ছন্দ রবীন্দ্রনাথের

ছন্দ বৈচিত্র্যের অনিবার্য প্রভাবের ফলশ্রুতি বললে অত্যুক্তি হবে না। এতদব্যতীত রবীন্দ্র কাব্যের মিস্টিক x সুরও অসমীয়া কবির প্রাণতন্ত্রীকে স্পর্শ করেছে। রবি কবির প্রভাব অসমীয়া কবিতায় কতখানি পড়েছে তা' অসমীয়া কবিতার ভাষা, শব্দচয়ন, চিত্রকল্প - এই সব দেখে নির্ণয় করা যেতে পারে। আসামে রবীন্দ্র কাব্যরসপিপাসু কবিদের মধ্যে রত্নকান্ত বরকাকতি অন্যতম। তাঁর কবিতায় রবীন্দ্র প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট। বরকাকতি ব্যতীত আরো দু'জন কবির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, তাঁরা হলেন নলিনী বালা দেবী ও ভৈরব চন্দ্র খাটনীয়ার। এই কবিদ্বয়ের কবিতায় বিশ্বকবির ছায়া xxx ভাল ভাবে পড়েছে। খাটনীয়ার 'গীতাঞ্জলি'র একজন ভক্ত পাঠক। 'গীতাঞ্জলি' বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন - " যার হৃদয় 'গীতাঞ্জলি'য়ে এবার স্পর্শ xxx করিছে, তার হৃদয়তে সি অমরভাবে অবস্থান করিছে। পাহরণর চাকনিত তার চিন-চাব নাইকিয়া হৈ গলেও, বিশুর সংঘাতত পুনর সি প্রাণত মূর্তি ধরি উঠার প্রমাণ পোয়া যায়, তার প্রমাণ এই ক্ষুদ্র লেখকর হৃদয়ত মাজেমাজে পাই রাইজর আগত স্বীকার করিবলৈ লাজ করা নাই"।[৭] তারা প্রসাদ বরুয়ার 'গীতি মঞ্জরী'তেও রবীন্দ্র-কবিতার প্রভাব প্রকট। পার্বতী প্রসাদ বরুয়ার কবিতার ভাবও রবীন্দ্র-মানসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ডিম্বেশ্বর নেওগের 'শাপমুক্তা'র জন্ম যে রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর ক্রন্দন থেকে, তা' ডঃ মহেশ্বর নেওগও অনুমান করেছেন।[৮] কারণ উভয় কবিতার ভাবমন্ডল এক। বঙ্গের 'বিদ্রোহী কবি' নজরুলের প্রভাব থেকেও অসমীয়া সাহিত্য মুক্ত নয়। যৌবনের প্রতিমূর্তি এই কবি কেবল বঙ্গে নয় আসামেও জনপ্রিয়। নজরুলের মানসিকতার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন একজন অসমীয়া কবির কথা ভাবতে গেলেই অসমীয়া সাহিত্যের 'বিদ্রোহী কবি' প্রসন্ন লাল চৌধুরীর কথা মনে জাগে। ভবানন্দ দত্ত বলেন, 'বিদ্রোহী কবি' হিসাবে প্রসন্নলালক বঙ্গদেশর কবি কাজী নজরুলর লগত তুলনা করিব পারি'।[৯] যা হোক, বেজ বরুয়া যুগের উল্লেখযোগ্য কবিদের উপর উল্লেখযোগ্য বঙ্গীয় কবিদের প্রভাব আমরা পরবর্তী বিস্তৃত আলোচনায় দেখাতে চেষ্টা করেছি।

অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা ডঃ মহেশ্বর নেওগ 'বেজ বরুয়াযুগে'র (১৮৮৯ থেকে ১৯৪০) রোমান্টিক কবি সম্প্রদায়কে কয়েকটি স্তর বা পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন তাঁদের এক একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে।

যেমন - জোনাকী স্তর, উত্তর-জোনাকী স্তর, বাঁহী - আলোচনী স্তর, ছাত্র সম্মিলনের মুখপাত্র 'মিলন' - এর স্তর, বিশেষ কোন পত্রিকা গোষ্ঠী বহির্ভূত কবিগণ। শেষ রোমান্টিক স্তরে যাঁরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাঁদের অধিকাংশেরই কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ কাল বেজবরুয়ার তিরোধানের (১৯৩৮) পরে অর্থাৎ বিংশ শতকের চতুর্থ দশকের পরে। আর ডঃ মহেশ্বর নেওগের ভাষায় "খুলমূল ভাবে বর্তমান শতিকার চতুর্থ দশকেই রোমান্টিক কবিতার শেষ স্তর।--- প্রকৃততে চতুর্থ দশকর শেষর ফালে বন্ধ কোঠার উত্তপ্ত বায়ুর মাজত থাকি যেন অনেকে নতুন দুয়ারেই বা খিরিকিয়েই বিচারি এনি-তেনি খেপিয়াবলৈ ধরিলে"।[১০] বাংলায় তৃতীয় দশকের শেষ দিকেই রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের আবির্ভাব হলেও অসমীয়া তরুণ আধুনিক কবিগণ তাঁদের অনুসরণ সুরু করেন পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি থেকে। চতুর্থ দশকের ভিতর যে সব অসমীয়া কবির কাব্য প্রকাশিত হয়েছে, এবং যাঁরা রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাঙালী কবিদের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়নি, হয়েছেন মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কবিদের দ্বারা, তাঁদেরই আমরা 'বেজবরুয়া যুগে'র কবি বলছি ডঃ নেওগের স্তর বিভাগ স্বীকার করে নিয়ে। তবে আমরা ঐ যুগের কবিদের পর পর সাজিয়েছি তাঁদের জন্মকাল ধরে, পত্রিকা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি ধরে নয়। কেননা তাঁদের কেউ কেউ একাধিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

লক্ষ্মীনাথ বেজ বরুয়া

অসমীয়া সাহিত্যে লক্ষ্মীনাথ বেজ বরুয়া (১৮৬৮ - ১৯৩৮) একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বাংলায় ঠাকুর বললে যেমন রবীন্দ্রনাথের কথা স্মৃতিপটে উদিত হয় তেমনি আসামে বেজবরুয়া বললে লক্ষ্মীনাথের কথাই মনে জাগে। পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী তাঁর পত্নী। রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১ - ১৯৪১) সমসাময়িক এই কবি অসমীয়া সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে কেবল পরিপুষ্টই করেননি, সমৃদ্ধও করেছেন।

'কবিতা হয় যদি হওক, না হয় যদি না হওক' - এই মনোভাব নিয়ে লক্ষ্মীনাথ তাঁর অন্যান্য সাহিত্য কর্মের ফাঁকে ফাঁকে বাগ্‌দেবীর কাব্য-রাজ্যে বিচরণ করেছেন। তাঁর কবিতা গ্রন্থ বলতে প্রধানতঃ 'কদম কলি'কে বুঝালেও 'পদুম কলি'র নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। কেননা অযত্ন পালিতা কন্যার মত তাঁর বহু কবিতা ও গীত এই গ্রন্থটিতে ঠাঁই পেয়েছে। কদম কলির প্রথম প্রকাশকাল ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ। এই প্রসঙ্গে স্মরনীয়, রবীন্দ্রনাথ এই বছরেই নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

'কদম কলি'র সবগুলি কবিতাই সার্থক সৃষ্টি একথা বললে অত্যুক্তি হবে। এতে উৎকৃষ্ট কবিতা যেমন আছে, তেমনি আছে সাধারণ স্তরের কবিতা আর তা খুবই স্বাভাবিক, কেননা একজন মহৎ কবির সব কবিতাই মহৎ সৃষ্টি হতে পারে না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও পরবর্তীকালে তাঁর পূর্বরচিত নানা কবিতা সম্পর্কে কুণ্ঠা প্রকাশ করতেন।

লক্ষ্মীনাথ রবীন্দ্র- সমসাময়িক, কলকাতায় শিক্ষিত। কাজেই তিনি রবীন্দ্র সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যের সাথে পরিচিত তো ছিলেনই,[১১] তদুপরি তিনি যে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন সে পরিবার তো বাংলা সাহিত্যের ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধনার পীঠস্থান।

'কদমকলি' বেজবরুয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি না হলেও আলোচনার যোগ্য। এতে আছে সর্ব সাকুল্যে ৪৮ টি কবিতা (গানসহ)। 'মোর দেশ' 'ধনবর আরু রতনী', 'রতনীর বেজার' ইত্যাদি মনোরম রচনা এর দৃষ্টান্ত। এতে লঘু হাস্যরসাত্মক কবিতা যেমন আছে, তেমনি আছে দেশপ্রেম ও অধ্যাত্ম বিষয়ক কবিতা এবং প্রেম বিরহ বিষয়ক কবিতা। উল্লিখিত কবিতাগুলির প্রথমটি আসাম বাসীর জাতীয় সঙ্গীত। অসমীয়া কবিতায় রোমান্টিক পথের প্রদর্শক রূপে এই গ্রন্থের কবিতাগুলির মূল্য অপরিসীম।[১২]

'কদমকলিতে' কিছু কবিতা ও গীত রয়েছে। প্রথমে 'কুলি' গীতটির কথাই ধরা যাক। সাধারনতঃ গীত লিখে পরে তার সুর ও সুরলিপি রচিত হয়। ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ, তাঁর গানের কথা ও সুর একই সঙ্গে সৃষ্টি হত। আবার বিশেষ সুরকে কেন্দ্র করেও গীত লিখিত হয়। বেজবরুয়ার 'কুলি' গীতটিতে রাম প্রসাদী সুরের উল্লেখ আছে। বেজবরুয়া সম্ভবত 'কুলি' লিখে তারপর 'রাম প্রসাদী সুর' কথাটা বসিয়ে দেননি। মনে মনে রাম প্রসাদী সুরটি ভেবে গুনগুন করে গেয়ে পরে এই কবিতাটি লিখেছেন, আর তাই স্বাভাবিক। সেইদিক থেকে 'কুলি' গীতটির পশ্চাতে বাংলা গানের প্রভাব আছে বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ রামপ্রসাদগীতি বাংলা সঙ্গীত সাহিত্যেরই অঙ্গ।

'আমার জন্মভূমি' কবিতায় কবির জন্মভূমি প্রীতি গভীর আবেগে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।--

হেরা আমার জন্মভূমি।
হেরা আমার জন্মভূমি।
এনে দেশ কতো নোপোয়া হেরা তুমি
হেরা আমার জন্মভূমি।
ক'ত আছে এনে চাউল পানীত দিলে ভাত?
ক'ত এনে কুঁজী থেকেরা টেঙাই যায় দাঁত?
ক'ত পাবা পকা খরিচা ক'ত ঢেকীয়া শাক?
এটা দই কত এনে নেরায় ধুলে যাক।
হেরা আমার জন্মভূমি।
ক'ত এনে ধানর পথার তামোল পানর বারী?
ভলুকা x মকাল আদি আছে বাঁহর ধারী।
লুইতর দরে xxxxxx বরনৈ ক'ত আছে কোয়া?
ঘুরি আহা বসুমতী, তথাপি নোপোয়া।
হেরা আমার জন্মভূমি।

আমরা এটিকে যদিও স্বদেশ কবিতা বলে উল্লেখ করেছি, আসলে এটি গীত, তবে এতে কোন সুরের উল্লেখ নেই। ১৮৩১ শক অর্থাৎ ১৯২০ খৃঃ এই কবিতাটি রচিত হয়। এর সঙ্গে তুলনীয় দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের (১৮৬৩ - ১৯১৬) 'সাজাহান' নাটকের প্রসিদ্ধ গীতটি। তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি ভাব সাদৃশ্য উপলব্ধির জন্য। উভয় কবিই জন্মভূমির কমনীয় সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের মোহময় ছবি তুলে ধরেছেন -

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা,
ওসে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা,
কোথায় এমন খেলে তড়িত এমন কালো মেঘে,
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখির ডাকে জেগে -
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে - আমার জন্মভূমি।
এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়,
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটি ইত্যাদি।

বেজবরুয়ার কবিতায় 'হেরা আমার জন্মভূমি' চরণটি ধুয়োর মত বার বার ঘুরে ঘুরে এসেছে দ্বিজেন্দ্র লালের 'আমার 'জন্মভূমি' অংশের মত।

দ্বিজেন্দ্র লালও বেজবরুয়ার মত রবীন্দ্র সমসাময়িক। দ্বিজেন্দ্র লালের সাহিত্য কর্মের কাল ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ রচিত দ্বিজেন্দ্র লালের 'সাজাহান' নাটকের সঙ্গে বেজ বরুয়া ভাল ভাবেই পরিচিত

ছিলেন, এবং 'সাজাহানে'র উল্লিখিত গীতটি মনে রেখেই যে তিনি 'আমার জন্মভূমি' লিখেছেন - একথা বিশ্বাস করা যেতে পারে। 'বাঁহী' নামক 'সখী কোনে নো বজায়' গীতটি বেজবরুয়ার অপর কাব্য গ্রন্থ 'পদুম কলি'তে বিদ্যমান। বেজবরুয়ার এই 'বাঁহী - গীতির পশ্চাতে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব থাকা খুব স্বাভাবিক। বাঁশী ছিল রবীন্দ্রনাথেরও প্রিয় চিত্রকল্প। এখানে 'সখী কোনেনো বজায়' গীতটির অংশ উদ্ধৃত করছি -

সখী কোনে ন বজায় ?
সখিয়ায় বায়ুত শুনা
সেই সুর উটি যায় ?
যমুনার কুলু গান
আকুল করিছে প্রাণ। ---

('উটি' শব্দের অর্থ ভেসে যাওয়া)

এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত গানটি -

ওগো শোনো কে বাজায়
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়।

***   ***   ***

যমুনারই কলতান কানে আসে, কাঁদে প্রাণ -
আকাশে ওই মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়॥

('বাঁশি', কড়ি ও কোমল)

রবীন্দ্রনাথের 'ওগো কে যায় বাঁশরী বাজায়ে' --- (গান, কড়ি ও কোমল) গানটিও এই প্রসঙ্গে স্মরনীয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ধারণা নৈর্ব্যক্তিক হলেও প্রেমের ক্ষেত্রে তিনি পার্থিব প্রেমের মাধুর্যও স্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'চুম্বন' কবিতা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি -

দুখানি অধর হতে কুসুম-চয়ন,
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসর - শয়ন। (কড়ি ও কোমল)

বেজবরুয়ার 'চুমা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'চুম্বন' কবিতাটিকে স্মরন করিয়ে দেয়। 'চুমা' কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি সুন্দর সাদৃশ্য দেখানোর জন্যে -

বতাহে বতাহে চুমার বাতরি
পানীয়ে পানীয়ে চুমা,---
চুমা খাই খাই কারো তত নাই
মইবো নেখায় কিয় ?

(৩)

সেই দেখি লেখী লেখি এশ চুমা দিয়া
অন্ততঃ ইপ্রাণ মোর বুজি বাজিলোয়াঁ।

শ্রী অতুল চন্দ্র বরুয়া যথার্থই বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথর 'প্রথম চুম্বন' 'শেষ চুম্বন' 'গুপ্ত প্রেম' 'ব্যক্ত প্রেম' আদি স্ব কবিতার প্রভাব স্বয়ং বেজবরুয়ার চুমা, প্রেম আদি কবিতাতো পরা নাই বুলিব নোয়ারি"।[১৩]

মহাভারতের কচ-দেবযানীর কাহিনী সর্বজনবিদিত। কচ-দেবযানী কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন কাব্য নাট্য 'বিদায় অভিশাপ'। রচনাকাল ২৬ শে শ্রাবণ ১৩০০ বঙ্গাব্দ, ১৮৯৪খ্রি:। উক্ত কাহিনী নিয়ে বেজবরুয়াও লিখেছেন 'দেবযানী' নামে একটি কাব্য নাট্য। এটির রচনাকাল ১৮৩৩ শক ভাদ (ভাদ্র), হাওড়া,

অর্থাৎ ১৯১১ খৃষ্টাব্দ । এতে 'দৃশ্যের' পরিবর্তে 'দর্শন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে । তিনটি দর্শনে কাব্যনাট্যটি সমাপ্ত । এই কাব্য নাট্যটি পাঠ করলে রবি কবির 'বিদায় অভিশাপে'র কথা মনে পড়ে যায় । রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপে'র কচের প্রতি দেবযানীর উক্তি । -

xx

যে বিদ্যার তরে
মোরে করো অবহেলা সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ; তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবেনা ভোগ;
শিখাইবে, পারিবেনা করিতে প্রয়োগ ।

বেজ বরুয়ার কচের প্রতি দেবযানীর উক্তিও অনুরূপ -

অতকাল করি তুমি কঠোর যতন
যে বিদ্যা লভিলা, বিদ্যা মৃত্যু সঞ্জীবনী
ফলবতী নহব তোমাত, বুলিলো নিশ্চয় ।

যদিও বেজবরুয়ার কচ দেবযানীকে প্রতিশাপ দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথের কচের মত দেবযানীকে আশীর্বাদ করেনি, তথাপি বিদায় অভিশাপ পাঠান্তে মনে হয় বেজবরুয়া 'দেবযানী'র (প্রথম দর্শন) পরিকল্পনা নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ' থেকেই । 'বিদায় অভিশাপে' রবীন্দ্রনাথ যে প্রেমতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা বেজ - বরুয়ার 'দেবযানী'তেও বিদ্যমান ।[১৪]

'ধনবর আরু রতনী' ও 'রতনীর বেজার' কাহিনী কেন্দ্রিক কবিতা, অর্থাৎ x ব্যালাড্ । এদুটি কবিতা বেজবরুয়ার উল্লেখ্য সৃষ্টি । কবিতা দু'টির রচনা কাল ১৯১২ খৃষ্টাব্দ, রচনা স্থান হাওড়া । ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্য প্রকাশিত হয়েছে । 'কথা'র প্রথম প্রকাশ কাল ১৯০০ খৃষ্টাব্দ । সুতরাং বেজবরুয়া এই 'কথা' গ্রন্থটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন অনুমান করা যেতে পারে । রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' মোহিত চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ।

সুতরাং 'কথা ও কাহিনী'র সাথেও বেজবরুয়ার পরিচয় ছিল। 'কথা ও কাহিনী'তে কাহিনী কেন্দ্রিক কবিতা পাওয়া যায়। কাহিনীর 'দুই বিঘা জমি', 'বিসর্জন' ইত্যাদি তো কবিতা আকারে ছোট গল্প। অনুমান করা যেতে পারে, 'ধনবর আরু রতনী' ও 'রতনীর বেজার' কবিতা দুটোর রচনার মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' পাঠের প্রভাব। কথা ও কাহিনীর কবিতাগুলির বিষয়বস্তু বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত, কিন্তু বেজবরুয়ার উপরি উক্ত কবিতা দু'টির কাহিনী স্বকপোলকল্পিত, প্রকাশভঙ্গিও মনোরম। কাহিনী, ভাব, ছন্দ সব কিছু মিলে কবিতা দু'টি রসোত্তীর্ণ। তাই অসমীয়া সাহিত্যে এই কবিতাযুগল সার্থক ব্যালাড্ বা কাহিনী কেন্দ্রিক কবিতা রূপে স্বীকৃত হয়েছে।[১৫] 'নিমাতি কন্যা' আর একটি কাহিনী কেন্দ্রিক কবিতা। এতে কন্যা মূক। বীণাবাদনের দ্বারা তার মূকত্বের অবসান ও সেই বীণাবাদকের সঙ্গে তার পরিণয় অতি নিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। মূক কন্যাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথও সুন্দর গল্প লিখেছেন 'সুভা' (মাঘ ১২৯৯)। 'নিমাতি কন্যা'তে অবশ্য গল্প পরিবেশিত হয়েছে কবিতা আকারে। 'গল্পগুচ্ছ'র মূক কন্যা সুভা আর এই কন্যা এক নয়। তবু ও [redacted] 'নিমাতি কন্যা' পড়তে গেলে 'গল্পগুচ্ছ'র সুপরিচিত গল্পটির কথা মনে আসা অস্বাভাবিক নয়। রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-নাট্য 'শাপমোচনে' বীণাধ্বনির কথা রয়েছে। 'নিমাতি কন্যা'য় বীনাধ্বনির দ্বারা মূক রাজ-কুমারীর মূকত্বের অবসান হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে নেচে উঠেছে 'প্রাণ প্রিয়' বলে। 'শাপমোচ'নে রাণীর দিব্য দৃষ্টি খুলে গিয়েছিল বীণার আর্তসুর শুনেই।

বেজবরুয়ার অপর কাব্যগুচ্ছ 'পদুমকলি'র অধিকাংশ কবিতা ও গীত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু বেজবরুয়া - শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত বেজবরুয়ার গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড এই কবিতাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়। 'পদুমকলি'তে 'সাগর সঙ্গীত' বলে একটি কবিতা আছে। পুরীর সমুদ্র সৈকতে বসে রবিবার বেলা ১১ টা ৪৭ মিঃ সময় 'সাগর সঙ্গীত' কবিতাটি লেখা হয়। এই কবিতার দু'টি স্তবক উদ্ধৃত করছি -

কিষান নো গোজরা   কিষান নো গুমরা
হেরা বরুণের বেটা
দেও পারনি   উথলনি , যেন
বায়ুনের খেয়ালির ঘটা ।
কোচ্ কোচনি   হুর হুরনি
গির গিরনি গাজনি
কোপাউরি   দোদা উরি
শেহত তেলত খারনি ।

বাংলার বিহারী লাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫ - ১৮৯৪) 'সমুদ্র দর্শন' কবিতাটি সুর সাদৃশ্যের জন্য এই প্রসঙ্গে স্মরনীয় । যেমন -

একি এ প্রকান্ড কান্ড সম্মুখে আমার
অসীম আকাশ গ্রাসি নীল জলরাশি ,
ভয়ানক তোলপাড় করে অনিবার
মুহূর্তেক যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি ।
আগুপাছ কোটি কোটি কি কল্লোল মালা
প্রকান্ড পর্বত সব যেন ধেয়ে আসে
উহু কি প্রকান্ড রব কানে লাগে তালা
প্রলয়ের মেঘ যেন গরজে আকাশে ।

'পদ্মকলি'র দু'টি স্মরণীয় কবিতা 'অসম সঙ্গীত' ও 'ব্রহ্মপুত্র সঙ্গীত' । প্রথমে 'অসম সঙ্গীত' কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করা যাক । এটি আসাম ও অসমীয়ার গৌরব গাথা । এই কবিতাটি পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের 'আমরা' কবিতাটির কথা । 'অসম সঙ্গীত' কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি -

শংকরে দিলে বিশুদ্ধ ধরম
লাছিত বাহুতে বল
সতী জয়মতী সতীত্ব তেজের
অসমী তাই প্রবল । ---
শঙ্করাচার্য্যর গুরু অসমীয়া
কুমারিল ভট্টনাম ,
জগত গুরুরো গুরু হব পারি
ভট্টই দেখালে কাম । ---
ভাস্কর জেউতি ভাস্কর বর্মা
প্রাগজ্যোতিষর রজা
ভারতর রজার আগশারী ললে ,
নহয়ুই কথা সজা । ---
হেম কোষ রচি হেমচন্দ্র হেরা
ভাষা আকাশর জোন
স্কুদশ ভাষাত এনে শব্দ কোষ
ভারতত রচিলে কোন ?
আমূলী ফুকন গুণাভি বরুয়া
বুরঞ্জি জ্ঞানত জ্ঞানী
স্বাধীন ব্যবসা দেশর হিতত
জগন্নাথ মানিক মানী । ---

এবার 'আমরা' কবিতা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি উভয় কবিতার সুস্পষ্ট ভাবসাদৃশ্য দেখানোর জন্যে -

আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে ।
আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নাম রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয় ।

এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।
জ্ঞানের নিধান আদি বিদ্বান কপিল সাঙ্খ্যকার
এই বাঙলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক হার।
বাঙালী অতীশ লঙিঘল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি।---
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগতময়,
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়। ---
বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান
বিফল নহে এ বাঙালী জনম, বিফল নহে এ প্রাণ।

বেজবরুয়ার 'ব্রহ্মপুত্র সঙ্গীত' পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বারাণসী'র কথা। যদিও প্রথমটি পবিত্র নদী - বিষয়ক, দ্বিতীয়টি পবিত্র তীর্থস্থান বিষয়ক কবিতা। প্রথম 'ব্রহ্মপুত্র' সঙ্গীতটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি -

নহিত সেরা তুমিয়েই নে সেই
লৌহিত্য নৈখনি -
যার বহল বুকত নির্মল জলত
স্নানি ছিল বশিষ্ঠ মুনি ?
গোকর্ণ গালব ঋষি
অসংখ্য তাপস তাপসী
(যার) পারত বহি আশ্রম পাতি
করিছিল সামবেদ ধ্বনি ?

খৈছিল নে   নরকে আনি
    যার বাতরি আনি
তুমি দুরকান্ত   দিলা জাননী
    কোথা হেরা নদ বর
    প্রাগজ্যোতিষত নগরর
মহারাজা ভগদত্তর কি বীরত্ব কি কাহিনী
(যার) রথর ভরত কুরুক্ষেত্রত কঁপিছিল এ মেদিনী ?
    আবেলির মলয়া বলি
    তোমারেই বুকুত চলি
সোনর বঠা   রূপর নাও
   বাইছিল টুলু বলু রাজ নন্দিনী
(যার) ঘামবিন্দু জলবিন্দু কপালত যেন মুক্তামণি
    সরগর সেই অপেস্বরী
    তিলোত্তমা বিদ্যাধরি
উর্বশী রম্ভারে সৈতে ক্রীড়িছিল তোমারেই পানী
তোমার প্রেম পাশত নদ - উর্বশী হল বন্দিনী ।
    দক্ষর দুহিতা সতী
    শিব যার প্রাণ পতি
স্বামী নিন্দাত প্রাণ ত্যজে ইয়াতেই দাক্ষায়নী ।

এবার 'বারানসী'র কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে দু'টি কবিতার সাদৃশ্য যে কত সুস্পষ্ট তা বোঝা যাবে ।

যাত্রীরা সব বলিয়া উঠিল দেখা যায় বারাণসী
চমকি চাহিনু স্বর্গ সুষমা মর্তে পড়েছে খসি'।
    জয় জয় বারাণসী -
হিন্দুর হৃদি গগনের তুমি চির উজ্জ্বল শশী । ---

এই সেই কাশী ব্রহ্ম দত্ত রাজা ছিল এই খানে,
খ্যাত যার নাম শাক্য মুনির জাতকে, গাথার গানে-
যার রাজত্ব সময়ে বুদ্ধ জন্মিল বার বার
ন্যায় ধর্মের মর্য্যাদা প্রেমে করিতে সমুদ্ধার।
এই সেই কাশী ভারতবাসীর হৃদয়ের রাজধানী
এই বারাণসী জাগ্রত চোখে স্বপন মিলায় আনি।---
সত্য পালিতে হরিশ্চন্দ্র এই কাশীধামে হায় *
পুত্র জায়ায় বিক্রয় করি বিকাইল আপনায়।

উভয় কবিতাতেই অতীত গৌরবের আবেগময় অনুধ্যান লক্ষ্য করি। বেজবরুয়ার 'দুর্যোধনে অশ্বত্থামা' কবিতার দুর্যোধন পাপী দুর্যোধন নয়, মানুষ দুর্যোধন। দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে খুব একটা ভাল চোখে দেখতেন না।[১৬] বেজবরুয়ার 'দুর্যোধন'ও অশ্বত্থামাকে নিদারুণ ভাবে ভর্ৎসনা করেছেন, বলেছেন -

যজ্ঞর পশুক নিয়ে ব্রাহ্মণ যেনে করি
অর্জুন লগাই পরা কাটক তেনে করি।।

দুর্যোধন সম্বন্ধে আমাদের চিরাচরিত ধারনার বিরোধী রূপ ফুটে উঠেছে বেজবরুয়ার কবিতায়। পাপীকে মহৎ করে দেখার উৎসাহ বাংলা সাহিত্যে xxxx এসেছে 'মেঘনাদ বধ কাব্য' প্রকাশের পর থেকে। 'মেঘনাদ বধ কাব্য' পাঠ করে বাঙালী পাঠক রাবণ ও মেঘনাদকে ভালবাসতে শিখেছে। বেজবরুয়ার 'মেঘনাদ বধ কাব্য' না পড়ার কথা নয়। বেজবরুয়ার দুর্যোধন চরিত্রে এই রূপ 'মেঘনাদ বধ কাব্য' পাঠের ফলশ্রুতি বললে অত্যুক্তি নাও হতে পারে। (যদিও কবিতাটি মিত্র ছন্দে রচিত)।

রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র মতো বহু নীতিমূলক কবিতাও বেজবরুয়া লিখেছেন। 'কদমকলি'র অন্তর্গত ভদ্রতা, কর্ম, সরু আরু বর, আত্ম সমর্পণ ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বেজবরুয়া অসমীয়া সাহিত্যে খ্যাত প্রধানতঃ প্রহসন রচয়িতা ও হাস্য রসাত্মক প্রবন্ধকার রূপে । তথাপি তিনি কবি । তাঁর সব কবিতাই রস রসোত্তীর্ণ না হলেও কাব্যরস - সম্পৃক্ত কবিতার সংখ্যা নেহাত কম নয় ।

চন্দ্র কুমার আগরয়ালা

চন্দ্র কুমারের জন্ম ১৮৬৭ সালের নবেম্বর মাসে তেজপুর ব্রহ্মজান নামক স্থানে । তাঁর পিতা হরিবিলাস আগরয়ালা । তিনি কলকাতা হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন । বৃত্তিতে ছিলেন ব্যবসায়ী । তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে গৌহাটীতে । 'জোনাকী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন । একাধিক পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা । চন্দ্র কুমার অসমীয়া রোমান্টিসিজমের অন্যতম হোতা । তাঁর কবিতার মানব প্রীতি বঙ্গীয় কবিদের স্মরণ করিয়ে দেয় ।

আগরয়ালার 'প্রতিমা' (১৯১৪) একটি উৎকৃষ্ট কাব্য । এই কাব্যের প্রথম কবিতা 'প্রতিমায়' আছে -

সখী চিত্রলেখা মোর কল্পনা সুন্দরী
সমিধান দিয়া আহি মোক ।

কাব্যের সূচনায় 'কল্পনা সুন্দরী'র এই আবাহন মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র কল্পনা বন্দনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় । আগরয়ালার একটি কবিতার নাম 'সীতা সরমা' । এই কবিতার দু'টি পংক্তি -

সরমা রাক্ষসী । সরমা মানবী ?
ন হয় সরমা দেবী ।

তাঁর চোখে রাক্ষসী সরমা দেবীতে পরিনত হয়েছে। কবির এই সরমাপ্রীতির পশ্চাতে মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য'র সীতা ও সরমার কথোপকথন - অংশের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। সেখানে সরমার সহানুভূতিপূর্ণ কমনীয় নারীরূপ সত্যই পাঠককে মুগ্ধ করে।

আগরয়ালা বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের মত সৌন্দর্যের পূজারী। তাঁর বিভিন্ন কবিতায় এই সৌন্দর্যপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে। ('সৌন্দর্য' 'নীয়র' প্রভৃতি) কবির 'সৌন্দর্য' কবিতা থেকে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি -

> ক'ত ক'রবাত - এফেরি রূপর কান্তি
> অজানে সজানে সেয়ে ধ্যান জ্ঞান মোর। ---
> ফুরিছো xx যাত্রীর বেশে স্বদেশ বিদেশ
> সৌন্দর্য আভাস যতে পাওঁ একনিকা।

রবীন্দ্রনাথের সত্য শিব ও সুন্দরের উপলব্ধি গভীর ভাবে অনুপ্রানিত করেছে আগরয়ালাকে। আগরয়ালা সুন্দরের সঙ্গে জীবনকে অন্বিত করে দিয়েছেন। কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি এই উক্তির সমর্থনে -

১। সুন্দরর আরাধনা জীবনর খেল। ("প্রতিমা", 'সৌন্দর্য')

২। নিয়াঁ মোক সুন্দরর সরগ রাজ্যলৈ ---
সুন্দরর আরাধনা তোমাতে অর্পিম --- ("প্রতিমা", 'জীবনর লগরীয়া')

৩। জ্ঞানময় প্রেমময় প্রাণর ঈশ্বর
সত্যতুমি শিব তুমি অসীম সুন্দর।
("প্রতিমা", 'সত্য তুমি শিব তুমি অসীম সুন্দর')

রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিও এই প্রসঙ্গে তুলে ধরি -

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর ।
পূণ্য হল অঙ্গমম ধন্য হল অন্তর ।। ---
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম জন্মান্তর ॥ ("গীতিমাল্য", 'সুন্দর')

রবীন্দ্রনাথের মানব প্রীতি তথা মর্ত্য প্রীতি সর্বজন বিদিত । আগরয়ালার অনেক কবিতায়ও এই মানব প্রীতি তথা মর্ত্য প্রীতি দৃষ্ট হয় । যেমন -

১। মানুষেই দেব ইহ জগতর
মানুষেই পরাৎপর
মানুহর প্রীতি সুখিবলৈ চোয়াঁ
বিশ্ব জগত কল্পনা , ("প্রতিমা", 'মানব বন্দনা')

২। মানুহর নাও মানুহর ভাও
দেখিযে লাগিছে ভাল, ("প্রতিমা'', 'তেজীমালা')

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব বোধের কথাই মনে জাগে যখন আগরয়ালার কণ্ঠে শুনি -

বিচিত্র মেঘর ভাবের রঞ্জিত
মানবী আত্মার খেল,
মহা মহত্ত্বর অভিলাষী নর
বিশ্ব প্রাণের মেল ॥---
কতনা কালর মানব সন্ততি
আরাধিছে ব্রিয়াকুল
বিশ্বর প্রেমত বিভোর মগন
উছর্গি ভকতি - ফুল ।---
('বীণবরাগী'র ১ সংখ্যক কবিতা)

রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন খন্ড তথা পার্থিব সৌন্দর্য মানুষকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না । তাই তো তিনি বলতে পেরেছেন --

বাড়ে তৃষা কোথা পিপাসার জল

অকুল লবণ নীরে । ("মানসী;" 'সুরদাসের প্রার্থনা')

আগরয়ালার 'অতৃপ্তি' কবিতাতেও এই একই সুর ধ্বনিত হয়েছে । যেমন-

প্রাণর প্রাণত কিয় হৈঁপাহ ইমান ।

সংসার তো অতৃপ্তির ঘর ।

বিচারি গোটাই আমি অত নো রতন

বান্ধি লাহি সম্পদর দল ।

আগরয়ালার 'বীণ বরাগী' প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে । তখন তাঁর কাব্য - পরিণতির কাল । এই সময় বাঙালী কবি নজরুল ইসলামের সগৌরব আবির্ভাব । তাঁর কবিতায় প্রচণ্ড বিদ্রোহাত্মক উম্মাদনা দৃষ্ট হয় । যেমন - তাঁর 'অগ্নিবীণা' কাব্যের 'বিদ্রোহী' 'ধূমকেতু' প্রভৃতি কবিতা । এই উম্মাদনা প্রবীণ আগরয়ালার কবিতাতেও প্রভূত পরিমাণে অনুভূত হয় । তাঁর প্রকাশ ভঙ্গিও নজরুলের অনুরূপ । দু'একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি নজরুল থেকে -

১। আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন ।
আমি স্রষ্টা সূদন, শোক তাপ হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন ।---
("বিদ্রোহী")

২। ঐ ঈশ্বর শির উল্লঙ্ঘতে
আমি আগুনের সিঁড়ি,
আমি বসিব বলিয়া পেতেছে ভবানী
ব্রহ্মার বুকে পিঁড়ি । --- ('ধূমকেতু')

এবার আগরয়ালা থেকে অনুরূপ বিদ্রোহাত্মক সুরের একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি -

হিমালয় চূড়া বুড়ালো হেঁতেন

উছালি ক'লীয়া পানী ।

আকাশর তরা নুমালো হেঁতেন

খশিয়াই লাখেলাখে ।

জোন বেলি পুষ পেলালো হেতেঁন
[illegible] দলিয়াই জাকে জাকে।

('বীণ বরাগী'র ২ সংখ্যক কবিতা)

আগরয়ালার একটি কবিতার নাম 'মানব বন্দনা'। এই কবিতার বিষয়বস্তু মনুষ্য-প্রশস্তি। এই প্রসঙ্গে নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছের 'মানুষ' কবিতাটি স্মরণীয়। এই কবিতাটিতেও মানবের জয়গান করা হয়েছে। আগরয়ালার 'মানব বন্দনা'য় বলা হয়েছে -

মানুহেই দেব মানুহেই সেব
মানুহ বিনে নাই কেউ
করোঁ করোঁ পূজা পাদ্য অর্ঘ্য লই
জয় জয় মানব দেব।

নজরুলের 'মানুষ' কবিতায় একই সুর শুনতে পেয়েছি -

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান ---

এতৎ সত্ত্বেও চন্দ্র কুমার আগরয়ালার কবিতা, বিশেষতঃ তাঁর 'বন কুঁয়রী' স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। তাঁর xxxx সৌন্দর্য দর্শন যেন ঈশ্বর দর্শন। 'সৌন্দর্যর আরাধনা জীবনর খেল' - আগরয়ালার এই উপলব্ধির গভীরতা অনুধাবনীয়। লক্ষণীয় এই যে রবীন্দ্রনাথের xxxx অবোপলব্ধির বৈচিত্র্যই যেন আগরয়ালাকে আবিষ্ট করেছিল বেশী।

মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজরিকা

মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজরিকার (১৮৭০ - ১৯৫৮) কবিতায় জ্ঞানমূলক উপলব্ধিই যেন প্রধান, সেখানে প্রাণস্পন্দন ততটা অনুভূত হয় না। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'জ্ঞান মালিনী' ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তাঁর বয়স ২৬ বছর, - তখন বঙ্গের বিখ্যাত কবি নজরুলের বয়স মাত্র তিন।

১৯৫১ খৃঃ মফিজুদ্দিন 'মিলন সঙ্গীত' নামে একটি কবিতা রচনা করেন, উদ্দেশ্য হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বাণী প্রচার। বয়ঃ কনিষ্ঠ হলেও এই প্রয়াসের জন্য বঙ্গের কবি নজরুলের নাম অবশ্যই স্মরণীয়। 'মিলন সঙ্গীতে'র দু'টি পংক্তি উদ্ধৃত করছি -

নহলে একতা হিন্দু মুসলমানে
নহব প্রগতি আর কোনো দিনে। ('মান মিহনি')

মফিজুদ্দিনের সমসাময়িক বঙ্গ সাহিত্যের আরেক প্রখ্যাত কবির রচনায়ও এই ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষিত হয়েছে। ইনি অতুল প্রসাদ সেন (১৮৭১ - ১৯৩৪)। সেন মহাশয়ের একটি গান থেকে তার নমুনা দিচ্ছি -

সার তজিয়ে খোসার বড়াই
মন্দিরে মসজিদে লড়াই
প্রবেশ করে দেখরে দু'ভাই
অন্দরে যে একজনাই। ("কয়েকটি গান", 'শিকল ভাঙার গান')

মফিজুদ্দিন বাংলা অধ্যয়ন করেছেন যত্ন নিয়ে। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বাংলা কবিতা থেকে উদ্ধৃতিও দিতেন। যেমন -

জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা কবে
চির স্থির কবে নীর
হায়রে জীবন নদে ? [১৭]

বলাবাহুল্য, উদ্ধৃতিটি মধুসূদনের 'বঙ্গভূমি'র প্রতি' কবিতার অংশ বিশেষ। বাংলা প্রবাদও তিনি ব্যবহার করতেন। যেমন 'বিশ্বাসে নিকটে প্রভু, তর্কে বহুদূর'। [১৮] তাঁর উদ্ধৃতিতে একটু ভুল রয়ে গেছে। কথাটি হবে 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ'। কবির 'মানমিহনিতে' তিনটি কবিতা আছে। 'ভূ-কম্প' ও 'মিলন সঙ্গীত' কবিতা দু'টির রচনা কাল যথাক্রমে ১৫.৮.১৯৫০ ও ১০.৩.১৯৫১। প্রথম কবিতা 'অসমীয়ার' রচনাকাল দেওয়া নেই। তবে অনুমান করা যায় কবিতাটি ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই রচিত হয়েছে। এই কবিতাটিতে

কবির সাজাত্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে । তিনি অসমীয়া জাতির দোষগুলিকে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গের বাণ বর্ষণ করেছেন । বঙ্গ ভাষার সাহিত্যিকগণও জাতির চরিত্র সংশোধনের জন্য ব্যঙ্গাত্মক কবিতা প্রহসনাদি লিখেছেন । এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা , মধুসূদন দত্তের প্রহসনগুলি স্মরণ করা যেতে পারে । কবি হাজরিকার 'অসমীয়া' কবিতা থেকে পরানুকরণ নিয়ে কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি -

নামকো সলালা বঙ্গালী ধরনে,
বিদেশী যে হ'লা চলনে - করনে ।
পাগুরি এরিদি টকলা মূরেরে,
ফুরা সজ হই পহীনে - গম্ভীরে ।
পিঠা - পনা এরি ললা লুচি - পুরি । ('আনমিহলি')

খৃষ্টানী ভাবপন্থী উচ্ছৃংখল বঙ্গসন্তানদের উদ্দেশ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরূপ ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় --

ধন্যরে বোতল বাসী ধন্য লাল জল ।
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতা সকল ॥
দিশি কৃষ্ণ মানিনেক খৃষ্ট কৃষ্ণ জয় ।
মেরি দাতা মেরি সুত বেরি গুড বয় ॥

হাজরিকার 'অসমীয়া' কবিতা পড়ে মনে হয় , তিনি বঙ্গ সাহিত্যে রচিত নানা ব্যঙ্গাত্মক কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন ।

কবি মফিজুদ্দিনের 'তত্ত্ব পারিজাতে' তত্ত্ব থাকলেও তা একেবারে রসহীন হয়ে পড়েনি । তাঁর 'মাজী আরু ভগা নাও' কবিতাটিতে ভারত চন্দ্র রায়ের (১৭৫০ আনুমানিক) অন্নদামঙ্গল কাব্যের শুধু বিষয়বস্তু নয় , ছন্দ এবং প্রকাশভঙ্গীরও প্রভাব আছে বলে মনে করা যায় । যেমন -

হুম হুম গিরি গির মেঘ গাজিছে,
বেগে বেগে ছেগে ছেগে বায়ু বলিছে।
ঘেট্ ঘেট্ ঘট্ ঘট্ ডাল ভাঙিছে,
ঝুপ ঝুপ ছুপ ছুপ পাত সরিছে। ('তত্ত্ব পারিজাত')

অন্ত্যমিল, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, তূনক ছন্দ প্রয়োগে উদ্ধৃত অংশটি প্রবল সাদৃশ্যের জন্যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে।
হুপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ বাঁকিছে॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হুম হাম থুম থাম ভীম শব্দ ভাষিছে॥ (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ সং)

লক্ষণীয় এই যে আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে কবি মধুসূদন কাব্যাঙ্গিকের জন্যে তাকিয়েছেন বাংলার আধুনিক-পূর্ব কবি ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দিকে।

পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া

পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার (১৮৭১ - ১৯৪৬) কবিতার গ্রন্থ তিনটি - 'জুরনি' (১৯০০), 'লীলা' (১৯০১) ও 'ফুলর চানেকি' (১৯০১)। X১৯০১ সালের মধ্যে গোহাঞি বরুয়ার সমস্ত কবিতা প্রকাশিত হয়। 'লীলা' কাব্যে কবি পদ্মনাথ তাঁর প্রথমা পত্নী লীলাবতীর স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। বাংলা কাব্যে এই জাতীয় উল্লেখযোগ্য শোক-কাব্য হল রবি কবির 'স্মরণ' ও অক্ষয় কুমার বড়ালের 'এষা'। 'লীলা' কাব্যে কবি প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনকে অর্ধনারীশ্বরের লীলা রূপে কল্পনা করেছেন। এই 'লীলা' কাব্য সম্পর্কে ড. সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন --

"রবীন্দ্রনাথের 'প্রতি অঙ্গ কাঁদে মোর প্রতি অঙ্গতরে' ও সমধর্মী অপূর্ব রসবিদগ্ধ কবিতাগুলিকে স্মরণ করাইয়া দেয়"।[১৯] বলাবাহুল্য, আরও স্মরণ করিয়ে দেয় কবি জ্ঞানদাসের সেই অপূর্ব চরণটি - 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর'। এতে প্রকাশিত যে প্রেম ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথকেও আবিষ্ট করেছিল, তারই স্পর্শ বুঝি কিছুটা লেগেছিল পদ্মনাথের 'লীলা' কাব্যে। বাংলায় সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক প্রয়োগ হয়েছে মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে এই ছন্দ ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনুসৃত হতে থাকে। অসমীয়া ভাষায় রমাকান্ত চৌধুরী ১৮৭৫ সালে 'অভিমন্যু বধ' কাব্যে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন। বলা বাহুল্য এই কাব্যের আদর্শ ছিল মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য'।[২০] ভোলানাথ দাস এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'সীতাহরণ' নাটক রচনা করেন। এতেও মধুসূদনের প্রভাব বিদ্যমান।[২১] পরে এই ছন্দে কাব্য রচনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন পদ্মনাথ ও হিতেশ্বর বরবরুয়া। পদ্মনাথ সর্বপ্রথম তাঁর 'লীলা' কাব্যে ও পরে তাঁর নাটকত্রয়ে (গদাধর - জয়মতী - সাধনী) এই ছন্দের সার্থক প্রয়োগ করেন। পদ্মনাথের সমসাময়িক চন্দ্রধরও এই ছন্দে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পদ্মনাথের 'জুরনি' কাব্যে ২২ টি চতুর্দশপদী কবিতা আছে। মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে এমন কয়েকটি কবিতা আছে (যেমন - কবিতা, কবি, কল্পনা, রামায়ণ ইত্যাদি) যার ভাবগুলি নিয়ে পদ্মনাথও কবিতা লিখেছেন। মধুসূদনের 'কল্পনা' শীর্ষক কবিতার শেষে আছে -

কি সুরগে কি মরতে অতল পাতালে
নাহি স্থল যথা দেবি, নহে তব গতি।

পদ্মনাথও তাঁর 'কল্পনা' কবিতার শেষে বলেছেন -

কল্পনা সি ঘুরি চকু বিশ্বরাজ্য ঘুরে,
সৃষ্টি মাজে দেহেশ্বর তাকে পিন্ধি ফুরে।

বলা বাহুল্য মধুসূদনের কবিতার ভাব সাদৃশ্য এখানে স্পষ্ট বিদ্যমান।

মধুসূদনের 'পৃথিবী' শীর্ষক একটি সনেট রয়েছে। পদ্মনাথেরও অনুরূপ কবিতা আছে, নাম পৃথিবী নয়, 'মহী'। উভয় কবিতাই পৃথিবীর প্রশস্তিমূলক। মধুসূদনের নদী বিষয়ক সনেট 'কপোতাক্ষ নদ'। পদ্মনাথের নদী বিষয়ক সনেট 'ব্রহ্মপুত্র'। মহৎ ব্যক্তির উপর সনেট উভয়েই রচনা করেছেন। 'কবি রবীন্দ্রনাথ' নামে পদ্মনাথের একটি উৎকৃষ্ট কবিতা আছে। এতো কবিতা নয়, দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত সুচি শুভ্র একটি পুষ্প যেন।

'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র সূচনায় মধুসূদন বাণী বন্দনা করেছেন মিলটনকে অনুসরণ করে। মিলটন তাঁর Paradise Lost কাব্যের সূচনায় বলেছেন - Sing Heavenly Muse, পদ্মনাথের 'লীলা' কাব্যে বাণী বন্দনার আদর্শ মধুসূদন হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। পদ্মনাথ 'লীলা' কাব্যকে কয়েকটি সর্গে বিন্যস্ত করেছেন, প্রত্যেক সর্গের নামকরণও করেছেন মধু কবির অনুসরণে। 'ফুলর চানেকি'তে ৪২ টি খন্ড কবিতা আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকদের অসমীয়া পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ছিল এই গ্রন্থটি। এতে কবির 'জুরনি' ও 'লীলা' কাব্যের অনেক মনোরম অংশ দৃষ্ট হয়। কবি রবীন্দ্রনাথকে কাব্যটি উৎসর্গ করেছেন, সঙ্গে ছিল রবীন্দ্রনাথের ছবি। পদ্মনাথ রোমান্টিক কবি। তাঁর কাব্যে রোমান্টিক ভাবধারা এসেছে ইংরেজী ও বঙ্গ সাহিত্যের যুগপৎ সযত্ন অনুশীলনে। একথা কেবল পদ্মনাথ নয় বেজবরুয়াযুগের সকল সারস্বত সাধকদের উদ্দেশ্যেই বলা যেতে পারে।[২২]

পদ্মনাথ উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতায় যান। এই কলকাতা জীবনের প্রভাব তাঁর জীবন ও সাহিত্যে অপরিসীম।[২৩] তাঁর শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল মদনমোহন তর্কালংকারের 'শিশু শিক্ষা' ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' দিয়ে। অসমীয়া সাহিত্য চর্চায় এই গ্রন্থ দু'টির প্রেরণা কম নয়। পদ্মনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন, ''সেই কালর বাংলা সাহিত্যর ওচরত আমি চির ধরুয়া (চির ঋণী)''।[২৪] পদ্মনাথ ও তাঁর সহপাঠী পানীনাথ গগৈ দুজনেই ছাত্রাবস্থায় বাংলা ও অসমীয়াতে কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁরা 'পদ্মপানি' নামে একটি হাতে লেখা গ্রন্থও বের করেন। গোহাঞি বরুয়ার একটি বাংলা কবিতার নমুনা -

আমার যে চাঁদ হায় দূরে দূরে সরে যায়
দূরেতে পালায় ।
সুদূর গগন মাঝে অগনন তারা রাজে
হায় মম চাঁদ নাই ।

তাঁর এই বাংলা সাহিত্যানুরাগই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যেও নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে দেখতে পাই ।

নবকান্ত বরুয়া 'গোহাঞি বরুয়ার জীবন আলেখ্য' প্রবন্ধে লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কণিকা'র আদর্শত 'জুরনি' নামক পুঁথি এখনি প্রকাশ হল" ।[২৫] বরুয়ার এই উক্তি যথার্থ । 'কণিকা'য় নীতি বিষয়ক অনেক ছোট ছোট কবিতা আছে । 'জুরনি'তেও অনুরূপ কবিতা দৃষ্ট হয় । পদ্মনাথ 'জুরনি' রচনায় রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' থেকে নিঃসন্দেহে প্রেরণা পেয়েছিলেন । উভয়েরই কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করছি পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য । প্রথমে রবীন্দ্রনাথ থেকে --

১। গরজের আত্মীয়তা

কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে
আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কিরে ?
থলি বলে কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে ॥

২। কুটুম্বিতা

কেরসিন শিখা বলে, মাটির প্রদীপে
ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে ।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা
কেরসিন বলি উঠে, এসো মোর দাদা ॥

৩। অকৃতজ্ঞ

কত বড়ো আমি কহে নকল হীরাটি ।
তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি ॥

এইবার পদ্মনাথ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি -

১। মিঠা আর তিতা

মিঠাই সঁহারি কয়, তিতা হের তিতা
অরুচি, ঘৃণিত, অজ্ঞ, তোরে সতে মিতা ।
প্রত্যুত্তর তিতাকায়ে দিলে xxx শহীনাই -
"তোমাকে মরি মাথা তোক চিনে মোর ভাই ।"

২। সর আর বর

জোনে কয় হাঁহি মারি, ক্ষুদ্র ভই তরা
xxxxx দেখচোন কেনে মই উজ্জ্বলিছো ধরা
তরাই সম্ভ্রমে, আমি আতি কই সর
আপোন দীপ্তের নিতে সৃষ্টি শোভা করোঁ ।

৩। পরস্পর উপকারী

গাছ বোলে, "লতা তোর জীবনর খুটি
নহলে জীবন মোর, কি যে তোর গতি ।"
লতাই নীরবে কয়, "পাই অতি ব্যথা,
নহলে লতার পাত র'দে মারে লেঠা ।"

পদ্মনাথ রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে যে গভীর ভাবে পরিচিত ছিলেন, তাঁর 'কবি রবীন্দ্রনাথ' কবিতাটিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । কবিতাটি উদ্ধৃত করছি -

রবীন্দ্র কবীন্দ্র আজি অমর সভাত
'বাল্মীকি প্রতিভা' প্রভা প্রকাশি ধরাত,

কালিদাস - পূজাভোগ সম্ভোগী জীবন্ত
পুষ্প অর্ঘ্য পৃথিবীর লভি অযাচিত ।
সাদরর 'রবিবাবু' ভারত বিদিত
প্রতিভা প্রভার গুণে পৃথিবী পূজিত,
'সুমেরু কুমেরু' চুটি কনক আঁচল
'স্তন'রত্ন তাহা নিয়ে করিলা দখল
থলা কি বা, র'ল কিবা বাকি আরু ।
কিহের আদরি তব যোগ্যমান ধরোঁ
অকনি 'কণিকা' আরু অলিক ঠগত
তোমারে চানেকি চাই রচা নিলগত,
জুরনি আজলি ধরি আছোঁ পাতি হিয়া
লোয়াহি আসন রবি । জীবন সনিধয়া,
লাগটকা না 'নবেল'র বটা পুরস্কৃত,
কড়াক্রান্তি যোগ যাথোঁ এই ওলগত ।

এই কবিতার 'অকনি --- জুরনি' পঙক্তিগুলিতে পদ্মনাথ দ্বিধাহীন কণ্ঠে রবীন্দ্র প্রভাব স্বীকার করেছেন । জুরনি 'কণিকা'র আদর্শে রচিত । তাই বলে পদ্মনাথের স্বকীয়তা কিছু ছিল না এমন মনে করা কিন্তু সঙ্গত হবে না । চন্দ্র প্রসাদ শইকীয়া যথার্থই বলেছেন, " বঙালী সাহিত্য আরু সংস্কৃতিয়েও তেওঁক (পদ্মনাথক) প্রভাবিনুত করিছিল, কিন্তু গ্রাস করিব পরা নাছিল ।"[২৬] গ্রাস করার আশঙ্কা তখনই থাকে, যখন কোন লেখক কেবল অনুকরণ সর্বস্ব হয়ে উঠেন । পদ্মনাথই শুধু নন, বহু অসমীয়া কবিই প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন বাঙালী কবিকে আদর্শ করেছেন, তাঁদের ভাব অনুসরণ করেছেন, আঙ্গিক পদ্ধতি নিয়েছেন, কিন্তু সব কিছুকেই স্বীকরণ ক্ষমতার দ্বারা আত্মস্থ করে প্রকাশ করতে প্রয়াস পেয়েছেন । সেখানেই ঘটেছে তাঁদের স্বকীয়তার স্ফুরণ । সাফল্য অসাফল্যের প্রশ্ন সেখানে গৌণ ।

হেমচন্দ্র গোস্বামী

হেমচন্দ্র গোস্বামী (১৮৭২ - ১৯২৮) জন্ম গ্রহণ করেন গোলাঘাটে। শিক্ষা লাভের জন্য তিনি কলকাতায় চার বছর অতি বাহিত করেন। গোস্বামী অসমীয়া ভাষার একজন উল্লেখযোগ্য কবি। ইনি লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার সমসাময়িক। গোস্বামীর কাব্য গ্রন্থ একটি। নাম 'ফুলর চাকি' (১৯০৭)। এই কাব্যের কয়েকটি কবিতা (কাকো আরু হিয়া নিবিলাওঁ, পুয়া, প্রভৃতি) প্রশংসনীয়। তবে প্রত্নতত্ত্ব ও গবেষণা মূলক কার্যে ব্যাপৃত থাকায় তিনি কাব্যলক্ষ্মীর সেবায় আশানুরূপ মনোনিবেশ করতে পারেননি।

গোস্বামীর কবিতায় ছন্দোনৈপুণ্য রয়েছে। কবি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখ কবির ছন্দোবদ্ধ কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁর ছন্দোবদ্ধ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব থাকা আশ্চর্যের কিছু নয়। উল্লেখ্য এই যে গোস্বামীই প্রথম মধুসূদনের আদর্শে সনেট তথা চতুর্দশপদী কবিতা অসমীয়া সাহিত্যে রচনা করেন। তাঁর 'প্রিয়তমার চিঠি' অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম সনেট।

অন্যান্য কবির মত গোস্বামীও একটি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন। অসমীয়া সাহিত্যে এই জাতীয় সঙ্গীত রচনার প্রেরণাও বাংলা সাহিত্য যুগিয়েছে বলে মনে হয়। সেই সময় 'বন্দেমাতরম্' ও 'জনগণ মন অধিনায়ক জয়হে' সঙ্গীত লোকের মুখে-মুখে ফিরতো। তাদের প্রভাব বেজবরুয়া যুগের কবিদের উপরও পড়েছিল বলে মনে হয়। গোস্বামীর 'ফুলর চাকি' র বিখ্যাত কবিতা 'সংসারত সুখ নাই'। এই কবিতাটিতে সংসারের দুঃখের কথা বর্ণিত হয়েছে, আবার এই দুঃখের মধ্যেও মানুষ সুখের সম্ভাবনার কথাও ভাবে -- এই আশ্বাসও তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ সংসার দুঃখময়, তবু মানুষ সংসার ত্যাগ করেনা, কারণ এতে সুখ প্রাপ্তির সম্ভবনাও নিহিত আছে। এই কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি -

সংসারত সুখ নাই
সংসার সুখর ঠাই

সংসার কেবল তাই দুখের নিজরা
রোগ, শোক, ব্যাধি, মৃত্যু সন্তাপের ভরা ---
সবারো মুখেত শুনো দুখ, দুখ, দুখ ।
কিন্তু তথাপিও হায়
কারো গার্ত গম নাই
সকলায়ে ঘুরি মরে সুখ সুখ করি
নাজানে সংসার হায় দুখের পুখুরী । ---

নবীন চন্দ্র সেনের (১৮৪৭ - ১৯১১) 'আশা' কবিতায় মানুষ দুঃখের মধ্যেও সুখস্বপ্ন দেখে এবং পুনরায় সুখের জন্য কর্মে লিপ্ত হয় - এইরূপ ভাব ব্যক্ত হয়েছে । 'সংসারত সুখ নাই' কবিতায় উক্ত দু'টি ভবই বিদ্যমান।

'সংসারত সুখ নাই'র নৈরাশ্যের প্রতিবাদে রত্নেশ্বর মহন্ত 'সংসার সুখর ঠাই' কবিতাটি রচনা করেন । গোস্বামীর কবিতাটিতে ইংরেজ কবি লংফেলোর বিখ্যাত কবিতা The Psalm of Life -এর প্রভাব আছে বলে মনে হয় । এই ইংরাজী কবিতাটি বঙ্গীয় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮ - ১৯০৩) 'জীবন সঙ্গীত' নাম দিয়ে অনুবাদ করেছেন । গোস্বামীর এই কবিতাটির সাথে পরিচয় থাকার কথা, তাই তার প্রভাব 'সংসারত সুখ নাই' কবিতায় পড়া সম্ভব ।

গোস্বামীর 'প্রিয়তমার চিঠি' কবিতার রোমান্টিক সুর 'কড়ি ও কোমলে'র রাবীন্দ্রিক রোমান্টিক সুরকে স্মরণ করিয়ে দেয় । রবীন্দ্রনাথের 'বিবসনা' কবিতার কয়েকটি পঙক্তিতে দেখি -

ফেল গো বসন ফেল , ঘুচাও অঞ্চল
পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ ---
অসীম নীলিমা মাঝে হও নিমগন
তারাময়ী বিবসনা প্রকৃতির মতো ।

এতে যে রোমান্টিক মন তথা 'সৌন্দর্য' স্পৃহা প্রকাশিত হয়েছে, তার রেশ 'প্রিয়তমার চিঠি'র মধ্যেও যে বিদ্যমান তা নীচের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে -

সৌন্দর্যের বুকের কাঁচলি উদলাই
প্রকৃতির চো-ঘর চালো পিত পিত
কুকুরা ঠেঙ্গীয়া এই আধর কিটিত
যি অমিয়া যাঁহা আছে ক'তো আর নাই। ---
তোমার চিঠিয়ে কিন্তু আনে যিটি গীত
কবিতার কাব্যে তার গোন্ধাকো না পায়।---
তোমার চিঠিয়ে প্রিয় আনে কি মোহিনী,
নিতৌ নো হোয়া বাঁহী নন ফুল মেলে।
যত শুন্যা চয়া থাও নেলাগে আপনি
হৃদয়ত হেপাহন জোটোতরা জুল।

এই প্রসঙ্গে ভবেন বরুয়া যথার্থই বলেছেন, "হেমচন্দ্র গোস্বামীর" 'প্রিয়তমার চিঠি' কবিতার আরম্ভনীত বাজি উঠা নিভাজ অসমীয়া যেন লগা সুরটো কিছু পরিমাণে আছিল 'কড়ি ও কোমল'র রোমান্টিক রবীন্দ্রিক সুরর রূপান্তর।" [২৭]
'মোহন বাঁশী' কবিতায় কবির রাধাকৃষ্ণ - প্রীতি যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি বৈষ্ণব পদাবলীর সুরও ফুটে উঠেছে বংশীধ্বনির সর্বব্যাপী প্রভাবের বর্ণনায়, যেমন -

বাজিছে মোহন বাঁশী সাতোটা সুরত।
ঢালিছে অমিয়া তত্ত্ব বিশ্ব জগতত।।
অবিরাম আজি সেই অনাহৃত সুর।
নিছে ছিগি হৃদয় - গাঠির শত যুর॥
সি সুরর রাগিনীত বিশ্ব মতলীয়া।
হ্লাদিনী রাধিকা কৃষ্ণ প্রেমত বলিয়া॥

প্রথম সুরত প্রাণী রয়ে ভূলোকত ।
উলটি যমুনা বয় ব্রজর মাজত ॥
দ্বিতীয়ত ভূলোকে প্রানর উলাহ ।
গোকুলত গরু গাইর বিনন্দ বিলাহ ॥ ---
ব্রজত গোপিনী সবে এরে নিজ পতি ॥---
ব্রজবাসী সকলোতে দেখে কৃষ্ণময় ॥ ---
ব্রজর কুঞ্জত রাধা কৃষ্ণর মিলন ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন ব্যঙ্গ - চটুল কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত । এই ধরণের কবিতায় উপভোগ্য কৌতুক রস আছে । তবে ভাব গভীরতা নেই । এই জাতীয় কবিতা গোস্বামীও রচনা করেছেন । তাঁর 'বরকনীয়া' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । এতে 'কানি' তথা আফিমের মহিমা কীর্তন করেছেন কবি পঙ্কমুখে । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২ - ১৮৫৯) 'আনারস' শীর্ষক কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । এতে কবি 'আনারসের' মহিমা কীর্তন করেছেন । 'আনারস' এবং 'বর বর্নীয়া' দু'টি কবিতাই ব্যঙ্গপ্রধান । 'আনারস' কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি -

লোকে বলে আনারস আনারস নয়
আনারস হলে কেন জানারস হয় ?
তারে তার জানা যায়, রস ষোলো আনা ।
অরসিক লোক তবু বলে তারে আনা ॥
ফেলিয়া পনের আনা এক আনা রাখে ।
এই হেতু আনারস বলে লোকে তাকে ॥
অরসিক নাহি করে রসেতে প্রবেশ ।
আনাতেই ষোল আনা, না জানে বিশেষ ॥ ---

গোস্বামীও 'কানি'র প্রশংসায় পঙ্কমুখ । 'কানি' খেলে কী হয় ? কবি বলেন -

অপুত্রর পুত্র হত নির্ধনীর ধন ॥
''সর্বধর্ম" এরি লোয়া কানিত শরণ ॥
অন্ধজনে চকু পাব বন্ধ বিমোচন ।
ধইন ধইন অসমীয়া ধইন ধইন কানি ।
মরাঁতেও মরাঁ যেন মুখত কানির পানী । ---

হেমচন্দ্র গোস্বামীর নীতিমূলক কবিতাও উল্লেখ যোগ্য । রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র কবিতাগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । নীতিকবিতা লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া লিখেছেন, পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া লিখেছেন, লিখেছেন হেমচন্দ্র গোস্বামীও। এতে সংস্কৃত নীতি ~~কাব্যের~~ শ্লোকের প্রভাব থাকাটা আশ্চর্যের কিছু নয়। তবে গোস্বামী- রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' থেকে অনুরূপ কবিতা রচনায় প্রেরণা পেয়েছেন মনে হয় । যেমন পেয়েছেন পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া ।[২৮] হেমচন্দ্র গোস্বামীর 'মুক্তামালা' থেকে কয়েকটি নীতিকবিতা উদ্ধৃত করছি -

১। আজির দিনটো জানা সর্বস্ব তোমার ।
শক্তি মতে করা তার সজ ব্যবহার ॥

২। কামনার তৃপিতিত সুখ নাই নাই ।
কমায়া কামনা যদি সুখ লাগে ভাই ॥

৩। যদিহে রাখিব খোজা জীয়াই সমাজ ।
তেনে নিতে করা সকলোরে হিতকাজ ॥

হেমচন্দ্রের উপর বঙ্গীয় কবির প্রভাবের কথা ডঃ মহেশ্বর নেওগও স্বীকার করেছেন ।[২৯] তবে আনন্দের বিষয় এই প্রভাব তাঁর প্রতিভা বিকাশের অপায় হয়নি, বরং উপায়ই হয়েছে । 'আনন্দ রাম বরুয়ার স্বর্গযাত্রা' গোস্বামীর একটি সুন্দর শোক কবিতা । বাংলায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদনের মৃত্যুতে একটি শোক কবিতা রচনা করেন, কবিতাটির নাম "স্বর্গারোহণ" । এই দুই কবির কবিতা দুটির চিত্রকল্পের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় । ডঃ মহেশ্বর নেওগ যথার্থই বলেছেন, "হেমচন্দ্র গোস্বামীর 'আনন্দরাম বরুয়ার স্বর্গযাত্রা' আরু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মাইকেলর মৃত্যুত লিখা কবিতা দুটি ~~xx~~ একলগে পঢ়িলে আরু দুয়োটির Poetic imagery লৈ মন করিলে, দুয়োজন কবিরে নামর যেনে মিল তেনে মনরো মিল, এনে লাগে"।[৩০] আগেও লক্ষ করেছি,

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবনসঙ্গীত' কবিতার কিছু প্রভাব পড়েছে হেমচন্দ্র গোস্বামীর 'সংসারত সুখ নাই' কবিতায়। তবে এই প্রভাব খুব গভীর নয়।

একথা ঠিক যে হেমচন্দ্রের কবিপ্রতিভা ছিল, কিন্তু সে প্রতিভা বিকাশে ছিল প্রযত্নের অভাব। জ্ঞানগর্ভ কর্মে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে গিয়ে তাঁকে কিছুটা উপেক্ষা করতে হয়েছে কাব্যলক্ষ্মীকে। তাঁর কবিতা যেন অযত্ন লালিত বনফুল, তাই বলে তা সুরভি ও সৌন্দর্য রহিত নয়।

আনন্দ চন্দ্র আগরয়ালা

আনন্দ চন্দ্র আগরয়ালার (১৮৭৪ - ১৯৪০) জন্ম তেজপুরের অন্তর্গত বরজবারি গ্রামে। কবি শিক্ষালাভের জন্য কলকাতা আসেন এবং কলকাতাপ্রবাসী যে সমস্ত অসমীয়া সুসন্তান মাতৃভাষার সেবায় আত্ম নিয়োগ করেন তাঁদের দলভুক্ত হন। 'জোনাকী' কাগজে তিনি 'শ্রী হর্ষ' ছদ্ম নামে কবিতা রচনা করেন। দু'জন ছাত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি 'ধর্ম সঙ্গীত' নামে একটি গানের বই প্রকাশ করেছিলেন। কবির এই ধর্মপ্রীতি তাঁর বিভিন্ন কবিতার মধ্যেও বিদ্যমান। যেমন - 'গীত'। আগরয়ালা বিদেশী কবিতা অনুবাদ করে কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর অনূদিত কবিতার মধ্যে 'জীবন সঙ্গীত' 'চহা আরু পণ্ডিত' 'সুখর ঠাই' ইত্যাদি কবিতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য আগরয়ালার মৌলিক কবিতাও আছে।

কবির একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'জিলিকনি' ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তার অন্তর্ভুক্ত একাধিক অনুবাদ কবিতার মধ্যে উল্লেখ্য হলো 'জীবন সঙ্গীত'। অনুমান করা যেতে পারে আগরয়ালা তাঁর 'জিলিকনি' প্রকাশের স্ব পূর্বে অন্ততঃ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তা থেকে অনুপ্রেরণাও পেয়ে ছিলেন। আগরয়ালার 'জীবন সঙ্গীত' কবিতাটি Long fellow -র The Psalm of Life কবিতার অনুবাদ। উল্লেখ্য এই যে উক্ত ইংরেজী কবিতার বঙ্গানুবাদ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও করে ছিলেন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। তাঁর কবিতার নামও 'জীবন সঙ্গীত'। হেমচন্দ্রের এই অনুবাদটি ছিল খুব জনপ্রিয়।

আগারয়ালার অনূদিত কবিতাটি পাঠ করলে হেমচন্দ্রের কবিতাটির কথা মনে আসে। কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করতে পারলে দেখা যেত উভয়ের সাদৃশ্য কত বেশী। কিন্তু স্থানাভাবে তা করলাম না। একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি -

হেমচন্দ্র লিখেছেন -

দারা পুত্র পরিবার　　তুমি কার কে তোমার

আগরয়ালা লিখেছেন -

পুত্রকন্যা পরিবার　　কোন তয় তুমি কার

হেমচন্দ্র লিখেছেন -

দিন যায় ক্ষণ যায়।

আগরয়ালা লিখেছেন -

দিন যায় আহে রাতি।

হেমচন্দ্র লিখেছেন -

মহাজ্ঞানী মহাজন　　যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃ স্মরণীয় ---

আগরয়ালা লিখেছেন -

মহা মহা পুরুষর　　চানে কিরে জীবনর
আমিও করিব পারো জীবন পবিত্র।

আগরয়ালার 'সখু' কবিতাটিতেও Long fellow -র উক্ত কবিতা এবং হেমচন্দ্রের অনূদিত কবিতাটির প্রভাব আছে বলে মনে হয়। হেমচন্দ্রের 'জীবন সঙ্গীত' থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি -

করোনা সুখের আশ　পরোনা দুখের ফাঁস
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়;
সংসারে সংসারী সাজ　কর নিত্য নিজ কাজ
ভবের উন্নতি যাতে হয়।

এবার আগরয়ালার কয়েকটি পংক্তি XXX উদ্ধৃত করছি -

সুখ সুখ বলি মানুহ বলিয়া
নে দেখে সুখর মুখ
সুখ বিচারোঁতে পায় সংসারত
দুখর উপরি দুখ ।

দেখিও নেদেখা কিয় দিন কনা
XXX
মুখে হাতত আছে,
যিয়ে দিব পারে স্বার্থ বলি দান
সুখ ফুরে পাছে পাছে ।---

এক্ষেত্রে আগরয়ালার উপর হেমচন্দ্রের সুস্পষ্ট প্রভাব সকলেরই চোখে পড়বে । আগরয়ালা পরাধীন আসাম-জননীর চিত্র XXX আঁকতে গিয়ে বলেছেন -

হে আই অসম, কোয়াঁচোন মোক
কিয়নো সদায় দেখোঁ তযু শোক?
কি কথা বেজার মনের ভাবিছা
কিয়নো সদায় চকুলো টুকিছা ?
ওলমি পড়িছে মনোহর কেশ
কিয় আই তোমার মলিন বেশ ?

এখানে যে দেশ বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তার মূলে রয়েছে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎকাল প্রসিদ্ধ উদ্দীপক জাতীয় কবিতা । এই X প্রসঙ্গে ডঃ মহেশ্বর নেওগের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য —

'আনন্দচন্দ্র আগরয়ালার 'হে আই অসম কোয়াঁচোন মোক, কিয়নো সদায় দেখোঁ তযু XXX শোক' আদি কবিতাত সেই সময়তে যি দেশহিতৈষনা জাগি উঠিছিল, সি বোর মূলতে যেন (হেমচন্দ্র) বন্দ্যোপাধ্যায় ওজঃগুণ সম্পন্ন জাতীয় কবিতার বা - ছাটিয়েই ।'[৩১]

'কদমর কথা' আগরয়ালার একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। এই কবিতার সূচনা পঙ্ক্তিটি -

কলৈ যোয়া বাটরুয়া ক্ষন্তেক রোয়াহি
('বাটরুয়া' মানে পথিক)।

শোনার সঙ্গে সঙ্গেই স্মৃতিপথে উদিত হয় মধুসূদনের এই পঙক্তিটি -

দাঁড়াও পথিক বর জন্ম যদি তব
বঙ্গে। তিষ্ঠ ক্ষণকাল। ---   ('সমাধিলিপি')

চন্দ্রধর বরুয়া

চন্দ্রধর বরুয়া (১৮৭৪ - ১৯৬১) ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজীয় শিক্ষালাভের জন্য কলকাতা আসেন। এফ, এ পাশ করে বি,এ পাঠরত অবস্থায় চন্দ্রধরের পিতৃবিয়োগ হয়। তারপর তিনি আইন অধ্যয়ন করে যোরহাটে ওকালতি করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি অসম সাহিত্য সভার দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি হন। বাংলা সাহিত্যের প্রতি বরুয়া মহাশয়ের বাল্যকাল থেকেই অনুরাগ ছিল। স্কুলে পাঠরত অবস্থায় বাংলা কবিতা লিখতেও তিনি প্রয়াসী হয়ে ছিলেন বলে উল্লেখ করেছিলেন উক্ত সভার সভাপতির অভিভাষণে।[৩২]

চন্দ্রধর বরুয়ার কাব্য সম্পর্কে ড: মহেশ্বর নেওগের মন্তব্য আমাদের সহায়ক হবে। তিনি বলেছেন, "কবিরূপে এওঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য আধুনিক অসমীয়া কবিতা আরু কাব্যিক নাটকত মধুসূদন দত্তর কথাবস্তু আরু মধুসূদন-গিরিশ চন্দ্র ঘোষের ছন্দ প্রবাহর দ্বারা মুকুলি করি যেনি দিয়াত"।[৩৩] সত্যই চন্দ্রধরের 'মেঘনাদ বধ' নাটকে মধুসূদনের প্রভাব সুস্পষ্ট। সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা এই কাব্য-নাট্য সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, "মেঘনাদ বধ নাটক কথাবস্তু মধুসূদনর কাব্যর নাটকীয় রূপ"।[৩৪] এই নাটকে ব্যবহৃত ছন্দ মূলত: ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ - যার অন্যনাম গৈরিশ ছন্দ। এই রচনা শৈলীই কবি তাঁর

'কামরূপ জিয়ারী' ও 'বিদ্যুৎ বিকাশ' ব্যবহার করেছেন। প্রথম কাব্যের উপজীব্য বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী। দ্বিতীয় কাব্যের বিষয়বস্তু দধীচির আত্মত্যাগ। দধীচির কাহিনী নিয়ে ইতিপূর্বে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বৃত্রসংহার কাব্য' রচনা করেছেন। বঙ্গ সাহিত্যে এই কাব্য এক সময় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, এবং কেউ কেউ এই কাব্যকে 'মেঘনাদ বধ কাব্য'-রও উপরে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। বলাবাহুল্য এই কাব্যের সঙ্গে চন্দ্রধর অবশ্যই পরিচিত ছিলেন এবং 'কামরূপ জীয়ারী' রচনার সময় আদর্শ হিসাবে উক্ত কাব্যকে সামনে রেখেছিলেন। 'কামরূপ ~~জাহর~~ জীয়ারী'র প্রথম 'অধ্যা'র (সর্গের) সূচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ আছে, তার পরেই গৈরিশ ছন্দ।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবি যে বাণীবন্দনা করেছেন, তার সঙ্গে 'মেঘনাদ বধ কাব্যে' মধুসূদনের বাণীবন্দনার সাদৃশ্য শুধু ছন্দে নয়, ভাব এবং প্রকাশভঙ্গিতেও। বরুয়া লিখেছেন -

করিছোঁ কাকুতি আই কাব্যের ঈশ্বরী
বীণাপাণি সরস্বতী শুভ্র - আভরণা
করোঁ কোটি সেবা কমলপদত
কিঞ্চিত করুণা কণা করাঁ বিতরণ ---
মধুসূদনের বাণীবন্দনায় পাই -
বন্দি চরণারবিন্দ, অতিমন্দমতি
আমি ডাকি আবার তোমায় শ্বেতভুজে
~~xxxx~~ ভারতি। ---

চন্দ্রধর বাণীদেবীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন -

~~xxxxxxxx~~
তোমার কৃপাত আই হ'ল রত্নাকর
কবিগুরু চিরপূজ্য, অমর বাল্মীকি
কালিদাস মহাকবি ভুবন বিখ্যাত।
সকাতরে মাগোঁ এই অধম সেবকে
শক্তি দিয়াঁ কৃপাময়ী সক্তি বিধায়িনী

সম্প্রতিকে গাঁও এক সতীর মহিমা
সুধীর সমাজে শুনি, লভেক তৃপিতি ।

মধুসূদন দত্তও বাল্মীকিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন -

নমি আমি কবি গুরু তব পদাম্বুজে
বাল্মীকি ---
তবপদ চিহ্ন ধ্যান করি দিবা নিশি
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে
দমনিয়া ভবদম দুরন্ত শমনে -
অমর । শ্রী-ভর্তৃহরি , সূরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ, ভারত খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস - সুমধুরভাষী
--- কৃত্তিবাস, কীর্তিবাস কবি ,
এ বঙ্গের অলংকার । ...
গাঁথিব নতুন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল ; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব
দীন আমি । রত্নরাজি, তুমি নাহি দিলে
রত্নাকর ? কৃপা প্রভু কর অকিঞ্চনে ।

চন্দ্রধর বরুয়া 'বিদ্যুৎ বিকাশ' কাব্যে বীণার বন্দনা এবং কল্পনার বন্দনাও করেছেন এই একই ভাবে ।

বাজ আজি বীণা মোর গহীন রাগেরে
মধুর ঝংকার তুলি পধুর সুরর ।
ললিত গম্ভীর ধ্বনি উঠুক সঘনে
তুমিও কল্পনাদেবী ভাব প্রবাহর
লহরি রাজিয়ে মোর অন্তর পুরোয়াঁ ।

মধুসূদনও 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র প্রথম সর্গে কল্পনার বন্দনা করেছেন -

তুমিও আইস দেবী, তুমি মধুকরী
কল্পনা কবির চিত্ত ফুলবনমধু
লয়ে রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফলের উপর চন্দ্রধর কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখেছেন। যেমন, 'ডাক্তার হোয়াটো ভুল' ও 'এফেরি ভুল'। অনুরূপ ভাবের কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যে সেই সময় অনেক রচিত হয়েছে।

চন্দ্রধরের 'ডাক্তার হোয়াটো ভুল' কবিতা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি -

গোফ দু'জোরের সমানে খুরাই
সমানে গুরিতে কাটি
পালত সেন্দুর ঘাঁহি কোনে ফুরে
হৈ এনে ধুনীয়াটি ?---
বাপেকে এদিন তই বোলা বাবে
মিটোহে ঘটনা হ'ল
নকওঁ নেলাগে নধরিবা আরু
হোয়া কথা হৈ গ'ল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরূপ কবিতা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বলে মনে হয়। যেমন -

১। বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তাই রোজ রোজ কত রোজ ফুটে॥

২। সোনার বাঙল করে কাঙল
ইয়ং বাঙল কত জনা
সদ্য কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে
কানে লাগায় ফোঁস - ফোসনা।

এরা না-হিন্দু না-মোসলমান
ধর্মাধর্মের ধার ধারে না ।

চন্দ্রধরের xxx ভাঙা অমিত্রাক্ষর তথা xxx গৈরিশ ছন্দের আর একটু নমুনা দিয়ে আলোচনা শেষ করি ।

চম্পকত আছিল প্রয়াসী বৈদ্য
শংখ ওজা নামে -
সাক্ষাতে ধন্বন্তরি সর্পদংশনর,
অনুগত বন্ধু অতি
অন্তরংগ সুহৃদ চান্দর । ('কামরূপ জীয়ারী', চতুর্থ সর্গ)

নবীন চন্দ্র বরদলৈ

নবীন চন্দ্র বরদলৈ (১৮৭৫ - ১৯৩৬) ছিলেন দেশবরেণ্য সর্বভারতীয় নেতা । তিনি কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন , বিভিন্ন পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছে । তাঁর কন্যা নলিনীবালা দেবী ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে 'তীর্থযাত্রী' নামে পিতার গীত ও কবিতার সংকলন প্রকাশ করেন । বাংলার নজরুল ইসলামের মত দেশপ্রীতি ও মুক্তির উন্মাদনা বরদলৈর কবিতার একটি প্রধান সুর । xxx বরদলৈর 'পণ' গীতটির প্রথম তিনটি পঙ্ক্তি এই রকম -

আমার বিষম পণ
পূর্ণ স্বাধীনতা লভিম লভিম
আগত থৈ রণ ।

এই মুক্তিপণ শুধু নয়, এই ছন্দও নজরুলের বহু কবিতায় বিদ্যমান । যেমন 'সাম্যবাদী', 'মানুষ', 'পাপ' ইত্যাদি । একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি -

গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান। ('সাম্যবাদী')

বরদলৈর 'বন্দনা' কবিতাটির ছন্দ ও ভাবে নজরুলের 'ছাত্রদলের গানে'র দূর প্রভাব থাকতে পারে। 'বন্দনা'য় বীরকর্মীর বন্দনা আছে, আর 'ছাত্রদলের গান' কবিতায় ছাত্রদের বীর্যবত্তার কথা আছে। নজরুলের 'ছাত্রদলের গান' কবিতার প্রথম স্তবক -

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্র দল
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল।---

এবার 'বন্দনা'র কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি -

নমো নমো নমো সাধনা দীপ্ত
বীর কর্মীর দল
নমো নমো যার চরণ পরশে
পূত ধরনী তল।---

বরদলৈর 'আহ্বান' গীতটি নজরুলের 'চল্ চল্ চল্' কবিতাটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নজরুলের কবিতাটির প্রথম দিকের কয়েক পঙ্‌ক্তি -

চল্ চল্ চল্।
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরনী তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চলরে চলরে চল।

এবার 'আহ্বান' গীতের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি -

ডেকা গাভরুর দল
বীর বীরাঙ্গনার দল
নতুন তেজের রাঙলী রূপহী
করহি ধরনীতল॥

খোজর ভরত কঁপাক ধরনী
তরুনে চকুত জ্বলাক অগনি
শত সহস্র মৃত্যু নেওচি
ব'ল আগুয়াই ব'ল ।

(ডেকা - তরুণ, গাভরু - তরুণী , তেজ - রক্ত ,
খোজ - পদ তথা পদক্ষেপ , ব'ল - চল)

স্বদেশের মুক্তি সাধনার একাগ্রতা হরণ করে নিয়েছিল তাঁর কাব্য-সাধনার সাধনার আগ্রহ , তাতে দেশলক্ষ্মী হয়ত তুষ্টা হয়েছিলেন , কিন্তু বঞ্চিতা হয়েছেন সাহিত্য-সরস্বতী ।

হিতেশ্বর বরবরুয়া

হিতেশ্বর বর বরুয়া (১৮৭৬ - ১৯৩৯) ছাত্রাবস্থা xxxx থেকেই বাংলা গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন । ছাত্রাবস্থায় তিনি যে কাব্য রচনা করেন তার নাম 'সরলা বিজয়' । গ্রন্থটি অগ্নিদগ্ধ হয় ।[৩৫]

বর বরুয়ার 'কমতাপুর ধ্বংস বা সাদরী' (১৯১২) কাব্যে অমিত্রাক্ষরের ব্যবহার মনোরম । ইতিপূর্বে মিল্টন এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের আদর্শে রমাকান্ত চৌধুরী (১৮৭৫) ও ভোলানাথ দাস (১৮৮৮) পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করেন । ভোলানাথের ভাষায়ও মধুসূদনের প্রভাব সুস্পষ্ট । বর বরুয়ার 'বিরহিনী বিলাপ' কাব্যটির প্রকাশকাল ১৯১২ সাল । এই কাব্যে প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার বিরহের সুর মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মত এই কাব্যেও ছন্দের লালিত্য লক্ষনীয় । বর বরুয়ার কাব্যে নারীচরিত্র প্রাধান্য লাভ করেছে । তাঁর 'আভাস' কাব্যে (১৯১৪) একুশ জন দেশী বিদেশী নারীচরিত্র একেকটি গীতি কবিতায় বিধৃত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের পত্রকাব্য 'বীরাঙ্গনা কাব্য'টির কথা স্মরণ করা যায় । মধুসূদনের ইচ্ছা ছিল একুশখানি পত্র বা সর্গে কাব্যটি সম্পূর্ণ করার ।

এগারখানা পত্র প্রকাশের পর তিনি আরও কয়েকটি পত্রিকা রচনায় হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনোটিই সম্পূর্ণ হয়নি। বরবরুয়ার কাব্যে যে সব নারী স্থান পেয়েছেন, তারমধ্যে মধুসূদনের নির্বাচিত নারীও বিদ্যমান। (যেমন, তারা, জনা ইত্যাদি)। ল্যাটিন কবি অভিড তাঁর গ্রন্থে একুশটি পত্র-কবিতা রচনা করেন। তাঁকে অনুসরণ করেই মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করেন। 'আভাস কাব্য' এই বীরাঙ্গনা কাব্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। "আভাস কাব্য'ত পত্রালাপর কৌশল না থাকিলেও তার আদর্শ একেটি"।[৩৬] ১২৮ টি সনেট নিয়ে বরবরুয়ার 'মালচ' রচিত হয়, প্রকাশ কাল ১৯১৮ সাল। অসমীয়া ভাষায় গ্রন্থাকারে সনেট এই প্রথম। ইংরেজ কবিদের আদর্শ ছাড়াও মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও হেমচন্দ্র গোস্বামীর সনেট থেকে কবি সনেট চর্চার প্রেরণা পেয়েছেন সন্দেহ নেই।

বরবরুয়া শোক বিষয়ক সনেট রচনা করেছেন। সনেটে শোক কবিতা মধুসূদনও রচনা করেছেন। যেমন- 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত'। বরবরুয়ার কবি-জীবনে পত্নী বিয়োগ বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। 'বছর বিদায়' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।

বরবরুয়ার কবিতায় দুঃখের সুর বড়বেশী করে বেজে উঠেছে। জন্মের পর থেকেই তাঁকে দুঃখ ~~ভোগ~~ পোত করতে হয়েছে। তাই দুঃখতপ্ত হৃদয়ের সুর তাঁর কবিতায় সর্বাধিক ধ্বনিত। (সুখ যাতনা, খন্তেক, ঢাকনী ইত্যাদি)। লক্ষ্মীদেবীর প্রতি তাঁর আক্ষেপ চিরন্তন। (আহ্বান, লক্ষ্মী, ঘৃণা কমলার পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি)। বরবরুয়া ব্যক্তিগত জীবনে অভাব অনটনের মধ্য দিয়েই মানুষ। স্কুলে পরে যাওয়ার মত বস্ত্রের পর্যন্ত সংস্থান তাঁর ছিল না। বহুদিন তাঁকে না খেয়ে স্কুলে যেতে হয়েছে। মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি শিক্ষা লাভ করতে পারেননি দারিদ্র্যের জন্য। স্কুল কলেজের শিক্ষা পাননি বলে তিনি জ্ঞানার্জনে অবহেলা করেননি। অধ্যয়নপ্রিয় দারিদ্র্যপীড়িত বরবরুয়ার জীবন আমাদের কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাসকে (১৮৫৪ - ১৯১৮) স্মরণ করিয়ে দেয়, বাংলা গীতিকবিতার এক বিরল পথের পান্থ তিনি। কলকাতা থেকে অনেক দূরে

গ্রাম্য পরিবেশে দারিদ্র্য পীড়িত দুর্বহ জীবনভার তাঁকেও বরণ করতে হয়েছে, প্রতিকূল ঘটনা প্রবাহ তাঁকেও বিপর্যস্ত করেছে। দুঃখ বেদনার গরল পান করে কবি নীলকণ্ঠ হয়েছেন। তাই তাঁর কবিতায় অন্তর্দাহ ও কামনার উত্তাপ বড় বেশী করে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর বরুয়ার মত ইনিও ইংরেজী বিদ্যা বিশেষ আয়ত্ত করতে পারেননি, ফলে দারিদ্র্য - শোক পীড়া প্রভৃতি দুর্ভোগ তাঁর হয়েছিল নিত্য সঙ্গী। লক্ষণীয় এই যে, যে মধুসূদনের প্রভাব বরবরুয়ার ওপর সবচেয়ে বেশী, সেই মধুসূদনই শেষ বয়সে দারিদ্র্য পীড়িত হয়েছিলেন। এই কারণেই কি উভয় কবি লক্ষ্মীবন্দনা করেছেন? মধুসূদন লিখেছেন - 'কোজাগর লক্ষ্মীপূজা', 'অর্থ' ইত্যাদি কবিতা, আর বরবরুয়া লিখেছেন 'লক্ষ্মী'।

xxxx বরবরুয়ার মতে এই পৃথিবীতে চন্দ্র, সূর্য, তারা --- কেউ সুখী নয়। ('সুখী-কে? সুখ মুক্তা নাই')। বর বরুয়া মনে করেন - আশা ছলনাময়ী। (আশা, ভ্রান্তি, মনে ধনা পৃথুরী ইত্যাদি) এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' কবিতাটি, সেখানেও নৈরাশ্যের সুর। বর বরুয়ার 'মালচ' কাব্যে এমন কয়েকটি কবিতা আছে যার বিষয়বস্তু মধুসূদনের নানা সনেটের বিষয়বস্তুর অনুরূপ। যেমন স্বপন (স্বপ্ন), কবি, কবিতা, শকুন্তলা, কল্পনা ইত্যাদি। বর বরুয়ার 'ইহকাল' শীর্ষক একটি সনেট আছে, অপরদিকে মধুসূদনের একটি সনেটের নাম 'পরকাল'। এতদ্ব্যতীত বরুয়া লিখেছেন - 'সীতা', মধুসূদন লিখেছেন 'সীতাদেবী', 'সীতার বনবাসে'।

মধুসূদন যেমন তাঁর 'মেঘনাদ বধ কাব্যে' কবিগুরু xxxx বাল্মীকির বন্দনা করেছেন, তেমনি বরবরুয়াও 'মহাকবি শেকস্পীয়রের বন্দনা করেছেন। বরবরুয়ার 'যুদ্ধক্ষেত্রত অহোমরমনী' কাব্যের প্রথম সর্গে বাক্‌দেবী ও কল্পনাদেবীর আরাধনা আছে মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র মত। বরবরুয়ার বীরাঙ্গনা 'মূলা' তাঁর স্বামীকে প্রাচীন ক্ষত্রিয় রমনীর মত যুদ্ধে যেতে উৎসাহিত করেছেন। এখানে সম্ভবতঃই মধুসূদনের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' কবিতাটি স্মৃতিপথে উদিত হয়। দ্বিতীয় সর্গে মূলা চিন্তিতা, কারণ তাঁর স্বামী যুদ্ধে গিয়েছেন, এখনো তাঁর কোনো সংবাদ তিনি পাননি। মূলার সঙ্গী ছিল মুহিলা। তিনি মূলাকে

সান্ত্বনা দেন। এমন সময় দূত এসে তাঁর স্বামী চারু গোহাত্রির মৃত্যু সংবাদ দেয়। পতি নিহত শুনে তিনি ছিন্নমূল পাদপের মত ঢলে পড়েন। এই সর্গটি মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের প্রথম সর্গটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। চারু গোহাত্রির মৃত্যু সংবাদ যেন বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ। বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে রাবণ শোকাকুল হয়ে পড়েন, কিন্তু স্বল্পকাল পরেই পুত্রের বীরত্ব সংবাদ শুনে ধৈর্য ধারণ করেন। চারু গোহাত্রির মৃত্যু xxxxx সংবাদে মূলা প্রথমে শোক বিমূঢ়া হলেও পরে পতির বীর্যবত্তার কথা শুনে তিনি প্রীত হন। চতুর্থ সর্গে মূলা রাজকুমার চকুলেন - চুরঙ্গকে দেশরক্ষার কর্তব্য, বীরের দায়িত্ব, অরিবিনাশের পবিত্র ধর্ম, আহোমের গৌরবের কথা ইত্যাদি বলে তাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেন। এতেও মধুসূদনের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'র প্রভাব আছে বলে মনে হয়। পঞ্চম সর্গে রণক্ষেত্রে নারী - সৈন্য অবতীর্ণ হতে দেখে পাঠান শিবিরে তুর্বক ও দু'জন পালি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। নারীসৈন্যসহ প্রমীলাকে দেখে অনুরূপ বিভ্রম 'মেঘনাদ বধ কাব্যে' রাঘবেরও হয়েছিল। অষ্টম সর্গে কনচেং ও তুর্বকের মধ্যে প্রথমে বাক্যুদ্ধ ও পরে অস্ত্রযুদ্ধ হয়। এই দৃশ্য 'মেঘনাদ বধ কাব্য'র মেঘনাদ - লক্ষণের উক্তি প্রত্যুক্তির দৃশ্যটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা বলেন, "মাইকেল মধুসূদন দত্তর কাব্যর প্রমীলা আরু মেঘনাদ চরিত্রর সামান্য প্রভাব চাওঙ্গ্রাচেংমুং আরু মূলা চরিত্রর কল্পনাত অনুভব করা যায়"।[৩৭]

বরবরুয়া কর্মফল ও ভাগ্য বা নিয়তির অখণ্ডনীয় রীতির উপরে বিশ্বাসী। চারু গোহাত্রির মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত মূলা এইভাবে সান্ত্বনা পেয়েছেন -

কর্মফল মাথো ইটো - বিষাদ সন্তাপ
পূর্ব জন্মার্জিত ফল পূর্ব জনমত
হরিলো আনোবা কোন সতী তিরুতার (নারী)
হিয়াত জ্বলাই জুই (অগ্নি) পরাণর পতি --- (দ্বিতীয় সর্গ)

মধুসূদনও কর্মফল ও ভাগ্যের রীতির উপর বিশ্বাসী। পুত্রশোকাতুরা জননী চিত্রাঙ্গদাকে রাবণ বলেছেন -

এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়, কেন দেহ মোরে ?
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে সুন্দরি ?
হায় বিধিবশে দেবি সহি এ যাতনা
আমি। ---

('মেঘনাদ বধ কাব্য', প্রথম সর্গ)

চিত্রাঙ্গদা উত্তরে রাবণকে বলেছেন -

হায় নাথ নিজ কর্ম ফলে
মজালে রাক্ষস কুলে, মজিলা আপনি।

'মেঘনাদ বধ কাব্যে' দেশপ্রীতির কথা বলা হয়েছে এই ভাবে -

দেশ বৈরী নাশে যে সমরে
শুভক্ষণে জন্ম তার ধন্য বলে মানি
হেন বীর প্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী। (প্রথম সর্গ)

বরবর্ণয়ার কাব্যেও অনুরূপ দেশপ্রীতিরই পরিচয় ফুটে উঠেছে -

স্বদেশের স্বাধীনতা তার অর্থে যিটো
জীবন উৎসর্গ করি মরে সমরেতে -
মৃত্যু তার হয় শান্তি। --- (চতুর্থ সর্গ)

'বিরহিনী বিলাপে'র দ্বিতীয় সর্গে অস্তমিত সূর্যের প্রতি সম্বোধন আছে। অনুরূপ ক্ষোভযুক্ত সম্বোধন নবীন চন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধেও' (১৮৭৫) আছে। ※ তবে উভয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য নেই বললেই চলে। নবীন চন্দ্র লিখেছেন -

কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি।

*** *** ***

নিতান্ত কি দিনমনি ডুবিলে এবার

*** *** ***

যাও তবে যাও দেব কি বলিব আর
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ - উদয় অচলে ।

বরবরুয়ার কাব্যে আছে -

xxxx যোয়া বারু দিবাকর
নরলা অলপো তুমি ?
যোয়া তুমি যোয়া পই চিরকাল লই
নে দেখোঁ আকউ যেন
পুব ফালেদি তোমাক ,
নোলোয়া আকউ তুমি যেন রঙা হই ।

এক্ষেত্রে নবীনচন্দ্রের উক্তিটি হয়ত বা বরবরুয়ার স্মরণে ছিল । বরবরুয়া মধুসূদনের আদর্শে প্রতি সর্গে একটি করে শীর্ষনাম দিয়েছেন । এই কাব্যের তৃতীয় সর্গে একটি স্ত্রী শালিককে উদ্দেশ্য করে নায়িকা বলেছেন -

কয় কোনো কবি হেরুয়ালি তই
'স্বাধীনতা' মহাধন ।
সি দুখতে তই কান্দি থাক নিতে
সদা বিয়াকুল মন ॥
এই কথা পখি মিছা করি কয় ,
একোকে নে জানে তেওঁ ।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র 'সারিকা' শীর্ষক কবিতায় মধুসূদনও লিখেছেন -
আজিও পাখীর মন বুঝি আমি বিলক্ষণ -
আমিও বন্দি লো আজি ব্রজকারাগারে ।
সারিকা অধীর অবি কুসুম-কানন ,
রাধিকা অধীর অবি রাধা-বিনোদন ।

বরবরুয়ার কাব্যের চতুর্থ সর্গে মলয়ার প্রতি নায়িকার নির্দেশ -

নাই আজি সেই দিন
গুচি যা, মলয়া ।
আদর না পাও আজি মোর ফুলনিত ।
গুচি যা অলই তই
বিরাজিছ য'ত
প্রেমিক প্রেমিকা গাই প্রণয়র গীত ।

এখানেও 'ব্রজাঙ্গনার' সুর ধ্বনিত হয়েছে । ডঃ মহেন্দ্র বরা বলেছেন, "অবর ফালর পরা 'বিরহিনী বিলাপ'র যদি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'র লগত কোনো মিলিতে ভাল মিল আছে, তেনে হলে এই মিলিতেই"।[৩৮] তবে বরবরুয়ার কৃতিত্ব এই যে তিনি মধুসূদনকে শুধু অনুকরণই করেননি, স্বীকরণ করে নিজ সৃষ্টি ক্ষমতাকে রূপ দিয়েছেন ।

রঘুনাথ চৌধারী

রঘুনাথ চৌধারী (চৌধুরী নয়, ১৮৭৯ - ১৯৬৮) বিহগবিষয়ক কবিতা রচনার জন্য অসমীয়া সাহিত্যে 'চরাই কবি' বা 'বিহগী কবি' বলে পরিচিত । তিনি বিহগ ব্যতীত নিসর্গ বিষয়েও নানা কবিতা রচনা করেছেন । তাঁর কাব্যগুলি হল - 'সাদরী' (১৯১০), 'কেতকী' (১৯১৮), 'কারবালা' (১৯২৩), 'দহিকতরা' (১৯৩১) ও 'নব মল্লিকা' (১৯৫৮)। চৌধারীর সর্বশেষ কাব্যটি বাদ দিলে বাকি সবগুলি কাব্য ১৯৩১ এর মধ্যে রচিত । প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় রঘুনাথ প্রকৃতির সৌন্দর্যের ধ্যান করেছেন । ১৯৩১ সালের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে অনেক প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে । কবি নিশ্চয়ই এই সব কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । এতদ্ ব্যতীত সংস্কৃত কাব্য, ইংরেজী সাহিত্য এসব থেকেও তিনি প্রেরণা পেয়েছেন । কবি নিশ্চয়ই বিখ্যাত ইংরেজী কবিতা 'Daffodil' (Wordsworth), 'Ode to a Nightingale'(Keats)

পড়ে খুবই আনন্দ পেয়েছিলেন । কারণ তাঁর প্রকৃতি প্রীতি ও পতত্রী প্রীতি উক্ত কবিতা দু'টিকে স্মরণ করিয়ে দেয় । চৌধারীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুনিপুণ মন্তব্য করেছেন ভবানন্দ দত্ত । তাঁর মতে - 'বিহগী কবির কাব্যত কালিদাসর প্রভাব অতি বেছি । আনকি বহু ক্ষেত্রত তেখেতর কবিতাত কালিদাসর শব্দ বিন্যাসরো প্রভাব দেখা যায় । জগত আরু জীবন সম্বন্ধে কবির দৃষ্টি রোমাণ্টিক নহয় , ই গভীর ভাবে বিষাদময় আরু নেতিবাচক । ই কবি জীবনত ভারতীয় দার্শনিক ভাবধারার প্রভাব । কিন্তু এই দুঃখবাদর উৎস হৈছে কবির বাস্তব জীবনর অভিজ্ঞতা। কবির মুক্তিকামী মনে পরবশ্য সমাজর নানা ক্ষুদ্রতা , নীচতা, কপটতাপূর্ণ পঙ্গুতা , গ্লানি আদি দেখি গভীর দুখ পাইছিল, আরু ইয়ার পরা নিজর মনক মুক্ত রাখি চিরমুক্ত বিহগী জীবনর লগর আপোন অন্তর সংযুক্ত করিছিল"।[৩১]

প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে দেখতে পাই নিসর্গের বর্ণনা রয়েছে বিষয়ের পট ভূমিকা রূপে, তার কোন জীবন্ত সত্তা তখনো স্বীকৃত হয়নি । আধুনিক যুগে মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের কাব্যে প্রকৃতি কিছুটা প্রাধান্য পেলেও সজীবতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি । বিহারীলাল থেকে নিসর্গ কবিতার যে ধারাটি পাওয়া যায় তাতে প্রকৃতিপ্রেম নারীপ্রেমের আভাসে উদ্ভাসিত হয়েছে । প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় প্রকৃতি নিছক বর্ণনায় পর্যবসিত হয়নি , কবি হৃদয়ের রক্ত-তিলকে তা জীবন্ত সরস হয়ে উঠেছে । এই পর্যায়ের কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্র নাথ সেনের কথা উল্লেখ করা যায় । কবি পুষ্পপ্রিয় ছিলেন । পুষ্পের নাম দিয়ে তিনি একাধিক কাব্যও রচনা করেন । যেমন - 'অশোকগুচ্ছ' (১৯০০), 'গোলাপগুচ্ছ' (১৯১২)। তাঁর কবিতায় বিচিত্র ফুলের সমারোহ । 'দোপাটী' 'বনতুলসী' ইত্যাদি বহু খ্যাতিহীন পুষ্পও তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে । রবীন্দ্র-শিষ্য সত্যেন্দ্র নাথ দত্তও ফুলের উপর বহু কবিতা লিখেছেন । তাঁর 'ফুলের ফসল' গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই ফুল নিয়ে রচিত । এই গ্রন্থের প্রকাশ কাল ১৯১১ খৃষ্টাব্দ । চৌধারীর কবিতাতেও বহু পুষ্পের সমাগম । যেমন - 'মধুমালতী', শেয়ালি (শিউলি), মাধবী , কেতেকী (xxxx (কেতকী), কমল, করবী , মালতী , জবা , চম্পা ইত্যাদি ।

রঘুনাথের 'বিহগী কবি' নামটি সার্থক । কারণ বিহগ বা পক্ষী তাঁকে আবিষ্ট করে । 'দহিকতরা' রঘুনাথের বিখ্যাত কবিতা । ডঃ বাণীকান্ত কাকতির

মতে 'দহিকতরা' কামগন্ধহীন অতীন্দ্রিয় প্রেমের ইতিহাস।[80] দহিকতরা এক জাতীয় পাখি। এই কবিতাটি হেমচন্দ্রের 'চাতক পক্ষীর প্রতি' কবিতাটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। হেমচন্দ্র চাতক পাখির মধুর কন্ঠস্বরে বিমোহিত, বিমোহিত কবি রঘুনাথও। হেমচন্দ্র বলেন -

একাকী তোমার স্বর
জগত প্লাবিত করে
শরতের পূর্ণ শশী
বিমল আকাশে বসি,
কৌমুদি ঢালিয়া যথা ব্রহ্মান্ড ভাসায়। (কবিতাবলী)

রঘুনাথও বলেন -

আলোকে কে অন্ধকার সুদূর প্রান্তর
কোন সাগরের পরে
অমৃত গরল ভরা
মেলি দিছ সঁফুরাটি মোহিনী কন্ঠের
বহে গ'ল বিশ্বব্যাপী দিক্ দিগন্তর। ---

হেমচন্দ্র বলেন -

যে আনন্দে আছ ভোরে
তাহার তিলেক মোরে
পাখী তুমি কর দান
তাহলে উন্মত্ত প্রাণ
কবিতা তরঙ্গে ঢালি
দেখাই ধরায়।

রঘুনাথ বলেন -

কোমলতা পবিত্রতা সৌন্দর্য মাধুরী
প্রেম প্রবাহিনী হই
আছ চির কাল বই

স্নিগ্ধ সলিলত যেন থাকিয় নাদুরি
পুরাবিনে বাঞ্ছা মোর কচান সাদরী ।

হেমচন্দ্রের কবিতাটিতে আছে ২২ টি স্তবক, রঘুনাথের কবিতায় আছে ৩১ টি স্তবক । হেমচন্দ্রের এই জাতীয় আর একটি কবিতা - 'কোনো একটি পাখির প্রতি'। এই কবিতারও মূল সুর পক্ষী-প্রীতি । এই কবিতাতেও পাখির সুমধুর গান প্রাধান্য পেয়েছে । হেমচন্দ্র বলেন -

ডাক্ রে আবার পাখি ডাক্ রে মধুর ।
শুনিয়ে জুড়াক প্রাণ, তোর সুললিত গান,
অমৃতের ধারা সম পড়িছে প্রচুর
আবার ডাক্ রে পাখি ডাক্ রে মধুর । --- (কবিতাবলী)

রঘুনাথ বলেন -

পল্লব পল্লব ভরি উঠে গীতিচ্ছন্দ
কিবা অপরূপ দৃশ্য
উদ্বেলিত মহাবিশ্ব
সুরপর পরা আনি অমৃতর ভান্ড
ঢালি দিছ মরতত প্রেম মকরন্দ ।

হেমচন্দ্র বলেন -

কে তোরে শিখালে বল
এ সঙ্গীত নিরমল ।

রঘুনাথ বলেন -

কোনে নো পঠালে তোক কলকণ্ঠ করি ।

হেমচন্দ্রের কবিতা দু'টির মূলসুর পাখির সুমধুর গান । রঘুনাথের কবিতাটির মূল সুরও তাই । সুতরাং রঘুনাথ হেমচন্দ্রের কবিতা দু'টির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এরকম অনুমান করা অসঙ্গত হবে না মনে হয় । তবে উভয় কবিই ইংরেজী

Ode to a Nightingale ও To a Skylark - এই বিশ্ব বিখ্যাত কবিতা দু'টি থেকেও প্রেরণা পেতে পারেন। রঘুনাথের 'দহিকতরা' সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের 'দুই সুর' কবিতাটিকেও স্মরণ করিয়ে দেয়। কুহু ও কেকার ডাকে সত্যেন্দ্রনাথ যেমন মুগ্ধ, তেমনি রঘুনাথ মুগ্ধ দহিকতরার সুমধুর গীতে। উভয় কবিই কবিতা শেষে অতীন্দ্রিয় জগতে উত্তরণ করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ 'মদন মহোৎসব' কবিতায় মল্লিকা পুষ্পের কাছে চান -

মনোহর বিদ্যাটি দাও এ মোর নিবেদন -
মনের ক্ষুধা মিটিয়ে দিতে শক্তি যেন হয়,
নইলে শুধু রূপের আদর হয়না সে অক্ষয়।

রঘুনাথও গিরিমল্লিকার কাছে বলেছেন -

প্রাণ প্রিয় -----
দিয়া প্রেম মকরন্দ অমৃত গরল ('গিরি মল্লিকা')

রঘুনাথ উক্ত 'মদন মহোৎসব' কবিতাটি থেকে প্রেরণা পেতেও পারেন।

রঘুনাথ একাধিক স্বল্প-ব্যবহৃত তৎসম শব্দও তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। যেমন - অরুন্তুদ, কহ্লার, মধুপর্ক ইত্যাদি। এই ধরণের শব্দ প্রয়োগ দ্বারা রোমান্টিক কবিতায় ক্লাসিক সুর ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসের পশ্চাতে মধুসূদনের কাব্যের প্রেরণা রয়েছে কি?

একদিকে রঘুনাথ জীবনের জয়গান গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের মতই -

করি দীর্ণ জরা জীর্ণ পুঞ্জীভূত ক্লেদ
শেষ হ'ল মহাকাল রাত্রি
উঠহে ঋত্বিক ধ্যানী অমৃতর পুত্র
উঠ যত মুক্তি পথযাত্রী। ('প্রশান্তি')

অন্যদিকে তাঁর 'বৈরাগ্যের কথা' কবিতায় সংসার ও জীবনের প্রতি যে হতাশার মনোভাব ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে মধুসূদনের বিখ্যাত কবিতা 'আত্ম-বিলাপ'র অবসাদৃশ্য চোখে পড়ে। একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি -

ভাৰ্য্যাপুত্ৰ ধনজন দিলোৱেই বিসৰ্জন
যিতিৰ কুটুম্ব কেও নাই লগৰীয়া,
আশা পক্ষী উৰি গ'ল শূণ্য হিয়া পৰিৰ'ল
সংসাৰত আজি মই অকল শৰীয়া।
সুখৰ সংসাৰ মোৰ অচিৰে পৰিল ওৰ
নিজানতে বহি কত কান্দো হুমানিয়া
সহায় সম্বলহীন দেখি সবে কৰে খিন
যেয়ে দেখে বাটৰ বলিয়া।

তাঁৰ 'অন্তিম জ্যোতি' কবিতাটিও মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' কবিতাটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনিও মধুসূদনের মত নৈরাশ্য নিয়ে বলেন -

মৰম ভিখাৰী মই বিশ্ব ভান্ডাৰত
খুঁজি ছিলো অন্তৰৰ দান
গৰল উদ্ভব হ'ল সিন্ধু মন্থনত
অমৃতৰ নাপালো সন্ধান।
উদ্দাম বাসনা নাই স্বৰ্ণ মুগ খেদি
সংসাৰত ভ্ৰমিলো কিমান,
দুৰ্জ্জয় লালসা তেওঁ/গুচিল মোৰ
ব্যৰ্থ হ'ল লক্ষ্য ভেদী বাণ। ---

অবশ্য এই কবিতার শেষে যে অনন্ত প্রীতি প্রকাশিত হয়েছে তাই কবিকে চির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেছে।

রঘুনাথ মূলতঃ প্রকৃতির কবি। তাঁর কাছে প্রকৃতি ধরা দিয়েছে নব নব রূপে নব চেতনায়।

অম্বিকা গিরি রায় চৌধুরী

অম্বিকা গিরি রায় চৌধুরীর (১৮৮৫ - ১৯৬৭) জন্ম মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও জগতানন্দ বা রামরায়ের বংশে। জন্মস্থান বরপেটা। দেশসেবার ব্রতে তিনি শৈশব কাল থেকেই দীক্ষিত এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময় কারাবাসও বরণ করেন (১৯২১ - ২৩)। ইনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে পারতেন। 'তুমি'(১৯১৫) 'বীণা' (১৯১৬) ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত কবিতা গ্রন্থ। চৌধুরীর কবিতায় সর্বভারতীয় মুক্তি চেতনা পরিলক্ষিত হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য / বিবেকানন্দের বাণী ও সাধনা সমগ্র ভারতবর্ষে এক নতুন শিহরণ জাগিয়েছিল। কর্ম ও যোগ সাধনার দ্বারা আত্মার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত ক'রে ভারতবর্ষকে বিশ্বের মুক্তিদাতা হিসেবে জাগিয়ে তোলার স্বপ্ন এই সময় থেকেই দেশাত্ম বোধে উদ্বুদ্ধ ভারতবাসী দেখতে থাকে। বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়েও বলা যায়, অসমীয়া শিক্ষিত কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই।

অম্বিকা গিরির জীবন ভারতীয় আদর্শে প্রভাবিত। ব্যক্তিগত জীবনের মহত্ত্ব ঘোষণার সাথে সাথে মানব সমাজ ও স্বদেশকে শোষণ, উৎপীড়ন, বন্ধন থেকে মুক্ত করার তীব্র উন্মাদনা ফুটে উঠেছে তাঁর কাব্যে। এ তাঁর রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সাহিত্য - পাঠের ফলশ্রুতি বললে ভুল হবে না মনে হয়। নজরুলের প্রভাব অম্বিকা গিরির কবিতায় খুবই সুস্পষ্ট।

কবি বলেন -

> গোটেই তৃপ্ত মুগ্ধ করিছে সৌম্য ধুনীয়া দেশ
> প্রীতি প্রেমালোক ধৌত উজ্জ্বল অনিমেষ।
> বিহীন হীনতা নীচতা ভীরুতা বিহীন হিংসাদ্বেষ
> সে যেহে আমার মহা সাধনার মহা অভিযানর শেষ।

একই সুর ধ্বনিত হয়েছে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার অন্তর্গত এই উক্তিতে -

> মহা বিদ্রোহী রনক্লান্ত
> আমি সেই দিন হব শান্ত

যবে উৎপীড়নের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ ভূমে রণিবে না,
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

কবির 'লাগে মোক মহা মানব স্থান' কবিতাটিতে 'মই মহামানব - নহওঁ দানব' - এই পঙক্তিটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। এই আবর্তন প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় নজরুলের আগমনী কবিতার এই পঙক্তি কয়টি -

নাই দানব
~~xxx~~ নাই অসুর
চাইনে সুর
চাই মানব।

উভয় কবির মহামানব- ধারণায় সাদৃশ্যও অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

রায় চৌধুরীর 'অনুভূতি' কাব্যের বহু কবিতা নজরুলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই কাব্যের একটি কবিতার নাম 'মই বিপ্লবী মই তাণ্ডবী'। এই কাবতাটিতে কবি সর্ববিধ অন্যায় অবিচার ও ইন্দ্রিয় লালসার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করেছেন। রায় চৌধুরীর উক্ত কবিতাটির প্রথম দু'টি পঙক্তি -

মই কাল বিজয়ী বিপ্লবী
মই কাল বিনাশী তাণ্ডবী ---

এই জাতীয় উক্তি নজরুলের প্রকাশভঙ্গির স্মারক। নজরুলের ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও জেহাদ ঘোষনার অনুরূপ উত্তাপ রায় চৌধুরীর মধ্যেও অনুভূত হয়। 'দুর্পণ' কবিতাটির কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করছি তা বোঝাতে -

ইবার দেখিম
　　শকতি - সম্পদ তোর কিমান প্রবল -
ইবার বুজিম,
　　দীন হীন ক্ষুদ্র মই কিমান দুর্বল। ---

রায় চৌধুরী 'বেদনা - বিজয়' কবিতায় বলেছেন -

মই মহা দুর্নিবার বিদ্রোহী দুরন্ত
কলিজা একন মানি -
লক্ষ বেদনাই হানি
জীবনর ফুল পাত্র করিছে উপান্ত ।

এই উদ্ধৃত অংশের প্রথম পঙক্তিটি কি নজরুলকে স্মরণ করিয়ে দেয় না ?

রায় চৌধুরীর 'মই আছোঁ মই আছোঁ' কবিতার নিম্নোদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি -

মোর শির কিয় নত হব আন সত্তার ম'ত
নাই বিচার ?

আমাদের মনে করিয়ে দেয় নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার এই পঙক্তিগুলিকে -

বল বীর -
উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির।   ('অগ্নিবীণা')

রায় চৌধুরীর 'যা যা সকলো গুচি যা' কবিতায় আছে -

মোরে শূন্যত জ্বলিল মোরে চন্দ্র সূর্য তারকা রাজি
মোরে পরশত অগ্নি উগারি বজ্র - বিজুলী উঠিল গাজি,
মোরে ভ্রুকুটিত গ্রহ যাপগ্রহর ঠেকাঠেকি লাগি উরিল ধুলি ।
সেই ধুলিতেই মোরে পরশত নতুন সৃষ্টি উঠিল ফুলি, -

নজরুলের ~~উদ্দাম~~ সাম্যাভিত্তিক উচ্ছ্বাস যা 'অগ্নিবীণা'র বিভিন্ন কবিতায় ('বিদ্রোহী', ধূমকেতু' ইত্যাদি) বিদ্যমান, তা রায় চৌধুরীর কাব্যেও সঞ্চারিত হয়েছে দেখতে পাই । নজরুল সৃষ্টির জন্য ধ্বংসের কামনা করেছেন । এই মানসিকতা রায় চৌধুরীর উক্ত কবিতাতেও বিদ্যমান ।

আবার কখনো রায় চৌধুরীর কবিতা পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের কথাও মনে পড়ে যায় । অনন্ত, সুন্দর, সীমা, অসীম প্রভৃতি ধারনাও রবীন্দ্র - উপলব্ধি সম্ভূত ।

এই সব শব্দের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার রায় চৌধুরীর কবিতায়ও দৃষ্ট হয়, অনুভূত হয় অনন্তের জন্য অসীমের জন্য প্রীতি। এই অনন্ত প্রীতি রায় চৌধুরীর 'তুমি' কাব্যেই বেশী লক্ষণীয়। তবে তাঁর 'অনুভূতি' কাব্যও এই ভাব থেকে মুক্ত নয়। 'অনুভূতি'র কবিতাগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। 'সূচনী' কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি দু'টিতে আছে -

মই কাটি কাটি সকলো বন্ধন
ধরি তোক হম তোর প্রভু মহাজন।

এই প্রভুপ্রীতি অসীম ~~প্রীতি~~ প্রীতিরই নামান্তর। রবীন্দ্রকাব্যালোচনায় জীবন দেবতার কথা না উঠে পারে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্ম পরিচয়' গ্রন্থে বলেছেন -

--- "যিনি আমার সমস্ত ভালমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাকেই আমার কাব্যে আমি জীবন দেবতা নাম দিয়াছি"। নানা বিদগ্ধ ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতার নানাবিধ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিতর্ক-সাপেক্ষ সেই আলোচনায় না গিয়ে আমরা দেখবো, রবীন্দ্রনাথ নিজে 'জীবন দেবতা' কবিতায় কি বলেছেন -

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস আসি অন্তরে মম ?

('চিত্রা' কাব্য)

এই জীবনদেবতার লীলারসমাধুর্য রায় চৌধুরী তাঁর 'লীলানন্দ' কবিতায়ও যেন ফুটিয়ে তুলীতে চেয়েছেন -

তই মোক অবহেলা করি
জীবনর আঁরে আঁরে ফুরিবি পলাই
মই তোর বিরহত পরি
পরি রম বেদনার হান খোদ খাই।

****

এয়ে নেকি লীলা খেলা তোর ?
এয়ে নেকি লীলানন্দ মোর ?
কেতিয়া ক'চোন তই মোক দেখা দিবি ?

এই লীলানন্দ আর রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা বস্তুত অভিন্ন ।

"আত্মাভিমান" কবিতার 'তুমি'ও এই লীলানন্দ ভিন্ন অন্য কিছু নয় । যেমন-

তুমি হেনো মহামানী
বহি আছ বিশ্বর মুরত,-
মই হেনো ক্ষুদ্র প্রাণী
পরি আছো ধরার বুকত ---

বলতে কি, 'অনুভূতি' কাব্যের অধিকাংশ কবিতাতেই এই 'তুমি' অর্থাৎ স লীলানন্দ বিদ্যমান । 'তত্ত্বভেদ' কবিতার শেষ স্তবকে আছে -

বেদনাক্লিষ্ট আর্ত্তনাদত
নিবিলালে হিয়াখণ,
অসীমক জুরি পায় কিয় মই
মহান মিলন ধন ?

এখানেও কবির অসীম প্রীতি অভিব্যক্ত । রায়চৌধুরীর 'যোরেই হব জয়' কবিতায় আছে -

সুন্দরেরই সৃষ্টিত এনে
কলুষর উৎপাত -
সুন্দরে নিজ ইঙ্গিতেরেই
করিব নিপাত ।

কবির এই 'সুন্দর' - প্রীতিতে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য উপলব্ধির প্রভাব লক্ষণীয় ।

রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন খন্ড সৌন্দর্যে পূর্ণ তৃপ্তি নাই । সেই সুরই ধ্বনিত হয়েছে রায়চৌধুরীর 'প্রয়োজনর ভগবানেই পূর্ণভগবান' কবিতার এই কয়েকটি পঙক্তিতে -

ক্ষুধার পাচত ক্ষুধা চরাই
তৃপ্তিত অতৃপ্তি জগাই
খন্ডতারে চলে যিটো ব্যাপক অভিযান,
তাতেই ভাবে লাভ হ'ল তার পূর্ণ-ভগবান ।

সীমা অসীমা প্রসঙ্গ এই কবিতাতেও বিদ্যমান। দু'টি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি -

অসীম সীমার স্বাদ লৈ লৈ
এটা টাকে পার হৈ গৈ
বিশ্ব - ব্যাপক মূর্ত - লীলার পরিপুষ্টির পরা,
নিবিড় আত্মানন্দত গৈ ক্লান্তি বিলোপ করা ?

'মোর আনন্দময় অভিষেক' কবিতাতেও রূপ-অরূপ তথা সীমা - অসীমের কথা আছে। যেমন -

মেল খালে মোর বন্ধ দুয়ার
মুকুলি হল হিয়ার পাত, -
উঠিল জ্বলি অরূপ রূপার
স্নিগ্ধ শীতল আলোক তাত।

রবীন্দ্র - ভাব ধারায় অভিষিক্ত কবির কাছ থেকে এই উপলব্ধি প্রত্যাশিত।

রায় চৌধুরীর 'তুমি' (১৯১৫) একটি বিখ্যাত কাব্য। একদা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পাঠ্য হিসাবে এই কাব্যটি নির্বাচিত হয়েছিল।[৪১] এই কাব্য রায় চৌধুরীর আধ্যাত্মিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কাব্যটি সাতটি ছেদে বিভক্ত। কবি বহুরূপে তুমিরূপী ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছেন। 'তুমি' মনগড়া কৃত্রিম কাব্যের পুঁথি নয়। এই কাব্যে কবির ব্যক্তিগত জীবনের কোন বিশিষ্ট নারী মূর্তির প্রতি প্রেমের অনুভূতির স্বরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে বলে ডঃ বাণীকান্ত কাকতি মনে করেন।[৪২] বহু কবির কাব্যপ্রেরণার পশ্চাতে নারীর ভাবমূর্তি ক্রিয়াশীল থাকে। এই প্রসঙ্গে দান্তে কীটস্, শেলী প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য কবিদের কাব্যকৃতির কথা স্মরণ করা যায়। স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথও। তাঁর কাব্য প্রেরণার পশ্চাতে নারীর কল্পনা আছে, এই নারী শাশ্বত প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক। এই নারীই কখনো মানসী, কখনো মানস - সুন্দরী, বিচিত্র রূপিনী - চিত্রা, ইনিই। মূলতঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিক্রিয়ার পশ্চাতে এক কৌতুকময়ী বিচিত্র রূপিনী নারীর অনুপ্রেরণা উপলব্ধি করেছেন। রায় চৌধুরীর 'তুমি' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র রূপিনী নারীর ছায়াপাত ঘটেছে, যে নারী-কল্পনা সুস্পষ্ট হয়েছে 'চিত্রা' কাব্যের 'চিত্রা' কবিতায়।

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী ।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল কাননে
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল চরণে
তুমি চঞ্চল গামিনী । ---   ('চিত্রা' কাব্য)

রায় চৌধুরীও 'তুমি' কাব্যে তুমিকে বহুরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন । উদ্ধৃতি দিচ্ছি -

তুমি লাজর রাঙলী আভা
গাভরুর গোলাপী গালত ,
তুমি শান্তির জিরনি খিনি
চেনাহীর বাহুর তলত ---   ('তুমি' , ১)

এই 'তুমিই' অসীম । সর্বত্র 'তুমি' দর্শনের অনন্যায় অসীমানুভূতি বা সর্বানুভূতি । রবীন্দ্রনাথ সীমার মধ্যে অসীমকে প্রত্যক্ষ করেছেন , প্রত্যক্ষ করেছেন রায় চৌধুরীও -

বাহিরর রেণু এটি
অন্তরত ফুলি উঠি ,
মিলনর মহা রেখা তুলিব জুলাই ,
সীমার মাজত অসীম লুকাই ।
অনন্ত রহস্যমানে তোমাত লুকাই ,
বৈচিত্র্যর ভিতরেদি উঠে মার পাই , -
তুমিয়ে বিকাশ হোয়া
তোমাতে সামরি লোয়া ---
সরজে অসীম কত সৌন্দর্যর ভূমি ---
কি সুখেরে আছা হেরা সুন্দর অমর ?   ('তুমি', ৪)

রবীন্দ্রনাথ অসীম তথা পূর্ণের মধ্যে বংশীধ্বনি শুনতে পেয়েছেন "পুনশ্চ কাব্যের" 'বিচ্ছেদ' কবিতায় -

সে ও তো নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ
সে যে বাজায় বাঁশী। প্রতীক্ষার বাঁশী,
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।

এই বংশীধ্বনি রায় চৌধুরীও শুনতে পেয়েছেন -

জীবনের ছিদ্র চাই চাই
মিলনের মাধুরী ভরাই
প্রাণ ভরা প্রেমের পশরাই
বাজে বিশ্ববেণুয়া।   ('তুমি', ৭)

এই রবীন্দ্রপ্রভাব কবি অম্বিকা গিরির ভাবপুষ্টি ও কল্পনা সমৃদ্ধির সহায়ক হয়ে থাকলেও তাঁর কবিপ্রতিভা স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল ও বিশিষ্ট। তার কারণ তিনি রবীন্দ্র ভাব বুঝে নিশ্চিত হয়েছেন, সেই ভাব তাঁর মানসপুষ্টির সহায়ক হয়েছে। শুধুমাত্র অনুকরণে তা সম্ভব হতো না।

ভৈরব চন্দ্র খাটনীয়ার

ভৈরব চন্দ্র খাটনীয়ারের জন্ম হয় বরপেটার বজালীর কাজাজিরা পাড়া গ্রামে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে। তিনি নর্মাল স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর কাল জিরা পাড়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর 'সেবা' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে।

খাটনীয়ার রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন। তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন, "যার হৃদয় গীতাঞ্জলিয়ে এবার স্পর্শ করিছে, তার হৃদয়ত সি অমর ভাবে অবস্থান করিছে। পাহরনর ঢাকনিত তার চিন্-চাব নাই -

কিয়া হৈ গলেও, বিশ্বর সংঘাতত পুনর সিগ্রানত মূর্তিধারি উঠার প্রমাণ পোয়া যায়; তার প্রমাণ এই ক্ষুদ্র লেখকর হৃদয়ত মাজে (সাজে) পাই রাইজর আগত স্বীকার কিয় করিবলৈ লাজ করা নাই।"[৪৩]

খাটনীয়ারের 'সেবা' শীর্ষক কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি -

ছন্দ তুমি শব্দ হই কাহানি ফুলিবা
মোর হৃদয় আকাশে।
নিত্য তুমি ভৃত্য মোক কাহানি করিবা
কোমল পরশ - বাতাসে।
বন্ধু তুমি বন্ধু হই কাহানি ফুরিবা
মোর নিত্য হই [illegible]
[illegible]
সত্য তুমি সত্য হই কাহানি ওলাবা
তনু মন সত্য করিলই। ---
পূর্ণ তুমি পূর্ণ মোক কাহানি করিবা
মোরেই হৃদয় কাঢ়ি লই
সৃষ্ট এই বিশ্ব তোমার পরম কমনীয়
নিঃস্ব যই কেতিয়া নো চায়,
ভোগ্য তুমি ক্ষুদ্র ভোগ ভাবি বর্জনীয়
সর্বত্রতে তোমাকেই পায়।

ডঃ মহেশ্বর নেওগর মতে এই কবিতায় যে সুর ধ্বনিত হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ভাব মণ্ডলকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।[৪৪] রবীন্দ্রনাথের একাধিক গানে এই সুর ধ্বনিত হয়েছে -

১। সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয় পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর। ("গীতাঞ্জলি", 'সীমায় প্রকাশ')

২। তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভরে,
আমার ক'রে নিয়ে তবে নাও যে তোমার ক'রে।
আমার বলে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার করেদেব তখন তারা আমার হবে।
('গীতিমাল্য", 'নিবেদন')

৩। আগুনের পরশমণি ছোয়াও প্রাণে
এ জীবন পূণ্য করো দহন দানে।
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো -
('গীতিমাল্য", 'পরশমণি')

ডঃ মহেশ্বর নেওগ যথার্থই বলেছেন, " (ভৈরব চন্দ্র খাটনীয়ারর) কবিতাতো বিশ্বকবির ছাঁ জল কৈয়ে পরা দেখা যায়"।[৪৫]

সূর্য কুমার ভূঞা

সূর্যকুমার ভূঞা'র (১৮৯৪ - ১৯৬৪) পিতার নাম বুবিলাল ভূঞা। সূর্য কুমার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি ইংরেজীতে এম্.এ.। লণ্ডন বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে পি, এইচ, ডি ও ডি.লিট উপাধি লাভ করেন। সূর্য কুমার ভূঞা রায় বাহাদুর, পদ্মশ্রী ইত্যাদি উপাধিতেও ভূষিত হন। প্রধানত: ঐতিহাসিক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি। তবে তিনি অসমীয়া সাহিত্যে কবি হিসেবেও পরিচিত। ১৯২৩ সালে তিনি 'জয়মতী উপাখ্যান' কাব্য রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী' দ্বারা ভূঞা অনুপ্রাণিত হয়ে ছিলেন, মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন 'ভানুসিংহ' ছদ্ম নাম নিয়েছিলেন, তেমনি সূর্য কুমার ভূঞা নিয়ে ছিলেন 'ভানুনন্দন' ছদ্ম নাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে তিনি একটি গ্রন্থও রচনা করেন। নাম 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই ভারতের পুরাতন উচ্চ আদর্শ নানা ভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'নৈবেদ্য' কাব্যের বিভিন্ন কবিতার ভাবাদর্শের কথা স্মর্তব্য। যেমন - 'নৈবেদ্য'র 'প্রার্থনা' কবিতায় রবীন্দ্র নাথ বলেছেন -

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দারিদ্র বেশ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে, ---
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্ম বন্ধু অতিথি অনাথে,
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল ---

এই সুরই ধ্বনিত হয়েছে ভূঞার 'লক্ষমুদ্রা' কবিতার নিম্ন লিখিত পঙ্ক্তিগুলিতে -

বিনয় করুণা ক্ষমা শিখি রত্নহার
নির্মূল করিছে নিজ গর্ব অহংকার
নিত্য দেখিছে স্বপ্ন মানব কল্যাণ,
অনেকের অনন্তে সত্যের সন্ধান,
বয়ু সম্রাজীর কোনো নহয় পতিত
সরুবর ভেদাভেদ মনুষ্য সৃজিত,
জীর্ণবস্ত্র পঁজাঘর এ সন্ধ্যা ভোজন,
হিয়া কিন্ত হিমাদ্রি-শৃঙ্গ বিজেপন।

ডুঞার 'সৃষ্টি এবং পতন' আরেকটি উৎকৃষ্ট কবিতা। এই কবিতাটি পড়তে পড়তে নজরুলের কথা মনে জাগতে পারে। একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি --

সেই প্রলয়ের দিনা
তুমি প্রভু হাতে ল'না
তোমার রুদ্র বীণা
আনন্দময় নাছিল কোনো,
আছিল নিঘাত অরুণ জোনো
দিগন্তদি উঠিল জ্বলি ভীষণ উদ্দীপনা ---
চন্দ্র সি গ'ল ক্ষ এরি
নতুন আকাশ বাঞ্ছা করি,
শূণ্য গলত জোতির্মালা
সি দিন দীপ্তহীনা ---
আকাশ সি হ'ল ডায়র - ঢকা,
নাছিল ক'তো ভূমিকা রেখা,
সৃষ্টি জুরি পরিল ব্যাপি
দোকোল - ডাকাল পানী,
তার ওপরে উঠিল প্রভু
তোমার রুদ্র বাণী।--- ('নির্মাল' কাব্য)

নজরুল ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির নব - পূর্ণিমাকে প্রত্যক্ষ করেছেন ---

শ্বেত শত দল বাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বর ধারিনী মা
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা ।

("অগ্নিবীণা", রক্তাম্বর ধারিনী মা')

এই ভাব ভুক্তার উক্ত কবিতাতেও ('সৃষ্টি পাতনি') দুর্লভ নয় -

সেই প্রধারত উদিল পুনু লক্ষ ভরা
সেই বিনাশত জন্ম দিলে পুষ্প ধরা
মুঞ্জরিলে চিন্তা - লতা
নতুন সুরর নতুন কথা ,
বিশ্ব এরি পরিল হিয়াত
নতুন সৃষ্টি কথা ---

রত্নকান্ত বরকাকতি

রত্নকান্ত বরকাকতি (১৮৯৭ - ১৯৬০), উচ্চশিক্ষার জন্যে কলকাতায় যান । ১৯২১ খৃষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের সময় পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কলেজ XXXK ত্যাগ করেন ।

বরকাকতি অসমীয়া সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁর 'শেয়ালি' সর্বজন বিদিত বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ। এই কাব্য গ্রন্থটি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর আর দু'খানা কাব্য গ্রন্থ হলো 'তর্পণ' ও 'চন্দ্রহার'। এই দু'টি কাব্য গ্রন্থের প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৯৫৩ ও ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ, যা আমাদের আলোচ্য কালসীমার বাইরে। তাই এখানে অনালোচিত। 'শেয়ালি' কাব্য গ্রন্থটিতে কবির কবিতার সমস্ত বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত। বরকাকতির কবিতায় পাই অমার ওজঃস্বিতা। তাঁর কবিতার শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ অসমীয়া সাহিত্যে অভিনব হলেও বাংলায় তা বহুল প্রচলিত। কবিকে হয়তো বা তা মুগ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বরকাকতির শ্রদ্ধা অপরিসীম। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ 'বৈকুণ্ঠ বিহঙ্গ'। এই বিহঙ্গের কূজনে কবি মুগ্ধ অনুপ্রাণিত। এই প্রসঙ্গে মহেশ্বর শর্মার মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য - 'রবীন্দ্র দর্শন কবিতাত বরকাকতি ডাঙরীয়াই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথক 'বৈকুণ্ঠ বিহঙ্গ' আখ্যারে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিছে। কবি বরকাকতি ডাঙরীয়ার কবিতাত রবীন্দ্রনাথর প্রভাব কিছু পরিমাণে ধরিব পারি"।[৪৬]

কবির কবিতার নামকরণও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন - প্রশ্ন, অমৃত, সুন্দর, চিরসুন্দর, তাজমহল, মুক্তি, নীরববীণা, মহাত্মা, সৌন্দর্য ইত্যাদি। এর অনেক কয়টি রবীন্দ্রকবিতারও নাম। (প্রশ্ন, মুক্তি, সুন্দর, নীরব বীণা ইত্যাদি)। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রশিষ্য বলে পরিগণিত অথচ স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত কবির সংখ্যা বিরল নয়। রত্নকান্ত বরকাকতিকেও সেই হিসাবে রবীন্দ্রশিষ্য বলা যায়, তিনিও অসমীয়া সাহিত্যে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। বরকাকতির 'দু'টি মানুহ' রবীন্দ্রনাথের 'দুই পাখি'কে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'দুই পাখি'র কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি -

বনের পাখি বলে   খাঁচার পাখি ভাই
বনেতে যাই দোঁহে মিলে,
খাঁচার পাখি বলে   বনের পাখি আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে। --- (সোনার তরী)

খাঁচার ও বনের পাখির স্বভাব স্বতন্ত্র । এই স্বাতন্ত্র্যই লক্ষিত হয় 'দুটি মানুষ' - এর মধ্যে । বরকাকতির 'দু'টি মানুষ' থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি ---

এটি ঘরত
  দু'টি মাথোন
দুটি মানুহ থকে
  এটি খেলে
লুকাই মপোন
  এটি জুলি মরে ।
এটি হাঁহে
  তরার মুখত
ফুলর গন্ধ ঢালি
এটি কান্দে
  ধরার বুকুত
  ফুলর বন্ধ মানি ।

বরকাকতির 'দুটি মানুহ' কবিতায় বর্ণিত মানুষ মূলত একজন । কিন্তু এই সংসারে তার জীবন দ্বিধা বিভক্ত । একজন এই মায়াময় সংসারে বিষয় বাসনায় আবদ্ধ, অন্যজন ব্যোম বিহারী, মুক্ত, স্বাধীন । একই মানুষের এই দ্বিবিধ সত্তা আত্মা - xxxxxxxxxx পরমাত্মারূপেও কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন ।[৪৭] একই মানুষের বন্ধ ও মুক্ত এই দ্বিবিধ রূপ রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন । রবীন্দ্রভক্ত বরকাকতি যে উক্ত রবীন্দ্রভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হবেন তাতে আশ্চর্য কি ? শ্রী অতুল চন্দ্র বরুয়া বরকাকতির উক্ত কবিতাটি সম্পর্কে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথর 'দুই পাখি' নামক কবিতার পরোক্ষ প্রভাবো হয়তো এই কবিতাত অলপ - আচরন আছে ।"[৪৮] বরুয়ার এই উক্তি যথার্থ ।

আত্মা আত্মার সাথে মিলে যেতে চায়, একাত্ম হতে চায় । কিন্তু বিঘ্নও আছে । রবীন্দ্রনাথ বলেন --

ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে
ভুবন মোহিনী মায়া
যৌবন ভরা বাহু পাশে তার
বেষ্টন করে কায়া ।   ("মানসী", 'সুরদাসের প্রার্থনা')

এই 'ভুবন মোহিনী মায়া' কথা বরকাকতিও উপলব্ধি করেছেন -

আত্মায় মিলিব খোজে মোর
তোমার আত্মারে ।
নোয়ারে ধরিব লগ মনে
মায়াই আগুরে ।   ('আত্মার মিলন')

রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' (বলাকা) একটি বিখ্যাত কবিতা । এই কবিতা পাঠ করে বরকাকতি হয়তো তাঁর 'তাজমহল' লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন । রবীন্দ্রনাথ যে তাজমহলকে বলেছেন -

এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল ।

বরকাকতি তাঁর 'তাজমহল' কবিতায় তাকেই একটু ভিন্ন ভাবে বলেছেন -

মাত্র মই বুজিছোঁ ইমানে
তাজ তুমি রঙা তেজ
বিরহীর অন্তরর
পোটমারি শিলা হোয়া
মর্মভেদী ব্যথা, ---

তবে মহেশ্বর শর্মার মত আমরাও মনে করি যে 'তাজমহলে' রবীন্দ্রপ্রভাব থাকিলেও দু'টি কবিতার ভাব ধারা পৃথক ।[৪১] রবীন্দ্রনাথ অমৃতপিয়াসী । তিনি বলেন --

দু'টি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দু'টি আঁখি-মাঝে।
খুঁজিতেছি কোথা তুমি,
কোথা তুমি।
যে অমৃত লুকানো তোমায়,
সে কোথায়। ("মানসী", 'নিষ্ফল কামনা')

বরকাকতিও অমৃতপিয়াসী। তিনিও অমৃতের সন্ধান করেন -

অমৃত আছে বা কত
কোনে জানে তার বাতরি ? ---
মই বিচারি পাখ
ঘুরিলোঁ অশেষ।
গিরি গুহা বন বননি
না পালো যে ক'তো
না পালো সন্ধান
পরিলো শেষত
ভাগরি, --- ('অমৃত')

রবীন্দ্রনাথ রূপের মধ্যে অরূপকে খুঁজে পেয়েছেন। প্রসঙ্গত: স্মরণ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত সেই পংক্তিটি -

আমি রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি।

বরকাকতিও এই অরূপকে রূপের মধ্যে পেয়েছেন -

রূপতে অরূপ
লুকাই অমৃত
খেলিছে যেমত
বিজুলি। ('অমৃত')

বরকাকতির 'শিলারূপ' কবিতাটি পড়তে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি' (মানসী) কবিতাটি স্মৃতিপথে উদিত হয়। মনে হয় বরকাকতি 'অহল্যার প্রতি' পাঠ

করেই এই কবিতা রচনার প্রেরণা পেয়েছেন। বরকাকতি বলেন -

কোন চৈতন্য
অচেতন হই
পরিছে ই শিলারূপ।
কোন পরাণর
হিয়া পুরি পই
উঠিছে পূজার ধূপ ?
কোন পরাণে নো
যোগাব পরাণ
পাষাণক এই
পোয়ার গান।
এই নীরসক
করিব সরস
বরষ বরষ
কোন পূজারীয়ে
সঞ্চারি প্রাণ ?
যি প্রাণর প্রেম
জাগি ছিগি হ'ল
এই অবাক পুকান
শিলর স্তূপ --- ('শিলারূপ')

যদিও কবিতাদ্বয়ের বক্তব্য স্বতন্ত্র, তথাপি কবিতা দু'টির প্রকাশভঙ্গির সাদৃশ্য লক্ষনীয়। আবার রবীন্দ্রনাথ প্রিয় ও দেবতাকে অভিন্ন বলে কল্পনা করেছেন। --

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে - প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা। ("সোনার তরী", 'বৈষ্ণব কবিতা')

বরকাকতিও প্রায় অনুরূপ সুরে বলেন -

প্রতিমা নাই আকার তোমার
সর্ব বিমূর্তি পলা ,
সর্বরূপেতে প্রতিমা তোমার
বিশ্বময় তিতির মালা ।   ('সর্বরূপত')

বরকাকতির 'বিশ্ব হরণ' কবিতাতেও এই সুর ধ্বনিত হয়েছে । কবি তাঁর প্রিয়ার মধ্যে বিশ্বকে দেখেছেন -

তিল তিল কৈ হরিল বিশ্ব
তিলোত্তমা হৈ করিলা নিঃস্ব ---   ('বিশ্বহরণ')

রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যে উপেক্ষিতা' (প্রাচীন সাহিত্য) শীর্ষক প্রবন্ধের অন্যতম আলোচ্য বিষয় রামায়ণের 'ঊর্মিলা' চরিত্র । রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করে বরকাকতি তাঁর 'ঊর্মিলা' কবিতা লেখার প্রেরণা পেতেও পারেন । বরকাকতির 'ঊর্মিলার বিষয়বস্তুও এক । বরকাকতি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম'এর চতুর্থ অংকের শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রার দৃশ্যের কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ করেছেন । এই অনুবাদের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' (প্রাচীন সাহিত্য) প্রবন্ধ থেকেও তিনি পেতে পারেন । কারণ ওই অংকের কয়েকটি শ্লোকের সুন্দর বঙ্গানুবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ সেই প্রবন্ধে । চতুর্থ অংকের 'যাস্যত্যদ্য --- সবৈ' শ্লোকটির তিনি অনুবাদ করেছেন -

তোমাদের জল না করি দান
যে আগে জল না করিত পান
সাধ ছিল যার সাজিতে, তবু
স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে
যে জন মাতিত মহোৎসবে
পতি গৃহে সেই বালিকা যায়
তোমরা সকলে দেহো বিদায় ।

বরকাকতির অনুবাদে পূর্বোক্ত রবীন্দ্রকৃত অনুবাদের ছায়া পড়েছে, সে সন্দেহ নেই।

---আগেয়ে যি তোমালোক পানী নো যোগাই
নিজে কদা এটোপাও পানী খোয়া নাই।
ফুল সাজ পিন্ধিবর হেঁপাহতে যেনে
চেনেহতে এটি পাতো হাঁয় নিছিঞ্চিলে,
তোমালোকর ফুল উঠিব ধরাতে ফুলি,
আনন্দতে যেন পরি ছিল ঢলি ঢলি,
পতির গৃহলৈ আজি সি ছোয়ালী যায়,
তোমালোকে দিয়াঁ সবে চেনেহ বিদায়।   ('শকুন্তলা বিদায়')

'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অনন্ত প্রেমের কথা বলেছেন। 'জীবন জ্যোতি' কবিতায় বরকাকতিও সেই অনন্ত প্রেমের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছেন। অনন্ত প্রেম কি কবির মতে -

হৈয নোহে সুখ
নোহে দুখ
অন্তরর অনন্ত জ্যোতি
প্রদীপর দরে মাথোঁ
পুরি পুরি
জ্বলি থকা জীবন জ্যোতি।   ('জীবন জ্যোতি')

রবীন্দ্রনাথ 'কল্পনা'- কাব্যের 'স্বপ্ন' কবিতায় পূর্বজন্মের প্রথমা প্রিয়াকে স্মরণ করেছেন। বরকাকতির 'পূর্ব স্মৃতি' কবিতাটি রবীন্দ্র নাথের 'স্বপ্ন' কবিতাটিকে মনে করিয়ে দেয়। একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি রবীন্দ্রনাথ থেকে -

দূরে বহু দূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনী পুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে
মোর পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।

বরকাকতির 'পূর্ব স্মৃতি'ও সেই স্মৃতিচারণের আনন্দ পূর্ণ।

আজি পধূলির
ভরির ধূলিত
চকুর পানীরে তিতি
আনিছোঁ মননৈ মোর
তোমারেই সেই
পূর্বর হিয়া নিয়া স্মৃতি।
পরিছে মনত বসন্ত অন্তর
ম্লান পরা মোর
সন্ধিয়া পরত জ্বলি
স্নিগ্ধ দুটি চকুতরা, ---

উভয় কবিতার ভাব ও সুরসাদৃশ্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্র সাহিত্যে পাই বিশ্ব জীবন তথা পূর্ণের সাথে খণ্ড জীবন তথা অপূর্ণের মিলনের কথা। বরকাকতির 'সুন্দর' কবিতায়ও সেই সুর ধ্বনিত হয়েছে।

বিশ্ব হৃদয়র সাগর বুকুত
খণ্ড হিয়ার উঠিছে ঢেউ
ঢৌয়ে ঢৌয়ে মিলি
চুমা খাই হেনো
নাচিছে মিলন মধুর মউ।

বরকাকতির 'মিলন' কবিতাতেও অপূর্ণের পূর্ণের সাথে মিলনের ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে -

মিলনর গর্ব নাই
মিলন মিলন কই
মিলিযায় মিলনেরে
মহান বিশ্বত।

বরকাকতির 'কবির স্থান' কবিতাটি পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' (সোনার তরী) কবিতাটির কথা মনে জেগে উঠে। রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতায় কবি - পত্নী বলেন -

রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়ো
রচিতেছ বসি পুঁথি বড়ো বড়ো
মাথার উপরে বাড়ি পড়ো পড়ো
তার খোঁজ রাখ কি।
গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব -
মাথাও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম,
মিলিবে কি তাহে হস্তি অশ্ব,
না মিলে শস্যকণা।
অন্ন জোটেনা কথা জোটে মেলা
নিশিদিন ধরে একী ছেলে খেলা
ভরতীরে ছাড়ি ধরো এই বেলা
লক্ষ্মীর উপাসনা।

বরকাকতির 'কবির স্থান' কবিতায়ও কল্পনা-বিলাসী কবির অবস্থা একই -

রাজ দর বারত
নাই নিমন্ত্রণ
কবির আসন
সভাত নাই। ---
যিবা কিবা কয় কথা
আপোন মনের
গায় যিবা গান
পরাণ ভরি;
মিল তার নাই
রাজ্য চালনারে
অর্থরো একো
নাই কণা কড়ি।

রবীন্দ্রনাথ 'আশঙ্কা' কবিতায় যে শঙ্কিত প্রণয়ের কথা লিখেছেন -

আকাশ-ভরা কিরণ ধারা
আছিল মোর তপন-তারা,
আজিকে শুধু একেলা তুমি
আমার আঁখি-আলো। ('মানসী')

বরকাকতির 'বিশু হরণ' কবিতায়ও অনুরূপ ভাব ফুটে উঠেছে -

তেতিয়া যদিও নাছিলা তুমি
রূপর চমকে চমকাই চকু;
আছিল তেতিয়া সুন্দর মোর
জোন - বেলি - তরাই জুরাই বুকু।

রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতায় আছে -

'তব স্তনহার হতে নভস্থলে খসে পড়ে তারা ?

বরকাকতির কবিতায়ও ঠিক একই ভাবে বক্তব্যটি প্রকাশ পেয়েছে -

স্তনহার যার
ছিগি পরিছিল
না চোতে নভত
তরা - মুকুতার মণি, ~~xxxx~~ ('ধরা পড়া')

রত্নকান্ত বরকাকতির উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের উপর তিনি একটি কবিতাও লিখেছেন গভীর শ্রদ্ধায়। নাম - 'কবীন্দ্র রবীন্দ্র দর্শন'। এই কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তি -

বৈকুণ্ঠ বিহঙ্গ তুমি
নর বেশে যেন
উদিলা মর্ত্তত
বিশু প্রাণ গান হই

বাজিছে যাথোন
তোমার কণ্ঠত। ---
ধন্য আজি অরতর
ব্যাকুল হৃদয়
শত শতাব্দীর;
ধন্যই তৃষিত প্রাণ
দেখি বিশ্ব কবি
ঋষি মূরতির।

এই 'বৈকুণ্ঠ বিহঙ্গ'র কণ্ঠ নিসৃত বাণীই বরকাকতিকে ম কাব্য প্রেরণায় সমধিক উদ্দীপিত করেছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কবির 'পুখুরীর প্রতি পাণী পিয়া' কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্তর 'চাতকের কথা' [redacted] অবলম্বন রচিত। কবিতার পাদটীকায় কবি তা স্বীকারও করেছেন। সত্যেন্দ্র নাথের কবিতাটির প্রথম স্তবক এই রকম -

হে সরসী। তুমি স্বচ্ছ শীতল -
বলেছে আমায় অনেক পাখী;
হায়, আমিও তৃষিত, তবু তোর পানে
নারিনু নারিনু ফিরাতে আঁখি। ---

বরকাকতির কবিতাটির প্রথম স্তবক উদ্ধৃত করছি সাদৃশ্য দেখানোর জন্য -

পুখুরী তই নির্মল শীতল
বহুতো চরায়ে কইছে মোক
পিয়া হতে মরোঁ যদিও সদায়
নোয়ারোঁ চেও চাব যে তোক। ---

পূর্বেই বলেছি বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত প্রখ্যাত কবি রবীন্দ্র - শিষ্য বলে পরিচিত, অসমীয়া হলেও রত্নকান্ত বরকাকতির স্থান এক হিসেবে তাঁদেরই মধ্যে। ডঃ মহেশ্বর নেওগ যথার্থই বলেছেন, "বিশ্বকবির প্রভাব অসমীয়া কবিতাত কিদরে পরিছে তাক সম্পূর্ণ ভাবে বিচার করা টান। কিন্তু কবিতার ভাষার চাঁচ আরু poetic imagery - আদিত সেই প্রভাবর সাঁচ নৈ বহুত

থিনি কথা অনুমান করিব পারি । অসমত যি সকল রবীন্দ্র কাব্য রস পিপাসু কবি আছে রত্নকান্ত বরকাকতি অন্যতম ।তাঁর কবিতাত রবীন্দ্র প্রতিভার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ।[৫০] একই ধরনের মন্তব্য ধ্বনিত হয়েছে শ্রী অতুল চন্দ্র বরুয়ার উক্তিতে - "কবিতা সমূহত বরকাকতি দেবর ছন্দ মাধুর্যর বৈচিত্র্য ফুটি উঠিছে - ছন্দর শ্বাসাঘাত প্রধান লয়লায় পতিত । এই বহুত পরিমাণে বিশ্বকবি ঠাকুরেরই পদ লালিত্যর প্রভাব। ভাবানুসরণর পিনে দিও তেওঁ 'বৈকুণ্ঠ বিহঙ্গর)অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের) একান্ত অনুগত শিষ্য '।[৫১]

নলিনী বালা দেবী

সুপরিচিতা মহিলা কবি নলিনীবালা দেবী (১৮৯৮ - ১৯৭৮) কর্মবীর নবীনচন্দ্র বরদলৈর কন্যা । ১৯২২ সালে কবির কন্যা 'পুতলী'র মৃত্যু হয় । কন্যার মৃত্যুর পাঁচ বছর পূর্বে তিনি স্বামীকে হারান । তাঁর দুর্ভাগ্যময় জীবনের সংগে মিল রয়েছে বাঙালী মহিলা কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর, তিনিও বিবাহের অল্পকালের মধ্যে স্বামী ও পুত্র হারান । কন্যা পুতুলীর মৃত্যুতে নলিনীবালা খুব ব্যথা পান এবং তার স্মৃতিতে একটি শোকগাথা রচনা করেন । কবিতা রচনায় তিনি পিতার কাছে প্রেরণা পেয়েছিলেন । কবির প্রথম কাব্য এবং সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'সন্ধিয়ার সুর' (১৯২৮) । ভক্তিরসাত্মক তথা অধ্যাত্ম বিষয়ক ৪০ টি কবিতা এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে । এই কাব্যের 'অনাহুত', 'শেষ অর্ঘ', 'পরমতৃষ্ণা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কবিতা। দু'একটি কবিতায় দেশপ্রেম ও শোকানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে । এই সংসারে দুঃখ আছে সুখও আছে । এই সুখ মানুষকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না । এই দুর্লভ বস্তু এক অজ্ঞাত পুরুষের করায়ত্ত । এই অজ্ঞাত পুরুষই ঈশ্বর ভগবান রূপে কল্পিত । তাঁর কাছে ভক্ত কবিরা প্রাণের কথা বলেন ।'মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে জ্যোতির্ময়' - সেই তাঁকে জানলেই মৃত্যুলোক থেকে অমৃতলোকে উত্তরণ সম্ভব । এই জ্যোতির্ময়ের কথা রবীন্দ্রনাথের বহু সাহিত্য - কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে । আর এই জ্যোতির্ময়ের কথা নলিনী বালা দেবীর

'সন্ধ্যার সুর' কাব্যেও নানা ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। নলিনী বালা দেবী রবীন্দ্র সাহিত্যের সাথে শুধু পরিচিত ছিলেন তা নয়, তাঁর দ্বারা প্রভাবিতও ছিলেন। নলিনী বালা দেবীর উপর রবীন্দ্র কাব্যের প্রভাব ডঃ মহেশ্বর নেওগ লক্ষ করেছেন।[৫২] রবীন্দ্র সাহিত্যে জ্যোতির্ময় বহুরূপে সম্মুখে বিরাজিত। কখনো ইনি 'রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি' রূপিণী জননী। কখনো বা 'মহাজনারণ্যের' 'অঙ্গ বিহীন দেব'। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের নিবেদন -

বীর্য দেহো তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশ আপনারে রাখিবারে স্থির ॥ ('নৈবেদ্য', 'নিবেদন')

আর নলিনীবালা দেবী বলেন -

কোনো কালে তুমি মই
কোনো রূপে হোয়া নাই ভিন
হিয়ার উছাহ মোর
হব খোজে তোমাতে বিলীণ।---
তুমি জোতি মই রেণু
হে অরূপ। রূপর আলয়
অণুরূপে অনাদিত
তোমাতেই লীণ হয় শেঁ। ('সমাধি')

সেই জ্যোতি ও অরূপের কাছে নলিনীবালা দেবীর 'শেষ ভিক্ষা' যার অন্য নাম আত্ম নিবেদন -

হিয়া যদি নিরাশার হয় মরুভূমি
শান্তি বাণী নীরবে শুনাবা
জগরত ভগা হিয়া জাগরি পরিলে
তুমি মোক সাবটি ধরিবা।

নলিনীবালা দেবী তাঁর অধ্যাত্ম বিষয়ক কবিতা লেখার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য',

'গীতাঞ্জলি', 'খেয়া' প্রভৃতি কাব্য থেকে পেয়েছিলেন মনে হয়। নলিনীবালার 'অলকানন্দা' কাব্যের ভূমিকাতে ('আগ কথা') শ্রী হরি প্রসাদ নিওগ মহাশয় যথার্থই বলেছেন, --- " কবি নলিনীবালা দেবীয়ে যেতিয়া অকাল বৈধব্যর বেদনার বোজা ব'ব লগা হ'ল আরু সেয়ে নহয় - সন্তানর বিয়োগ - ব্যথাতে জর্জরিতা হবলগা হ'ল, তেতিয়াই কবি হ'ল যুগ যুগান্তরর জন্ম আ জন্মান্তরর রহস্য সন্ধান ব্রতী। কবিয়ে শান্তি বিচারিয়েই যেন আশ্রয় ললে উপনিষদর মাজত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথর কাব্য 'অর্ঘর' মাজতো যেন করিয়ে সান্ত্বনার বাণী বিচারি পালে"।[৫৩] সত্যই এই শোকসন্তপ্তা মহিলা কবি পরম সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত কাব্য সমূহের মধ্যে।

পূর্বেই বলেছি, নলিনীবালা দেবী 'পুতলী' নামে একটি শোক-গীতি রচনা করেন ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর বন্ধু-কন্যার মৃত্যুতে বিহ্বল হয়ে গদ্যে 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' লেখেন ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর মামাতো বোনের মৃত্যুতে রচনা করেন 'ছিন্নমুকুল' কবিতা। নলিনী বালার 'পুতলী' তাঁর অনেক পরের রচনা। হতে পারে উক্ত রচনাগুলি থেকে নলিনীবালা অনুপ্রেরণা পেয়েছেন 'পুতলী' লিখতে। পুতলী কবি কন্যা। তার অকাল মৃত্যুতে কবিচিত্ত খুব ব্যথিত হয়। সেই ব্যথা সেই মর্ম বেদনারি বাঙ্ময়রূপ 'পুতলী'। 'সন্ধিয়ার সুর' ব্যতীত কবির আরও তিনটি কাব্য আছে। সেগুলি হ'ল 'সপোনর সুর' (১৯৪৩), 'পরশমণি' (১৯৫৪), 'যুগদেবতা' (১৯৫৮) ও 'অলকানন্দা'। এই কটি কাব্য আমাদের আলোচ্য কালসীমার বাইরে। তবু 'অলকানন্দায়' রবীন্দ্র-নজরুলের প্রভাব এত সুপ্রকট যে তা উপেক্ষা করা চলেনা। 'অলকানন্দা'র কবিতাগুলিতে কবির শুচি শুভ্র সাত্ত্বিক মনের পরিচয় পাওয়া যায় - যা রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই কাব্যের ৪২ সংখ্যক কবিতাটির নাম 'রবীন্দ্র বর্ণনা'। তাতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রের উদ্দেশ্যে কবি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথেরই কথা তাঁর কবিতায় গ্রহণ করে তিনি যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করেছেন -

হে ঋষি । হে অমর কবি
ভারতের গগনের, উদিত ভাস্কর তুমি
তোমার কীর্তিচেয়ে তুমি যে মহান
তোমার বীণার সুরে অম্লান সুরভি ভরে
রণিত ধ্বণিত ধ্বনিত ধরা অপূর্ব সুরে মহীয়ান ।

কৌতূহলী পাঠকের এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে 'শাজাহান' কবিতার 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ' চরণটি ।

হে দরদি শুনালে প্রথমে মানব প্রাণের মর্মবাণী
মূক ম্লান মৌন জীবনের নীরসে নীরলে যত
সরি পরে রুদ্ধ চক্ষু পাণী নিপীড়িত জীবনের বাণী ।
গম্ভীর কণ্ঠের সম্বিধান । দুর্ভাগা দেশক
"যাকে তুমি করো অপমান -
অপমানে হবা তুমি সিহঁতের দরেই সমান"-
মহান তোমার অন্তরের দৃষ্টিপাত
ধূলিত দেখিলা কবি, হীন পতিতের ভগবান ।

এই অংশেও আমাদের মনে পড়বে, রবীন্দ্রনাথের 'এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা' চরণটি এবং 'অপমানিত' কবিতার 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান' এবং 'নেমেছে ধূলার তলে হীন-পতিতের ভগবান' প্রভৃতি চরণ ।

'অলকানন্দা' কাব্যে ৪৩ সংখ্যক কবিতাটির নাম 'ভ্রষ্টলগ্ন' । এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা'র 'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতার সার্থক অসমীয়া অনুবাদ বলেই মনে হবে । রবীন্দ্রনাথের 'ভ্রষ্টলগ্ন কবিতায় দেখি -

শয়ন শিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল রবে ।

অলস চরণে বসি বাতায়নে এসে
নূতন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে।
এমন সময় অরুণ ধূসর পথে
তরুণ পথিক দেখা দিল রাজ পথে।
সোনার মুকুটে পড়েছে ঊষার আলো
মুকুতার মালা গলায় সেজেছে ভালো।
শুধালো কাতরে, 'সে কোথায়, সে কোথায়'।
ব্যগ্র চরণে আমারি দুয়ারে নামি
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
নবীন পথিক; সে যে আমি, সেই আমি। ---

এবার নলিনীবালার 'ভ্রষ্ট লগ্ন' অনুধাবন করে দেখা যাক -

শিতানত জুলা নুমাই মাথোন চাকিটি
সার পালো শুনি শুয়ত কুলির মাত
খিড়িকী কাষত বহিলো অলস মনে
পিন্ধিলো কেশত নতুন মালিকা ধার
এনে সময়ত সেন্দুরী ধূলির বাটে
তরুণ পথিক দেখা দিলে রাজপথে
সোনে মুকুটত ঊষার পোহর পরি
কণ্ঠ শুনাই মুকুতার মালা ধারি
সুধিলে ব্যাকুলে - ক'ত ক'ত ?
লাজত মরি মরহি নোয়ারিল কব মই
তরুণ পথিক - সেয়ে মই, সেয়ে মই। ...

উভয় কবিতার শিরোনাম ভাব ভাষা ও ছন্দের আশ্চর্য সাদৃশ্য কারো দৃষ্টি এড়াবে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের মর্ত প্রীতির সুরই ফুটে উঠে যখন নলিনীবালা দেবী বলেন --

যে শাওঁ বিচারি স্থিতি শূণ্যর রাজত
সুখে দুখে বাস করা ধূলীয়া ধরার
মাটির মরমে টানে --
আর্থো খনে খনে ঘুরি বিচারি মরম। ... ('এটি দীঘলী রাতি')

স্মরণ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিদ্বয় --

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। ('কড়ি ও কোমল', 'প্রাণ')

একই সুর শুনতে পাই যখন নলিনীবালা দেবী বলেন --

ধূলির পরশ মাগে অশান্ত আত্মাই
তোমার শুমুনী এই জিরনি কোলাত
দিয়া নব জনমর অনুপম দান। ('এটি দীঘলীয়া রাতি')

হরি প্রসাদ নেওগ মহাশয় যথার্থই বলেছেন, 'অপূরণ করমর ভার বান্ধি লৈ ঘুরি ঘুরি উভতি আহিব (খোজে)" - কবির আকুল আত্মার আকুতিত "আমার পৃথিবী তুমি বহু বরষের")রবীন্দ্রনাথ) - এই ধূলীয়া ধরনীর গোন্ধ (গন্ধ) আছে।"[৫৪]

'সন্ধানী মানব' কবিতায় নলিনীবালা যখন বলেন --

উন্মুক্ত বিপুল পথ
জীবনর লক্ষ স্পর্শমনি
অতৃপ্ত পিয়াসী মন দিগন্ত প্রসারী
সৌন্দর্য নিজরার
মূল উৎস বিচারি বিচারি
সুন্দর পিপাসী মানুহর প্রাণ
অপরূপ অসীম সন্ধানী।

তখন তাঁর এই অসীম প্রীতি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

অনেক সমালোচক বলেছেন যে নবীন চন্দ্র বরদলৈর জন্মভূমি - প্রীতি ছিল প্রধানতঃ আসাম কেন্দ্রিক। কিন্তু নলিনী বালার স্বদেশ প্রীতি আসাম তথা ভারতের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে বিস্তৃত।[৫৫] এই ভারত-চেতনার পশ্চাতে রবীন্দ্রকাব্যের প্রেরণা থাকা অস্বাভাবিক নয়। তখন তাঁর এই জন্মভূপ্রীতি রবীন্দ্র নাথকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নলিনীবালার 'ভারতবাণী' কবিতার এই পংক্তি কয়টি --

সেই দিনা পৃথিবীর প্রথম পুয়ার
সুরশ্মিজ্জ্বত ঊষা পোহরত
ভারতে চিঞরি কলে শুনা বিশ্ববাসী ;
তুমি অমৃতর পুত্র ; তোমার বিনাশ নাই
তুমি অমর
তোমার জীবন সত্য শাশ্বত সুন্দর। ...

স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য'র ৬০ সংখ্যক কবিতার নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়টির কথা --

একদা এ ভারতের কোন বনতলে
কে তুমি মহান প্রাণ, কী আনন্দ বিশ্বজন, বলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে — শোন বিশ্বজন,
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ,
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। ... ~~জ্যোতির্ময়~~।

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার নাম 'ভারততীর্থ'। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ভারত-প্রশস্তি গেয়েছেন। নলিনীবালার একটি কবিতার নাম 'প্রেমতীর্থ'। এই কবিতার বিষয়বস্তুও ভারত প্রশস্তি। রবীন্দ্রনাথের নানা প্রভাব 'অমকান্দা'র বহু কবিতায় বিদ্যমান।

নজরুলের উদ্দীপনাময় ভাবও নলিনীবালাকে কম অনুপ্রাণিত করেনি। নলিনীবালার 'নারী তুমি সৃষ্টি স্থিতি ~~মম~~ প্রলয় কারিনী' কবিতাটি নজরুলের 'নারী' (সর্বহারা) কবিতাটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নজরুলের 'নারী' কবিতায় আছে -

এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল
নারী দিল তাহে রূপরস মধু গন্ধ সুনির্মল।

নলিনীবালা বলেন -

অপরূপা ধরণীর রূপর জেউতি তুমি
তোমারেই সুরভিতে সুরভিতা
পৃথিবীর জীবন্ত চেতনা,
নারী। -------
তোমার রূপেতে রঞ প্রকৃতি শ্যামা ---
মধু গরশত প্রকৃতি উচলা ---

নজরুল বলেন -

দিবসে দিয়াছে শক্তি - সাহস, নিশীথে হয়েছে বধূ,
পুরুষ এসেছে মরুতৃষা লয়ে - নারী যোগায়েছে মধু।
নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুধা -------
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী।
এতদিন শুধু বিলালে অমৃত, আজ প্রয়োজন যবে
যে হাতে বিলালে অমৃত, সে হাতে কূটবিষ দিতে হবে।

অনুরূপ ভাবে নলিনীবালা বলেন --

সুধা পাত্র ওপচাই
বিশ্বকে পিওয়া সঞ্জীবনী
তোমার কল্যাণ স্পর্শে
ফুলিউঠে সংসার ফুলনি। --
বিচিত্রা মোহিনী তুমি,
এ হাতে অমৃত ভান্ড
আন হাতে কাল কূটৈ ---------

নলিনীবালার 'যুগবাণী কবির সঙ্গীত' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি -

মানুষের বেদনার আর্তস্বরে ত্রিদিব কাঁপছে
ধরনীর করুণ ক্রন্দনে আকাশ নড়িছে । ...
আজি কবি অগ্নিবীণ লোয়া
অগ্নিবরষা গীত গোয়াঁ ...
ক্রূরলোভী দানবের অত্যাচারে নিপীড়িত
মানব সমাজ জাগোয়া পুনর ; ....

এই পঙ্‌ক্তিগুলি নজরুলকে স্মরণ করিয়ে দেয় । যেমন -

অসুরে নাশিতে হউক বিষ্ণু -
চক্র মা তোর হেম কাঁকন ।
টুটি টিপে মারো অত্যাচারে মা ,
গলহার হোক নীল ফাঁসী , ... ("রক্তাম্বর ধারিনী মা" "অগ্নিবীণা")

পূর্বের উদ্ধৃতিতে দেখেছি , নলিনীবালা কবিকে 'অগ্নিবীণা' অর্থাৎ অগ্নিবীণা হাতে নিয়ে অগ্নিঝরা গীত গাইতে বলেছেন ।

কবির এই উদ্দীপনাও নজরুলকে এবং তাঁর কাব্য 'অগ্নিবীণা'কে স্মরণ করিয়ে দেয় । নজরুল এই কাব্যবীণায় অগ্নিঝরা গীতই গেয়েছেন ।

'সর্বহারা' কাব্যের 'সাম্যবাদী' কবিতায় নজরুল বলেছেন -

এই হৃদয়ই সে নীলাচল , কাশী , মথুরা , বৃন্দাবন ,
মসজিদ এই , মন্দির এই , গির্জা এই হৃদয় ,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয় ।
এই রণভূমে বাঁশীর কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা ,
এই মাঠে হ'ল মেষের রাখাল নবীরা খোদার মিতা ।
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই ।

'এইখনি শঙ্করর দেশ' কবিতায় নলিনীবালাও অনুরূপ সুরে বলেছেন -

না লাগে ভ্রমির তীর্থে তীর্থে বিচারি ঈশ্বর
নিজর হিয়াতে পাবা মহাতীর্থ চরণ কৃষ্ণর ।
হৃদয়র নিষ্ঠা প্রেমে হৃদয়ত শ্রীকৃষ্ণ জাগিব
সর্বতীর্থ সাধনার ফুল হিয়াত ফুলিব ।
সত্য নিষ্ঠা কর্তব্য পথত মহা জ্ঞান পাবা হৃদয়ত
সুন্দরর দিব্য জ্যোতি বিকাশিব তোমার মুখত ।

নলিনীবালার জীবন বেদনা-বিধুর হলেও তিনি অসম-বাণীর একজন নিরলস সাধিকা ছিলেন । তাঁর কাব্য সত্য শিব ও সুন্দর এই মৃণালত্রয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এক অলোকসামান্য মনোমুগ্ধকর শতদল ।

প্রসন্ন লাল চৌধুরী

প্রসন্ন লাল চৌধুরীর (১৯০২ - ১৯৭৭) জন্ম পলাশবাড়ি। প্রথমে তাঁর কবিতা ছিল গতানুগতিক, সহজ সার্থ ধরণের। রঘুনাথ চৌধুরীর 'জয়ন্তী' পত্রিকার সংস্পর্শে এসে প্রসন্ন লালের কবিকৃতির অগ্নিগর্ভ রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠে। অসমীয়ায় ইনি 'বিদ্রোহী কবি' বলে পরিচিত। তাঁর এই বিদ্রোহে রয়েছে জীবন যৌবনের প্রকাশ বেদনা, বঞ্চিতের জন্য সহমর্মিতা, ভাষায় রয়েছে উদ্দাম গতিবেগ। তাঁর কাব্য গ্রন্থ 'অগ্নিমন্ত্র' (১৯৫২) স্মরণ করিয়ে দেয় নজরুলের প্রসিদ্ধ কাব্য 'অগ্নিবীণা'কে। তাঁর কাব্য প্রকাশকাল হিসাবে আমাদের আলোচনার পরিধিতে না এলেও ভাবসূত্র ও রচনারীতিতে তিনি বেজবরুয়া যুগেরই অন্তর্ভুক্ত। বিদ্রোহী কবি হিসেবে প্রসন্ন লালকে বাংলা সাহিত্যের কবি নজরুলের সঙ্গে সার্থক ভাবে তুলনা করেছেন ভবানন্দ দত্ত। সত্যই উভয় কবির কবিভাবনার মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। এই ঐক্য শুধু ভাবে নয় শব্দ চয়নেও। নলিনীবালা দেবীর কবিতায়ও আমরা নজরুলের অনুরূপ প্রভাব লক্ষ্য করেছি। প্রসন্ন লাল থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলে একথা সুস্পষ্ট হবে।

১। জগতত কোনো শক্তি ধরে গঢ়া নাই
এনে লোর বেড়ি
তই তাক সবলে মুছরি লোয়ার করিব
গুরি খণ্ড খণ্ড করি। ('পছোয়ার ডাক')

২। স্বদেশর হাওয়া ফল জল খাই
আমি আশা করো থাকিব জীয়াই
কোন বিধাতার 'ফরমান' পাই
রক্ষক আহি পায়।
অযাচিতে আহি শান্তি বিলায়
ফলত পেটর নাড়ী ছিঁড়ি যায়
তিল তিলকৈ আত্মা শুকায়
মরি যায় অভিমান

মরি পচি যায় তরুণ প্রাণ ----
সেয়ে যি কনিকা বাকী থাকে বল
তাকে আশা করি সাজো সমদল
লয় জীবনর স্বাদ, করি উঠা রণনাদ
ইন কুলার জিন্দাবাদ ।
('ইনকুলার জিন্দাবাদ')

৩। বন্ধ কারার অন্ধকারত জুইলৈ করো খেল
মৃত্যু মেঘর নৃত্য সভাত পাতো জীবনর গুপ্ত মেল ।
করো জীবনর অভিযান, গাওঁ মানবর জয়গান
রক্তলোহিত পতাকা উৰাওঁ অগ্নি মন্ত্র ঘোষি
বিশ্ব বিজয়ী সত্যাগ্রহী রক্ত বীজর বংশ মই
করা নির্ঘুম বিজয় যাত্রা ।---
জ্বলাও স্বর্ণ জ্যোতির রেখা -
মরনোন্মুখ জাতিক শিখাওঁ
শত্রু বিজয়ী অমর বেশ
আনো ভাস্বর বিরাট প্রবাহ নির্মল লীলার -
শুকান বকুত ঢালোঁ অবিরল তীব্র জীবন
মদিরাসার ।

এইবার নজরুল থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি, উভয়ের ভাব ও সুর-সাদৃশ্য কতটা গভীর ও সুস্পষ্ট তা উপলব্ধি করার জন্য । দেখা যাবে, নজরুলের কবিতার প্রচণ্ড উত্তাপ কীভাবে প্রসন্নলালকে উদ্দীপ্ত করেছে ।

১। রক্তাম্বর পরমা এবার
জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেত বসন ।
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনন্ - ঝন্ ।
সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল মাগো
জ্বাল সেখা জ্বাল কাল-চিতা ,

তোমার খড়্গ রক্ত হউক
স্রষ্টার বুকে লালফিতা ।
('রক্তাম্বর ধারিনী মা', 'অগ্নিবীণা')

২। গাহি তাহাদের গান -
ধরনীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের 'ফরমান' ।
শ্রমে ধরনী নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুল ফলে --
('জীবন বন্দনা', 'সন্ধ্যা')

৩। অন্ধ কারার বন্ধ কূপে
দেবতা বাঁধা যজ্ঞ যূপে
পাষাণ স্তূপে ।
এই তো রে, তার আসার সময় ঐ রথ ঘর্ঘর -
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ॥ ('প্রলয়োল্লাস', 'অগ্নিবীণা')

'বিদ্রোহী' নজরুলের বিখ্যাত কবিতা । এই নামে প্রসন্নলালেরও কবিতা আছে । উভয় কবিই 'বিদ্রোহী' কবি বলে খ্যাত । এই বিদ্রোহ মানবতার গ্লানির বিরুদ্ধে, এই বিদ্রোহ সর্ব প্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে । প্রসন্নলালের কাব্যে 'উল্কা', 'ফরমান' প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হয় । এই সব শব্দ নজরুল কাব্যেও বহুল ব্যবহৃত ।

নজরুলের কাব্যে শক্তি পূজার কথা আছে, এটি অস্বাভাবিক কিছু নয় । কারণ শক্তিপূজায় ভারত-চেতনারই প্রতিফলন হয়েছিল । প্রসন্নলালের কাব্যেও তা পরিস্ফুট হয়েছে । প্রসন্নলাল বলেন -

কি অনোয়া পূজা দুর্গা প্রতিমার
পূর্নরূপী দেশ মাতৃকার
স্থূল রূপে মহারাষ্ট্র শক্তি অর্চনার
সেয়ে জানো দেশের নিষ্প্রভ আকাশত

বিদ্যুতের হয় বিস্ফুরণ -----
বৃত্রাসুর নাশী প্রহরণ --------
কুমারের ধনুর্বাণে গণপতি
সিদ্ধি আনে
জন উম্মদনা
শক্তিরূপে দেশের শত্রু অসুরকে নাশি
সন্তানকে জনায় সান্ত্বনা। ---

এই প্রসঙ্গে নজরুলের 'রক্তাম্বর - ধারিনী মা' ও 'আগমনী' (অগ্নিবীণা) কবিতা দু'টির কথা মুহূর্তেই মনে পড়ে যায়। আগেই বলেছি, নজরুল শক্তিরূপা দেশমাতৃকাকে সার্থকভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নজরুল বলেন -

১। টুটি টিপে মারো অত্যাচারে মা,
গলহার হোক নীল ফাঁসি,
নয়নে তোমার ধূমকেতু-জ্বালা
উঠুক সরোষে উদ্ভাসি। ('রক্তাম্বর ধারিনী মা')

২। রণ-রঙ্গিনী জগৎ মাতার দেখ্ মহারণ,
দশদিকে তাঁর দশহাতে বাজে দশ প্রহরণ।
পদতলে লুটে মহিষাসুর,
মহামাতা ঐ সিংহ-বাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে
শাশ্বত নহে দানব-শক্তি পায়ে পিষে যায় শির পশুর।
('আগমনী')

প্রসন্নলাল চৌধুরীর 'শ্রী পঞ্চমী' একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। এই কবিতাটি পড়তে পড়তে নজরুলের পূর্বোক্ত 'আগমনী' কবিতাটির কথা মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়। নজরুল এই কবিতায় যে 'আগমনী গান' গেয়েছেন, তার মূলে রয়েছে পরাধীনতার গ্লানি। এই গ্লানি কবিকে ব্যথিত করছে। উভয় কবিই চান ভারত-মাতার পরাধীনতার শৃংখল মোচন করতে। একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি নজরুল থেকে -

স্বাগতম্ ।
স্বাগতম্ ।।
মাতরম্ ।
মাতরম্ ।।
ঐ ঐ ঐ বিশ্ব কন্ঠে
বন্দনা বাণী লুন্ঠে - 'বন্দে মাতরম্'।

প্রসনুলাল বলেন -

এর আমোদর উন্মত্ততা ,
বন্দিনী তোর রাজরাণী মাতা ,
সংযত হবি
তোর নামে এই এই আহেহে ডাক ,
রণক্ষেত্রে মিলিছে বীরর জাক । ---
পূজার সজীব মন্ত্রর ধ্বনি
আলাপ কর ।
ফলিব সাধন , হব সম্পূরণ
বাণীর বর ।

নজরুলের 'আগমণী' কবিতায় কেবল দুর্গারই বর্ণনা নেই , তাঁর সখী সাথীদেরও বর্ণনা আছে । যেমন -

এসেছের সাথে উৎপলাক্ষী চপলা কুমারী কমলা ঐ ,
সরসিজ - নিভ শুভ্র বালিকা
এলো বীণাপাণি অমলা ঐ ।
এসেছে গনেশ ,
এসেছে মহেশ
বাপ্ রে বাপ্
জোর উছাস ।।
এলো সুন্দর সুর - সেনাপতি --
হিমালয় । জাগো । ওঠো আজি ---

প্রসন্নলালের সরস্বতীও একা আসেননি। সঙ্গে মরাল, বীণার বর্ণনা আছে।

বিদ্যা দায়িনী জননী আছিল,
যুক্ত মানস - মরাল ভাছিল,
বীণাতে ঐক্য তন্ত্রী বাজিল
দেবী জাগিল,
দেবতা জাগিল,
জাগিল আর্যদল --- ('শ্রী পঞ্চমী')

এখানে 'আর্যদল' অর্থে কবি সম্ভবত ভারতবাসীকেই বুঝিয়েছেন। নজরুলের 'আগমনী' কবিতায় দেবাসুর সংগ্রামের কথা রয়েছে -

ঐ অসুর- পশুর মিথ্যা দৈত্য- সেনা যত
হত আহত করে রে দেবতা সত্য।
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, মাতাল রক্ত - সুরায়,
ত্রস্ত বিধাতা,
ক্ষিপ্ত সবাই রক্ত - সুরায়।

এই দেবাসুরের যুদ্ধকথা চৌধুরীর 'শ্রী পঞ্চমী' কবিতাতেও আছে -

আজিও তো দেবাসুরে
প্রাণ প্রণে যুজ করে,
অসুরে করিছে স্বর্গ বিজয়,
সুধা পাত্রের সার কাড়ি লয়,
দেবতাই করে অসুরের ভয়
দাসত্ব বোজারয়
নত মুখে ঘোষে অসুরের জয় জয়।

'আগমনী' কবিতায় নজরুলের মানবপ্রীতি সোচ্চার। --

নাই দানব
নাই অসুর -
চাইনে সুর,
চাই মানব।---

এই মানবপ্রীতি প্রসন্নলাল চৌধুরীর 'শ্রী পঞ্চমী' কবিতাতেও বিদ্যমান।-

নর জন্মক ন করিবি অপমান
মানবাত্মা ন করিবি হীণ জ্ঞান।--

তাই তাঁকে অসমীয়া সাহিত্যের নজরুল রূপে গ্রহণ করা খুবই সঙ্গত। নজরুল-সুলভ বিদ্রোহের এই উচ্চনাদ, প্রচন্ড শক্তির এই উদ্দাম উল্লাস, উদ্দীপনাময় এই অগ্নিক্ষরা বাণী অন্য কোন অসমীয়া কবির কণ্ঠে এত প্রবল ভাবে ধ্বনিত হয়নি। অসমীয়া কবিদের উপর নজরুলের এই প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

বিনন্দ চন্দ্র বরুয়া

বিনন্দ চন্দ্র বরুয়া (১৯০৫) গৌহাটী কটন কলেজে ও কলকাতায় পড়াশুনা করে জাজী হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। শেষে সেই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হন। গদ্য পদ্য নাটক - সাহিত্যের প্রায় সর্ব রাজপথেই তিনি স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন। 'মহারাজ নর নারায়ণ', 'রাজস্থান' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে অসম সাহিত্য সভার দ্বারা পুরস্কৃত হন। তিনি একবার অসম সাহিত্য সভার সভাপতিও হয়েছিলেন। এই সম্মান আসামের মানুষের কাছে সর্বোচ্চ সম্মান বলে স্বীকৃত। 'অসম ছাত্র সম্মিলনের' উৎসাহী সভ্য বিনন্দ বরুয়া দেশের যুবকদের দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে। এই আহ্বানের মধ্যে শক্তি সাধনার কথা আছে, যা নজরুলের কাব্যের প্রধান সুর।

বরুয়ার কবিতা থেকে একটি উৎধৃতি দিচ্ছি -

আহাহে যুবক শক্তি সাধক, তোমার লগত সকলো জাগক
যত বীর চমকি উঠক উন্নত করি শির ।
লোয়াহে তুলি হাতত তোমার জন্মভূমির পূজার সম্ভার
জোরেয়া তার ভগ্ন বীণার করমী সন্ন্যাসী বীর ।
এই যে তোমার কর্ম সাগর এরিব নাগিব এলাহ ভাগব
দেখাব লাগিব শক্তি নিজর, তুমি যে কর্ম বীর । ---
যুবক তুমিতো নহয় ক্ষুদ্র সকলোটি মাথোঁ অমৃত পুত্র
জোরেয়া পুনর মঙ্গল সূত্র মাতৃ পূজক বীর । ---

এই কবিতাংশের 'উন্নত' 'শির' নজরুলকে আর 'অমৃত পুত্র' রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দেয় ।

বিনন্দ বরুয়ার কবিতা পাঠে নজরুলের কথা মনে পড়ে, যদিও নজরুলের প্রভাব ততখানি তাঁর ওপর পড়েনি যতটা পড়েছে প্রসন্নলাল চৌধুরীর উপর ।

বিনন্দ বরুয়া, উমেশ চৌধারী ও প্রসন্নলাল চৌধুরীর কবিতায় গভীর অসমীয়া প্রীতি তথা দেশপ্রেম ও আর্য সভ্যতার প্রেরণা দৃষ্ট হয় । সমসাময়িক বঙ্গ সাহিত্যেও তখন উক্ত প্রেরণা সক্রিয় ছিল । এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্র লাল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল, অতুল প্রসাদ সেন প্রভৃতির নাম স্মরণ করা যেতে পারে । বিনন্দ বরুয়া, উমেশ চৌধারী, প্রসন্নলাল চৌধুরী বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবকদের কাব্য সৃষ্টির সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত ছিলেন । সুতরাং তাঁদের কবি মানস গঠনে যে বঙ্গ সাহিত্য যথেষ্ট পরিমানে প্রেরণা যুগিয়েছে, তা স্বীকার করতেই হয় ।

--------)--------

আলোচিত কবিগণ

নাম		পৃষ্ঠা
লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া	—	৪৪
চন্দ্রকুমার আগরালা	—	৫৭
মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজারিকা	—	৬১
পদ্মনাথ গোহাঞি বড়ুয়া	—	৬৪
হেমচন্দ্রগোস্বামী	—	৭০
আনন্দ চন্দ্র আগরালা	—	৭৫
চন্দ্রধর বড়ুয়া	—	৭৮
নবীন চন্দ্র বরদলৈ	—	৮২
হিতেশ্বর বরবরুয়া	—	৮৪
রঘুনাথ চৌধুরী	—	৯০
অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী	—	৯৬
ভৈরব চন্দ্র খাটনীয়ার	—	১০৩
সূর্য কুমার ভূঞা	—	১০৬
রত্নকান্ত বরকাকতি	—	১০৮
নলিনীবালা দেবী	—	১২০
প্রসন্নলাল চৌধুরী	—	১৩০
বিনন্দ চন্দ্র বরুয়া	—	১৩৬

- সূত্র নির্দেশ -

১। অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা -

ড: মহেশ্বর নেওগ, পৃ: ২৬৪ ।

২। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য -

ড: মহেশ্বর নেওগ, পৃ: ৮৩ ।

৩। নবীন চন্দ্রর কবিকৃতি -

ড: সুবোধ রঞ্জন রায়, পৃ: ২৮ ।

৪। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য -

ড: মহেশ্বর নেওগ, পৃ: ৮৩ ।

৫। - ঐ - - ঐ - পৃ: ২০ - ২১।

৬। সাহিত্য জীবন - অতুল চন্দ্র বরুয়া, পৃ: ১৭ ।

৭। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য -

ড: মহেশ্বর নেওগ, ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা: উদ্ধৃত ।

৮। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য -

ড: মহেশ্বর নেওগ, পৃ: ৮১ ।

৯। অসমীয়া কবিতার কাহিনী -

ভবানন্দ দত্ত, পৃ ৫৪ ।

১০। অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা - পৃ ২১৪ - ২১৬ ।

১১। অসমীয়া সাহিত্যত দৃষ্টিপাত -

শ্রী হেমন্ত কুমার শর্মা, পৃ: ২০২ ।

১২। অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা -

ড: মহেশ্বর নেওগ, পৃ: ২৭১ ।

১৩। সাহিত্য জীবন - অতুল চন্দ্র বরুয়া, পৃ: ১১ ।

১৪। - ঐ - - ঐ -

১৫। অসমীয়া সাহিত্যর ৰূপৰেখা -

ড: মহেশ্বৰ নেওগ, পৃ: ২৭২।

১৬। 'বেণী সংহার' - ভট্ট নারায়ণ, ৩য় ও ৫ম অংক।

১৭। সফিজুদ্দিন আহামেদ হাজারিকা রচনাবলী -

আবদুস সাত্তার সম্পাদিত, ১৯৭০, পৃ: ১৪৮।

১৮। শিব সাগর ছাত্র সভার সভাপতির অভিভাষণ, ১৪.১০.১৯২৮।

১৯। অসমীয়া সাহিত্য - ড: সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৬০।

২০। অসমীয়া নাট্য সাহিত্য - ড: সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা, পৃ: ১০১।

২১। - ঐ - - ঐ -

২২। অসমীয়া সাহিত্য - ড: সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৬১।

২৩। চন্দ্র প্রসাদ শইকীয়া সম্পাদিত 'পদ্ম নাথ গোহাঞি বরুয়া'র ভূমিকা,
পৃ: X ৩৬।

'অসমীয়া সাহিত্যত দৃষ্টিপাত'- শ্রী হেমন্ত কুমার শর্মা, পৃ: ২০২।

২৪। চন্দ্র প্রসাদ শইকীয়া সম্পাদিত 'পদ্ম নাথ গোহাঞি বরুয়া'র অন্তর্গত
নবকান্ত বরুয়া রচিত 'জীবন - প্রসঙ্গ আলেখ্য'।

২৫। 'ভূমিকা', 'গোহাঞি বরুয়া রচনাবলী' -

ড: মহেশ্বর নেওগ।

২৬। চন্দ্র প্রসাদ শইকীয়া সম্পাদিত 'পদ্ম নাথ গোহাঞি বরুয়া'র অন্তর্গত
নবকান্ত বরুয়া রচিত 'জীবন - আলেখ্য'। ভূমিকা।

২৭। - ঐ - পৃ: ১৬৪।

২৮। - ঐ - পৃ: ৮।

২৯। অসমীয়া সাহিত্যর ৰূপৰেখা -

ড: মহেশ্বর নেওগ, পৃ: ২৭২।

৩০। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য -

ড: মহেশ্বর নেওগ, পৃ: ৮৩।

৩১। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য -

ড: মহেশ্বর নেওগ, পৃ: ৮৩।

৩২। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যর জিলিঙনি -

ড: শ্রীহরি চন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ: ২৫৮।

৩৩। অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা -

ড: মহেশ্বর নেওগ, পৃ: ২৭৫।

৩৪। অসমীয়া নাট্য সাহিত্য -

ড: সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা, পৃ: ১৪৪।

৩৫। নগেন শইকীয়া সম্পাদিত 'হিতেশ্বর বৰুৱা বরবরুয়া স্মৃতিযাল্ত', পৃ: ১৩।

৩৬। 'পাতনি' 'মালচ আরু চকুলো' -

ড: মহেশ্বর নেওগ।

৩৭। নগেণ শইকীয়া সম্পাদত 'হিতেশ্বর বরবরুয়া স্মৃতিযাল্ত', পৃ: ৮১।

৩৮। -ঐ- -ঐ পৃ: ১২০।

৩৯। অসমীয়া কবিতার কাহিনী - ভবানন্দ দত্ত, পৃ: ১৭।

৪০। 'দহি-কতবার' ভূমিকা - ড: বাণীকান্ত কাকতি।

৪১। 'তুমি', 'দ্বিতীয় সংস্করণর কথা'।

৪২। 'তুমি', পাতনি - ড: বাণীকান্ত কাকতি।

৪৩। বাঁহী, নবম বছর, ৭ম - ৮ম সংখ্যা, কাতি-আঘোণ, ১৮৪০ শক।

৪৪। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য - ড: মহেশ্বর নেওগ, পৃ: ৮০।

৪৫। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য - ড: মহেশ্বর নেওগ, পৃ: ৭৯।

৪৬। 'শেয়ালি' কাব্যের 'পরিক্রমা' - মহেশ্বর শর্মা।

৪৭। সাহিত্য জীবন - অতুল চন্দ্র বরুয়া, পৃ: ৯৮ - ৯৯।

৪৮। -ঐ- -ঐ- পৃ: ৯৮।

৪৯। 'শেয়ালি' কাব্যের 'পরিক্রমা' - যজ্ঞেশ্বর শর্মা।

৫০। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য - ডঃ মহেশ্বর নেওগ, পৃঃ ৭৭।

৫১। সাহিত্য জীবন - অতুল চন্দ্র বরুয়া, পৃঃ ১৪।

৫২। অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা - পৃঃ ১৯২ / ডঃ মহেশ্বর নেওগ - পৃঃ ২৯২।

৫৩। 'অলকা নন্দা'র 'আগ কথা' - হরিপ্রসাদ নেওগ।

৫৪। -ঐ- -ঐ-

৫৫। অসমীয়া কাব্য সাহিত্য আরু জাতীয় জীবনত
প্রগতি বাদী চিন্তা (১) - দীনেশ্বর ভট্টাচার্য পৃঃ ১৪৫-৪৬।

৫৬। অসমীয়া কবিতার কাহিনী -
ভবানন্দ দত্ত, পৃঃ ৫৪।

(খ) নাটক

ইংরাজী XXXX ১৮৬০ থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে যাত্রাভিনয়ের বহুল প্রচলন ছিল। এই যাত্রায় যেসব নাটক অভিনীত হত তা ছিল বাংলা নাটক। যেমন - 'রাধার মানভঞ্জন'। ১৮৭৫ সালে গোপাল নামে জনৈক বাঙালী নাট্যকুশল ও সঙ্গীতজ্ঞ কামাখ্যায় আসেন। সকলে তাঁকে গোপাল ওস্তাদ বলত। এই ওস্তাদের তত্ত্বাবধানে বাংলা 'জয়দ্রথ বধ' নাটকটি অভিনীত হয়। এতে অসমীয়া নাট্যোৎসাহী গৌরী প্রসাদ শর্মা, উমাকান্ত শর্মা, রাজকৃষ্ণ শর্মা লক্ষ্মীনাথ শর্মা X প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন। এই ওস্তাদের তত্ত্বাবধানে আরও একটি বাংলা নাটক অভিনীত হয়েছিল, নাম 'অভিমন্যু বধ'। এতে অংশ গ্রহণ করেন যাদবানন্দ অধিকারী, যোগেশ্বর শর্মা, জীবননাথ শর্মা, দুর্গাচরণ প্রভৃতি। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই ওস্তাদের মৃত্যু হয় অগ্নিদগ্ধ হয়ে। তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতা থেকে একজন শিল্পী আনা হল, নাম বরদা প্রসন্ন মজুমদার। তাঁর XXX বাসস্থান ছিল ২২, হ্যারিসন রোড, কলকাতা। ১৯০৩ সালে তিনি কামাখ্যায় 'পট' 'কোম পট' সংযুক্ত একটি অভিনব রঙ্গমঞ্চ নির্মান করেন। এটিই এখানকার প্রথম রঙ্গমঞ্চ। আসামের রূপদক্ষ শিল্পী জীবেশ্বর শর্মা কলকাতা স্টার থিয়েটারে ভর্তি হন ও নিয়মিত ভাবে অভিনয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্টার থিয়েটারে তিনি মাঝে মাঝে কোনো কোনো ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন, এবং অভিনয়ে সুখ্যাতিও অর্জন করেন। আরো দু'জন কামাখ্যাবাসী শিল্পী স্টার থিয়েটারে অভিনয় শিক্ষা করে নাট্যকলায় পরিদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। তাঁরা হলেন লক্ষ্মীকান্ত শর্মা অলংকদার ও মহীপতি শর্মা। প্রথম বছর এঁরা বাংলা নাটকের অভিনয় করেন। কখনো X দৃশ্যপট সজ্জা বাদ দিয়ে, কখনো বা ওইসব উপকরণ সহযোগে নাট্যাভিনয় করেন। প্রথম ধরণের অভিনয়ই শেষে থিয়েটার নামে অভিহিত হয়। এইভাবে কামরূপের কামাখ্যা-ধামে আসামের প্রথম রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয় এবং নাট্যাভিনয়ের যথার্থ সূচনা হয়।

১৮৭০ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে ডিব্রুগড়ে বহু বহিরাগতের আগমন ঘটে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দু'টি বাঙালী বসতি হল 'থিয়েটার-পাড়া' ও 'মাস্টারপাড়া' নামে অভিহিত হল। এই দু'টি নাম থেকে অনুমান করা যায় একটি পাড়ায়

থিয়েটার পার্টি ছিল, অন্যটিতে ছিলেন অভিনয় শিক্ষক। উক্ত নাম দু'টি এখনো লোকমুখে প্রচলিত আছে। সুনামধন্য মণিরাম দেওয়ানের বংশের ভবকান্ত বরুয়া প্রমুখ ব্যক্তি ডিব্রুগড়ে কলকাতার মত থিয়েটার গৃহ নির্মাণে সচেষ্ট হন। ১৮৭২ সালে দুর্গা পূজার সময় এখানে প্রথম থিয়েটার গৃহ তৈরী হয়। অভিনয় হয় 'প্রহ্লাদ চরিত', লেখক অজ্ঞাত। অসমীয়া এবং উভয়ে এতে সমান সহযোগ করেন। ভবকান্ত বরুয়া ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদক। বহুদূর থেকে নাট্যামোদীরা দল বেঁধে এই নাটক দেখতে আসেন। অন্য স্থান থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে রায় বাহাদুর গুণাভিরাম বরুয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইভাবে ডিব্রুগড়ে উৎসাহী অসমীয়াদের সহযোগে প্রথম বাঙালী অবৈতনিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

আসামে অনেক চা বাগান আছে। এইসব চা-বাগানে বহু বহিরাগত কাজ করতেন। চা-বাগানে প্রতি বছর ধুমধাম করে দূর্গাপূজা হত। সেই সময় নিকটবর্তী বাংলা দেশ থেকে যাত্রাদল ও থিয়েটার পার্টি আনানো হত। সুদূর অতীতকাল থেকেই গৌহাটী নিবাসী অসমীয়া জনগণ বাঙালীদের সঙ্গে মিলে মিশে দুর্গাপূজা করতেন। তখন এখানে থিয়েটার হত। এতে উভয় ভাষাভাষীই অংশ গ্রহণ করতেন। অবশ্য থিয়েটার কখনো কেবল অসমীয়া শিল্পীরা কখনো শুধু বাঙালী শিল্পীরা স্বতন্ত্রভাবেও করতেন। ১৮৯৫ সালে এই দুই পক্ষেরই মধ্যে মনোমালিন্য হয়, ফলে প্রতি পক্ষ একটি করে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

সেই সময় পানবাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ব্রহ্মপুত্রের পারে জাহাজ কোম্পানীর একটি গুদাম ঘর ছিল। এখানে মাঝে মাঝে বাঙালীরা অভিনয় করতেন। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বাঙালী গৌহাটীর কমিশনার সাহেব ও জাহাজ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে সেই গুদাম ঘরে অভিনয়ের অনুমতির জন্য আবেদন জানালেন। কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলেন। ১৮৯৫ সালে এই গুদাম ঘর 'আর্য নাট হল' নামে আত্মপ্রকাশ করল। শুভ্রেন্দু মোহন গোস্বামী নামে জনৈক বাঙালী ভদ্রলোক উক্ত প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন।

এটি আসামের অন্যতম অবৈতনিক রঙ্গমঞ্চ ।[১] ১৮৫৭ সাল থেকে কলকাতায় মঞ্চ আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠে । ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় বেলগাছিয়াতে মঞ্চ স্থাপিত হয় । এই মঞ্চের জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য রীতিতে 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) নাটক রচনা করেন । গ্রীক কাহিনী নিয়ে রচনা করেন 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) নাটক । এই নাটকে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম প্রয়োগ করেন । রাজস্থানের ইতিহাস - আশ্রিত কাহিনী নিয়ে রচনা করেন বিয়োগান্ত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক (১৮৬১)। এতে পাশ্চাত্য নাটকীয় গঠন রীতি সম্পূর্ণ রূপে নাট্যকার গ্রহণ করেন । ক্রমে-ক্রমে কলকাতায় আরো মঞ্চ স্থাপিত হল , আত্মপ্রকাশ করতে লাগলেন নব নব নাট্যকার । ১৮৭২ সালে কলকাতায় সাধারণ নাট্যশালা ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হল । প্রতিষ্ঠিত হল আরো দু'টি বিরাট নাট্য প্রতিষ্ঠান - বেঙ্গল থিয়েটার ও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার । গিরিশচন্দ্র ঘোষের মত প্রতিভাশালী অভিনেতা মঞ্চে প্রবেশ করলেন । এইভাবে কলকাতা হয়ে উঠল উচ্চাঙ্গ নাট্য চর্চার একটি বৃহৎ কেন্দ্র ।জন্ম হল স্টার , মিনার্ভা দি মঞ্চের । বিহার উড়িষ্যা আসামের বাঙালীদের আমন্ত্রণে কলকাতার দল বাইরে এসেও অভিনয় করতে লাগলেন । এইসব দলের অভিনয় প্রদর্শিত হল ধুবরী , গৌহাটী, মণিপুর ইত্যাদি অঞ্চলে । আসামে নাট্যানুরাগ সৃষ্টিতে এইসব কলকাতার যাত্রা ও থিয়েটার পার্টির দান কম নয় । বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বহু বাংলা নাটক অনুবাদ করে অভিনীত হয় আসামে , যেমন - দেবলাদেবী , চন্দ্রগুপ্ত , নুরজাহান , কর্ণার্জুন , উমা , সীতা , মেবারপতন , কালাপাহাড় প্রভৃতি । জনৈক ব্রজনাথ শর্মা ১৯৩৩ সালে তাঁর যাত্রাদলে অভিনেত্রীরূপে তিন জন মেয়েকে ভর্তি করে নেন । অবশ্য নাচ গানের জন্য দু'টি মেয়ে ইতিপূর্বেই তিনি নিয়েছিলেন । এলিজাবেথীয় যুগেও ইংলণ্ডে নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হত প্রিয়দর্শন বালকগণ । রেস্টোরেশন যুগেই (১৬৬০) প্রথম নারীর ভূমিকায় নারী অবতীর্ণ হয় । বাংলা নাটকে প্রথমে যে নারীরা অংশ গ্রহণ করতেন তাঁদের অনেকেরই সামাজিক মর্যাদা ছিল না । স্মরণীয় ,

গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সুদক্ষ অভিনয় শিক্ষার গুণে পরবর্তীকালে অনেক দেহ পসারিনীই সুঅভিনেত্রী রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। পূর্বে বলা হয়েছে, বিখ্যাত অসমীয়া পত্রিকা 'জোনাকী' কলকাতার ২ নং ভবানী চরণ দত্ত লেন থেকে প্রকাশিত হত। এই লেনস্থিত অসমীয়া ছাত্রগণ শেক্সপীয়রের 'কমেডি অব্ এররস্' - এর অনুবাদ 'ভ্রমরঙ্গ' (১৮৮৮) অভিনয় করেন। ড: মহেশ্বর নেওগ বলেছেন - আধুনিক অসমীয়া নাটক পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাবে গড়ে উঠে। বিষয়বস্তু গ্রহণের বিষয়ে নাট্যকারগণ স্বকীয় বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু নাটক গঠনে অংক ও গর্ভাংক বা দৃশ্য বিভাগ পশ্চিমের আদর্শে করা হয়েছিল। এই পাশ্চাত্য বা ইংরেজী প্রভাব অবশ্য ইংলন্ড থেকে সরাসরি আসেনি। এই বিষয়ে সর্বই বঙ্গই বিশেষ করে কলকাতাই প্রথম থেকে নাট্যকারদের প্রভাবান্বিত করেছিল।[২] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলা নাটকের প্রতি অসমীয়া জনগণের মোহ প্রবল ছিল। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'নোমল' (১৯১৩), নাটকের তৃতীয় দৃশ্য 'আঠিয়াবারীর' সত্রাধিকার প্রভু বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর নাটকের বিষয়ে কেমন গর্বপ্রকাশ করেছেন তার নমুনা দেওয়া হল।-

গোসাঁই - মোয়ো রচনা করা বঙলা নাটখন (নাটকটি) কালি (কাল) শেষ হল।

মুহিবায়ন - অধিকার ঈশ্বরর তিথিও ওচর (নিকট) চাপি আহিছে।
অওনাটৈ এতিয়ার পরা আখরা দিলেহে হব।

গোসাঁই - এরা কালির পরা সকলো ঠিক করি আখরা দিবলৈ লগাই দিয়া,
বঙলা নাট(নাটক), অলপ আগরে পরা ধরিলেহে সকলোর ভালকৈ
মুখস্ত আহিব, আরু উচ্চারণ শুধ (শুদ্ধ) হব।

কেহোঁ - হয় প্রভু জগন্নাথ, বঙলা নাটর বর তেজ। অজকীয়া নাটর
নিচিনা আরু সিমের মেরীয়া না হয়।

গোসাঁই - এরা মাধব দেবে করা অসমীয়া 'দধিমথন' আরু আমার এই বঙলা 'দধিমন্থন' এই দুখন মিলালেই বুজিব পারিবা । মোর নাটর পরা (থেকে) কালি নতুন কৈ রচনা করা গীত এটার মুরর এ ফাঁকি গাওঁ শুনা , পিছর কেই ফাঁকি (পদ) মনত নাই -

আরে নন্দ আইল , নন্দ আইল
নন্দ আইল হুয়া ।
আরে দুজন লোক দাঁড়ায়ে আছে
থামুকি নে থায় গুয়া ।

কেহোঁ - কি সুন্দর , কি সুন্দর , রচনার কি তেজ , এই বাবেই আরু বেলি প্রভু জগন্নাথে করা বঙলা "সীতা স্বয়ংবর" ভাওনাত মানুহে নামঘর ন ধরা হৈ পরিছিল , আরু মহাপুরুষীয়া অংকীয়া "সীতা স্বয়ংবর" ভাওনাত তেনে মানুহ হোয়া ক'ত (কোথায়) দেখিছে ।

বিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধের কোনো কোনো অসমীয়া নাটকে বাংলা নাটকের প্রভাব সুস্পষ্ট । যেমন - চন্দ্রধর বরুয়ার 'মেঘনাদ বধ' (১৯০৪) ও 'তিলোত্তমা সম্ভব' (১৯২৯), ভরতচন্দ্র দাসের 'স্যমন্ত হরণ' ইত্যাদি ।

বেজবরুয়া যুগে অসমীয়া নাট্য সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল একাধিক শক্তিমান নাট্যকারের সাধনায় । এই সমৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল ইংরেজী নাট্য সাহিত্যের সাথে বাংলা নাট্য সাহিত্য । বিষয় , ভাষা , সংলাপ, আঙ্গিক পদ্ধতি, চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতিতে প্রখ্যাত বাঙালী নাট্যকার গিরিশচন্দ্র , বিশেষ করে দ্বিজেন্দ্র লালের প্রভাব যে অসমীয়া নাটকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং ব্যাপক তা অসমীয়া পণ্ডিতগণও স্বীকার করেছেন । ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মার মতে "The historical melodramas by Dwijendra Lal Roy of Bengal are also partly responsible for the growth and development of the Chronicle plays in Assamese."[3]

অবশ্য এই প্রসঙ্গে সেক্সপীয়রীয় নাটকের প্রভাবের কথাও ভুললে চলবেনা, যার দ্বারা দ্বিজেন্দ্র লাল নিজেও প্রভাবিত হয়েছিলেন। যা হোক, বাংলা নাটকের প্রভাবের ছায়ায় অসমীয়া নাটক মোটেই আচ্ছন্ন হয়নি, বরং নাটাকারদের স্বকীয় সৃষ্টিক্ষমতা তাতে আরো উজ্জ্বল ও বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছে।

গুণাভিরাম বরুয়া

নাট্যকার গুণাভিরাম বরুয়া (১৮৩৪ - ৯৪) উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলকাতা যান। সেখানে বিধবা বিবাহের প্রবর্তক ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হন এবং তাঁর সান্নিধ্যে আসেন। সুকিয়া ষ্ট্রীটে প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। সুতরাং বিধবা রমণীর পুনর্বিবাহের যৌক্তিকতা ও উপযোগিতা তিনি আন্তরিক ভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। পরবর্তী কালে প্রথমা পত্নী বিয়োগের পর তিনি ১৮৭২ সালে জনৈকা বিধবা মহিলাকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও চেষ্টায় হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ বিধিবদ্ধ হয়। সেই বৎসরই উমেশচন্দ্র মিত্র বিধবা বিবাহ সমর্থন করে বাংলায় বিষাদান্ত 'বিধবা বিবাহ নাটক' রচনা করেন। যুবতী বিধবাদের বিবাহ না দিয়ে গৃহে রাখলে গুরুতর নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা থেকে যায় - এই কথাই বলা হয়েছে, উমেশ চন্দ্রের নাটকে। নাট্যকার এই নাটকের ভিতর দিয়ে নির্মম সমাজ দুর্গের একটি অবরুদ্ধ অর্গল খুলে দিয়েছেন গভীর সহানুভূতিশীল দৃষ্টি নিয়ে। নাটকে বালবিধবা সুলোচনা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে লোকলজ্জা এড়াবার উদ্দেশ্য বিষ পানে আত্মহত্যা করেছিল এবং নায়ক মন্মথ শোকে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল - এ যেমন বেদনা দায়ক বিষয়, তেমনি নাটকে অপর এক বিধবা প্রসন্নকে পুনর্বার বিবাহ দিয়ে বিধবা বিবাহের উপযোগিতাও দেখানো হয়েছে। নানা দিক বিচারে এটি বাংলা নাট্য সাহিত্যের আদিপর্বে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নাটক।[8] উমেশচন্দ্রের এই নাটকের সূত্রধরে ঐ বছরই বাংলায় রচিত হয় আরও দু'টি নাটক - রাধা মাধব মিত্রের "বিধবা মনোরঞ্জন নাটক" এবং উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের

"বিধবা পরিণয়োৎসব নাটক" । গুণাভিরাম বরুয়া এইসব নাটক, বিশেষ করে উমেশ চন্দ্র মিত্রর 'বিধবা বিবাহ নাটকে'র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয়। ১৮৫৭ সালেই তিনি রচনা করলেন তাঁর উল্লেখ যোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি "'রামনবমী নাটক", যা অসমীয়া ভাষায় রচিত প্রথম সামাজিক নাটকের মর্যাদা লাভ করেছে। ১৮৫৭ সালে এই নাটকটি 'অরুণোদই' পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় ১৮৭০ সালে। এই মুদ্রিত নাটকের কোনো কপি আসামের কোনোখানে নেই নেই। বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত একটি কপির ডঃ সূর্যকুমার ভূঞা কৃত অনুলিপি গৌহাটীর ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিভাগে রয়েছে। 'রামনবমী নাটকে'র প্রায় সকল আলোচকই উক্ত অনুলিপিটি অবলম্বন করেছেন মনে হয়, যদিও ডঃ হরিচন্দ্র ভট্টাচার্য জানিয়েছেন - " কিতাপ আকারত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দত ছপা হোৱা নাটখন হে আমার আলোচনার মূল।"[৫] সৌভাগ্য বশতঃ গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য মহাশয় কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিদ্যাসাগর সংগ্রহে রক্ষিত ১৮৭০ সালে মুদ্রিত 'রামনবমী নাটকে'র একটি কপি অবলম্বন করে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে তার একটি সুসম্পাদিত মূল্যবান সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। এতে নাট্যকার গুণাভিরাম বরুয়ার জীবনী, সাহিত্যকৃতি, 'রামনবমী নাটক' সম্পর্কে বহুবিধ মূল্যবান তথ্য ও বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় আমাদের বক্ষ্যমান আলোচনায় আমরা অধ্যাপক ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত নাটকটিরই সহায়তা নিয়েছি বিশেষ ভাবে। উদ্ধৃত নাট্য-সংলাপ সমূহ অধ্যাপক ভট্টাচার্যের সংস্করণ থেকেই গৃহীত।[৬]

'রাম নবমী নাটক' রচনার (১৮৫৭) এক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত উমেশচন্দ্র মিত্রর বাংলা নাটক 'বিধবা বিবাহ নাটক'কেই গুনাভিরাম আদর্শ করেছিলেন মনে হয়। 'রামনবমী নাটকে'র নায়িকা নবমী এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের বিধবা তরুণী। নায়ক রামচন্দ্রের সঙ্গে বিধবা 'নবমী'র গোপন প্রণয় ঘটে, ফলে নবমী অন্তঃসত্ত্বা হয়। তার জন্যে নবমীকে সমাজের হাতে লাঞ্ছিতা হতে হলো।

অবশেষে নায়ক - নায়িকা উভয়েই আত্মহত্যা করে সমাজের নির্মম শাসনের দায় থেকে মুক্তি পেলো। মৃত্যুকালে নবমীর উক্তি - "যি দেশত এনে দেশাচার আত যেন মানুহ জন্ম ন ধরে। জন্ম হলেও যেন তিরোতা ন হয়"; এবং রামচন্দ্রের অন্তিম উক্তি - "হে ধর্ম্ম। তুমি সাক্ষী। এই দারুণ দেশাচারর শাসনত এনে হল।" নায়ক - নায়িকার আত্মহত্যায় অনুতপ্ত মহাজনের খেদোক্তি - "মেয়ে ইহঁতর বধর ভাগি হলোঁ। প্রভো। মোক দোষ ন ধরিবা। মেনে দেশাচার তেনে করিছোঁ।" (ভট্টাচার্য সং - ৬৭, ৭০, ৭২ পৃঃ)। উক্তিত্রয় নাট্যকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে। একথা আরও স্পষ্ট করে বলেছেন অধ্যক্ষ তীর্থনাথ শর্মা মহাশয় - "পুস্তত প্রেম অসন্তোষর কারণ, সেইটো নো হোৱা হে মঙ্গল, তার নাশ হওক বুলিহে বিধবার বিবাহ হব লাগে - নবমী, রামচন্দ্র আরু তেওঁলোক দুয়োরে মিলন দুটী জমুন্তীর আত্মহত্যারে নাট্যকারে যেন এই অসুখ অসন্তোষর পরাকাষ্ঠা দেখুৱাই তার প্রতীকার রূপে বিধবা বিবাহ প্রচলনর ঔচিত্য প্রতিপন্ন করিব খুজিছে।" (অধ্যাপক ভট্টাচার্যর সংস্করণে শ্রী শর্মা লিখিত ভূমিকা, পৃঃ ১২)। উমেশ চন্দ্র মিত্র তাঁর নায়িকা সুলোচনার প্রতি যেমন সহানুভূতিশীল, ঠিক তেমনি গুনাভিরাম বরুয়াও সহানুভূতিশীল তাঁর নায়িকা নবমীর প্রতি। উমেশচন্দ্রের নায়িকা সুলোচনার পিতা সখেদে বলেছেন যে বিধবা সুলোচনার পুনর্বিবাহ দিলে এ বিপদ ঘটে আনা।

বিধবা বিবাহের প্রবর্তক পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এই রাম নবমী নাটকের পঞ্চম অঙ্কে, প্রথমদর্শনে ফুলেশ্বরীর স্বগতোক্তিতে। (৫১ পৃঃ)। নাটকের শেষ দৃশ্যে মহাজন স্বপ্নে যে "গায়ে পিন্ধি চুটী চাপকনকৈ আদ বয়সীয়া বঙ্গালী বামুণ" কে দেখেছিল, তিনি অবশ্যই বিদ্যাসাগর। প্রগতিশীল গুণাভিরাম বিদ্যাসাগরের তিরোধানে (২৯ জুলাই, ১৮৯১) ব্যথিত হয়ে "পুরু দত্ত" ছদ্মনামে একটি শোক গাথায় লিখেছিলেন -

কান্দন্ত ভরত আই, হিয়া মোর পুরিযায়
বিদ্যাসাগরর বিয়োগত।
কিপাপে পাপিণী মই, মোহোর মরণ নাই
যাতনাহে মোর কপালত।
(ভট্টাচার্য সং, ১১ পৃঃ)

বিদ্যাসাগরের সামাজিক আন্দোলন যে তৎকালে অসমীয়া সাহিত্যিকদেরও উদ্বুদ্ধ করেছিল তার উজ্জ্বল নিদর্শন অসমীয়া সাহিত্যের এই প্রথম সামাজিক 'বিয়োগান্ত নাটক' "রামনবমী", যার আদর্শ ছিল উমেশচন্দ্র মিত্রের বাংলা বিয়োগান্ত নাটক 'বিধবা বিবাহ'।

হেমচন্দ্র বরুয়া (১৮৩৫ - ৯৬)

১৮৩৬ সাল থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত অসমীয়া ভাষা স্কুল কলেজ আদালতে প্রচলিত ছিল না। ১৮৭৪ সাল থেকে অসমীয়া ভাষা সেখানে পুনরায় প্রবর্তিত হয়। নিম্ন প্রাইমারী স্কুলে তখন পাঠ্য পুস্তক ছিল না। হেমচন্দ্র বরুয়া তখন 'আদিপাঠ' (১৮৭৩) রচনা করেন। আদি পাঠের পর তিনি আরও কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত অসমীয়া সাহিত্যের 'হেমকোষ' (১৯০০) তাঁরই অমর গ্রন্থ। স্মরণ করা যেতে পারে বঙ্গসাহিত্যে অনুরূপ ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ ১৮৭৩ সালের আগে অনেক রচিত হয়েছে। বরুয়া মহাশয় সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজীতে পারদর্শী ছিলেন। নাটক রচনায়ও তাঁর আগ্রহ ছিল। তাঁর রচিত নাটক 'কানীয়া কীর্তন' ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের আলোচনায় ডঃ হরিচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন - তিনি (বরুয়া) ইংরেজী নাটক পড়ে বা অনুকরণ করে এই নাটক রচনা করেন নাই। কারণ তিনি বিশ বছর বয়সে (১৮৬০ সালে) ইংরেজী বর্ণমালার শিক্ষা করেন লুকিয়ে লুকিয়ে। তখন ইংরেজী অধ্যয়ন ছিল ধর্মবিরোধী কর্ম। নাটকটির প্রকাশ কাল ১৮৬১ সাল।

সুতরাং রচনা কাল কিছু পূর্বে হওয়া উচিত। ১৮৫৫ সালে ইংরেজী বর্ণমালা শিখে ইংরেজী গ্রন্থের আদর্শে এই নাটক রচনা করা একেবারে অসম্ভব। সুতরাং তাঁর উপাদান সংগ্রহের উৎস বাংলা নাটক হওয়া অসম্ভব নয়।[৭] ১৮৬১ সালের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে যেসব নাটক রচিত হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তি বিলাস' (১৮৫২), তারা চরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২), রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব' (১৮৫৪), উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ '(১৮৫৬) প্রভৃতি। তবে অনুমান করা যায় আঙ্গিকের জন্য হেমচন্দ্র বরুয়া উল্লিখিত বাংলা নাটক সমূহের কাছে ঋণী, বিশেষ করে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব'র কাছে। কেননা এটি খুবই জনপ্রিয় নাটক ছিল সেই সময়ে।

প্রথমেই বরুয়ার 'কানীয়াকীর্তনের' কাহিনীটি সংক্ষেপে জানা যাক - সোনারী গ্রামের মৌজাদার ভদ্রেশ্বর বরুয়ার পুত্র কীর্তিকান্ত। একদা তাদের বাড়ীতে পদ্মপাণি নামে জনৈক গোঁসাই অতিথিরূপে এলেন। তিনি কানি অর্থাৎ আফিঙের বড় ভক্ত। এই মাদক দ্রব্যটি না পেলে মৌজাদারের ষোড়শোপচার আতিথেয় দ্রব্যেও তিনি প্রসন্ন নন। এই অতিথির প্রভাবে কীর্তিকান্তও আফিঙের ভক্ত হয়ে উঠল। কালক্রমে তাঁর পত্নী চন্দ্রপ্রভাও উক্ত মাদক দ্রব্য আসক্ত হয়ে পড়ে। পিতা ভদ্রেশ্বর বরুয়া পুত্র কীর্তিকান্তকে মৌজা পরিচালনার ভার দিলেন। আফিও - আসক্ত পুত্র কীর্তিকান্ত মৌজাদারী রক্ষা করতে পারল না। শেষে জীবিকা নির্বাহের জন্য সে অসৎ উপায় অবলম্বন করে, যার পরিণতি কারাবাস ও মৃত্যু।

এবারে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটকের কাহিনীটি সংক্ষেপে বিবৃত করি - কুলপালকের চারটি কন্যা। নাম - জাহ্নবী, শাম্ভবী, কামিনী ও কিশোরী। তাদের বয়স যথাক্রমে ৩২, ২৬, ১৪, ও ৮ বৎসর, সমযোগ্য কুলীন পাত্র না পাওয়ায় এদের বিবাহ সম্ভব হচ্ছে না। পরিশেষে ঘটক অনৃতাচার্যের প্রচেষ্টায় একটি পাত্র জুটে গেল। বয়স ষাট। 'প্রবীণ বয়স জীর্ণশীর্ণ কলেবর'। তদুপরি এই বর একাট মূর্খ, বধির, কানা,

সর্বাঙ্গে দাদের দাগ, মুখে বসন্তের চিহ্ন। যাই হোক শেষ পর্যন্ত কুলপালকের কন্যা চতুষ্টয় এই পাত্রের হাতেই অর্পিত হল।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে 'কানীয়া কীর্ত্তন'র কাহিনীর সংগে 'কুলীনকুলসর্বস্ব'র কাহিনীর কোনো সাদৃশ্য নেই। কৌলিন্যের যুপকাষ্ঠে কুলপালকের কন্যা চতুষ্টয়ের বলি হয়েছে। কীর্তিকান্তের বলি হয়েছে 'কানি' অর্থাৎ আফিঙের যুপকাষ্ঠে। 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের ফুলকুমারী একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। ফুলকুমারী বিবাহিতা যুবতী। তার পতি অর্থের জন্য তার কাছে এসে উৎপীড়ন করত। মূলকথা ফুলকুমারী স্বামীসোহাগ বঞ্চিতা। 'কানীয়া কীর্ত্তন'র কীর্তিকান্তের পত্নী চন্দ্রপ্রভাও পতি কর্তৃক নিপীড়িতা। তবে পার্থক্যও আছে। ফুলকুমারী বলতে পেরেছে, "চাঁনদিদি, এ থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।" - পতি সম্পর্কে এই জাতীয় ভাবনার অবকাশ চন্দ্রপ্রভার চরিত্রে নেই। তার কাছে পতি দেবতা। পতি দুষ্টচরিত্রের জেনেও সর্বতোভাবে সে পতি সেবা করেছে। উভয় কাহিনীর প্রাণকেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবার। উভয় কাহিনী হাস্য ও করুণ রস সম্পৃক্ত। হাস্যরসের সৃষ্টির জন্য 'কানীয়া কীর্ত্তনের' পদ্মপাণি গোঁসাই চরিত্র এবং 'কুলীনকুল সর্বস্ব' অনৃতাচার্য, উদরপরায়ণ প্রভৃতি চরিত্র স্মরণীয়। কৌলিন্য মর্যাদা, বর্ণপ্রীতি 'কানীয়া কীর্ত্তন'ও বিদ্যমান। জেলে গিয়ে কীর্তিকান্ত বলেছে - "হায় হায় মোর কি কপাল, কেনেই বরবিহ (আফিং) খাইছিলো। তাকে নো খোয়া হলে মোর এনে দশা হব কিয় --- এতিয়া মাটকত প্রাণ যায়। শূদ্রটোও অজাতিয়ে ছুবলগা হল। (শেষ দৃশ্য) এই নাটকে বাংলা গানও আছে। যেমন - দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দর্শনের "ঋতু বসন্ত কালে প্রাণনাথ কোথায় ---' গানটি।

মাদক দ্রব্যাসক্তির বিষময় ফল প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এই নাটক রচিত। রাম নারায়ণের 'কুলীন কুল সর্বস্বের সমস্যা অবশ্য আরো গভীর ও ব্যাপক। তবুও এই ধরণের সামাজিক সমস্যা নিয়ে নাটক রচনার প্রেরণা হেমচন্দ্র বরুয়া উক্ত বাংলা নাটক থেকে পেয়েছিলেন মনে হয়।

রুদ্ররাম বরদলৈ

রুদ্ররাম বরদলৈর (১৮৩৬ - ১৮৯১) 'বঙাল বঙালনী' ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয়। নায়িকা তাড়ুলী নাম্নী এক তরুণী এক পতি পরিত্যাগ করে অন্য পতি গ্রহণ করে। তার প্রত্যাখ্যাত পতিদের করুণ অবস্থা এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। নাট্যকার ন-গাঁওয়ের মানুষ। আসামের এই অঞ্চলে বহু বাঙালীর বাস ছিল, বর্তমানেও কম নয়। লেখক বাঙালীর জীবন সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তা-ই মনের মাধুরী মিশিয়ে বর্ণনা করেছেন। এই নাটকে বাঙালীর সংলাপ বাংলায় দেওয়া হয়েছে। নাটকটির অর্ধেকেরও বেশী সংলাপ বাংলায় প্রদত্ত হয়েছে। সূত্রধারের মুখে একটি বাংলা গীতও আছে। প্রতিটি অংক এই নাটকে 'দর্শনে' বিন্যস্ত নয়, বিন্যস্ত 'দৃশ্য'। তখনকার দিনে এটিই ছিল খুব স্বাভাবিক।

অসমীয়াতে 'বঙাল' শব্দের অর্থ বিদেশী। এই রাজ্যে নবাগত মুসলমানদের প্রথমে 'বঙাল' বলা হত। এই শব্দটি 'বাঙালী' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 'বঙাল বঙালনী' অর্থ বাঙালী ও বাঙালিনী। তাড়ুলী বরুয়া বংশের কন্যা। তার বিবাহ হয় সূত্রধর সম্প্রদায়ের এক অসমীয়া পাত্রের সঙ্গে। তাড়ুলী এই তরুণকে পরিত্যাগ করে ফুকন বংশের এক তরুণের সঙ্গিনী হয়। তাড়ুলীর কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে অন্য এক মাড়োয়ারী তরুণের সঙ্গ লাভ করে। এই সঙ্গও স্থায়ী হয় না। তাড়ুলী এই তরুণকে ছেড়ে রামমোহন পোদ্দার নামে জনৈক বাঙালী তরুণকে পুনরায় বিবাহ করে। কয়েক বছর চলার পরই দাম্পত্য কলহ শুরু হল। পোদ্দার তাড়ুলীর টাকা পয়সা ইত্যাদি নিয়ে চলে গেল। পরে আবার ঘুরে এসে তাড়ুলীর সঙ্গ সুখ চাইল। তাড়ুলী তাকে প্রত্যাখান করে এবং অন্য একজনকে নিয়ে ঘর সংসার করতে থাকে। রামমোহন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল। তার শবদেহ কেউ সৎকার করতে আসে না। পরে কোনো মতে তার শবদেহ কলং নদীর জলে ফেলে দিয়ে আসা হল। রামমোহন বাঙালী। তার পত্নী ছিল তাড়ুলী, সে 'বঙাল' অর্থাৎ বিদেশীকে বিবাহ করেছিল বলে 'বঙালনী' বলে আখ্যাত

হয়ে থাকতে পারে । এই অর্থেও 'বজল বজলনী ' শিরোনামটি গৃহীত হতে পারে । বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের মত অসমীয়া হিন্দু সমাজেও বিবাহ ক্ষেত্রে জাতি-বর্ণ বিচার, শুভদিন- শুভলগ্ন বিচার অপরিহার্য । তার অবমাননা হলে সেই বিবাহ সুখের হয় না । এই নাটকে সেই চিরন্তন বিশ্বাস যেন ধ্বনিত হয়েছে । 'বজল বজলনী ' নাটকটি আটটি অংকে ~~RXX~~ বিভক্ত । প্রতি অংক কয়েকটি 'পরিচ্ছেদ' বিন্যস্ত । এই নাটকের 'দোষখণ্ডন' (ভূমিকায়) নাট্যকার বলেছেন- "দেশের কোনো কোনো অনাচার নিবৃত্ত হবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি রচনা করা হলো"। প্রসঙ্গত স্মরণীয় বাংলা সাহিত্যে এই উদ্দেশ্যে একাধিক গ্রন্থ ইতিপূর্বেই রচিত হয়েছিল । এই নাটকে নাট্যকারের সংস্কারকের ভূমিকাটি লক্ষণীয় ।

পূর্ণকান্ত দেবশর্মা

পূর্ণকান্ত দেবশর্মার 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকটি ১৮৯০ সালে রচিত হয় । এই পৌরাণিক নাটকের উপজীব্য বিষয় হরিশ্চন্দ্র রাজার জনপ্রিয় উপাখ্যান । এই উপাখ্যান নিয়ে মহাপুরুষ শংকরদেব তাঁর 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান' কাব্যটি (আনুমানিক ১৪৭০) রচনা করেছিলেন । 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক সম্পর্কে ডঃ হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন- "মূল উপাখ্যানটি মার্কণ্ডেয় পুরান আর কৃত্তিবাসী রামায়ণত পোয়া যায় যদিও নাট্যকারে কৃত্তিবাসী রামায়ণকহে প্রধানকৈ অনুসরণ করা দেখা যায়"।[৮] চণ্ডাল বেশধারী ধর্মের নাম কৃত্তিবাসী রামায়ণে কালু । এই নাটকেও ~~XXX~~ কালু নামই আছে (কালু বরযাত্রী)। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো কালুই হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করে শ্মশানের কার্যে নিয়োগ করেন । কৃত্তিবাসের কালু প্রতিটি শবের জন্য নিতেন ৫০ টি কড়ি । দেবশর্মার কালু নেন একপণ্ডা কড়ি । দেবশর্মার নাটকের শেষে রোহিতাশ্বকে কোলে নিয়ে শৈব্যা ও হরিশ্চন্দ্র চিতায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হলে বিশ্বামিত্রের অকস্মাৎ আবির্ভাব হয় । তিনি তাঁদের আদ্যোপান্ত কাহিনী শ্রবণে পরিতুষ্ট হয়ে মৃত পুত্রের পুনর্জীবন দান করেন

এবং মৃত রাজ্য ফিরিয়ে দেন। এই কাহিনী কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুরূপ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মৃত পুত্রের জীবন দান করেন ইন্দ্র। X মার্কণ্ডেয় পুরাণের ও শংকরদেবের কাব্যের হরিশ্চন্দ্র বিষ্ণুর একান্ত ভক্ত। কৃত্তিবাসের হরিশ্চন্দ্র বিষ্ণু অন্তপ্রাণ নন, দেবশর্মার হরিশ্চন্দ্রও নয়। ইন্দ্রাদি দেবগণ এই নাটকের একটি দৃশ্যে (২।১) ব্রহ্মার নিকটে এসে বলেন, তপস্যারত বিশ্বামিত্রের তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করলে বিশ্ব প্রলয় ঘটবে। তখন ব্রহ্মা গণেশকে আদেশ দিলেন মহারাজ বিশ্বামিত্রের গাত্রে প্রবেশ করে তাঁকে অন্যমনস্ক করতে। এই কাহিনী কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুরূপ। মাধব কন্দলির রামায়ণের মত কৃত্তিবাসী রামায়ণও আসামে খুবই জনপ্রিয়। দেবশর্মার 'হরধনুভঙ্গ' বা 'সীতা স্বয়ংবর' নাটক রচনার প্রেরণার মূলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ, একথা বলা যায়। নাট্যকার 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক রচনায় জনৈক চন্দ্রকান্ত মজুমদারের সাহায্য পেয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। দেবশর্মার নাটকে সংস্কৃত নাটকের প্রভাবও বিদ্যমান।

দেবনাথ বরদলৈ

দেবনাথ বরদলৈর 'বৈদেহী বিচ্ছেদ' পৌরাণিক নাটক, প্রকাশকাল ১৯০১ সাল। এই নাটকের কাহিনী গৃহীত হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও প্রাক্-শঙ্করী কবি হরিহর বিপ্রের 'লবকুশর যুদ্ধ' কাব্য থেকে। গোহাঞি বরুয়ার 'জয়মতী'র পর 'বৈদেহী বিচ্ছেদ'ই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এর আগে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ হয়নি, তা নয়। তবে তা ছিল হাতে লেখা নাটকে সীমাবদ্ধ। দেবনাথ বরদলৈ মধুসূদনের মত 'বাহিরিল' 'জনমাই' 'প্রবেশি' ইত্যাদি নাম ধাতুর ব্যবহার করেছেন। মধুসূদনের অনুসরণে xxxxx বরদলৈর সংলাপ গদ্য x ও পদ্য মিশ্রিত, পদ্যকে বলা যায় অমিত্রাক্ষর ছন্দাশ্রিত সংলাপ। আবেগ মুহূর্তে মিত্রাক্ষরী পদাবলীও আছে। কাহিনী কৃত্তিবাসী রামায়ণ আশ্রিত হলেও নাট্যকারের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' এর সঙ্গে পরিচয় থাকা অসম্ভব কিছু নয়। দুর্মুখের মুখ থেকে

সীতা দেবীর কলঙ্ক রটনার কথা শুনে রামচন্দ্রের সীতা ত্যাগ, লবকুশের যুদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞ, লবকুশের রামায়ণ গান, সীতার পাতাল প্রবেশ ইত্যাদি 'বৈদেহী-বিচ্ছেদ' বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, লবকুশের সঙ্গে রামলক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নের যুদ্ধ কথা মূল রামায়ণে নেই, আছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া নাট্যকার হিসাবেও অসমীয়া সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'চক্রধ্বজ সিংহ', 'জয়মতী কুঁয়রী', 'বেলিমার' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকে বাঙালী নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মনে রাখতে হবে, ঠাকুরবাড়ীর প্রভাব বেজবরুয়ার উপর থাকলেও রবীন্দ্র নাটকের প্রভাবের চাইতে দ্বিজেন্দ্র নাটকের প্রভাব তাঁর উপর বেশী। এই প্রভাব লক্ষণীয় নাট্য-পরিস্থিতি রচনায়, দেশের অতীত গৌরবের অনুধ্যানে, সংলাপে, সংগীত প্রয়োগে। এই সব বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব শুধু বেজবরুয়ার উপর নয়, অন্যান্য অসমীয়া নাট্যকারদের উপরও কত ব্যাপকভাবে পড়েছিল, তা ডঃ জীবন চৌধুরী একটি বাংলা প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন। যাহোক বেজবরুয়ার 'বেলিমার' নাটক প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। এই নাটকের বিষয়বস্তু মানের তিনটি আক্রমণ। কী করে আসামের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়েছিল, তা এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' (১৯০৮) নাটকটির কথা মনে আসে। এই নাটকে মেবারের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার কথা রয়েছে। চন্দ্রকান্ত সিংহের স্বদেশপ্রীতি, দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ সিংহ' নাটকের প্রতাপসিংহকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রতাপ-পুত্র অমর XXXXX সিংহ পিতার তুলনায় নিষ্প্রভ । চন্দ্রকান্তের পুত্র পুরন্দর সিংহও তদনুরূপ । পূর্ণানন্দ বুড়া গোঁহাইর সুদেশপ্রীতি 'মেবারপতনের' গোবিন্দ সিংহকে মনে করিয়ে দেয় । উভয়েই বৃদ্ধ । বদন ফুকনের কার্যাবলীর মধ্যে 'রাণা প্রতাপসিংহে'র শক্ত সিংহের আভাস পাওয়া যায় । বদন মানবে ডেকে আনেন, আর শক্ত সিংহ ডেকে আনেন মুঘলকে । কৃতকর্মের জন্য উভয়েই অনুতপ্ত, তবে অনুতাপটা বদনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম (৪ । ২) । ওরেমনাথ-পিজৌ প্রসঙ্গ দ্বিজেন্দ্র লালের 'সাজাহানের' (১১০১) সুজা - পিয়ারাকে স্মরণ করিয়ে দেয় । ? পিজৌর মধ্যে পিয়ারার প্রভাব স্পষ্ট । উভয়েই সুন্দরী, উভয়েই কনিষ্ঠ পত্নী । উভয়েই কথায় কথায় গান গেয়ে থাকেন । এবং উভয়েরই মুখে কথার ফুলঝুরি । আবার পিজৌর মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতনের' কল্যানীকেও খুঁজে পাওয়া যায়। পিজৌ পতিগত প্রাণা, পিতৃগত প্রাণাও । 'সাজাহানের' একটি দৃশ্য সুজা ও পিয়ারার সংলাপে পিয়ারা বলেছেন, 'সিংহের বল দাঁতে, হাতির বল শুঁড়ে, মহিষের বল শিঙে, ঘোড়ার বল পিছনকার পায়ে, বাঙালীর বল পিঠে আর নারীর বল জিভে ।' (১।৩)

'বেনিষারে'র বিদ্যাবাগীশের একটি সংলাপে প্রযুক্ত এই শ্লোকটি -

দুর্বলস্য বলং রাজা
বালানাং রোদনং বলম্ ।
বলং মূর্খস্য মৌনিত্বং
চৌরাণামনৃতম্ বলম্ ॥

পিয়ারার উক্ত সংলাপটিকে স্মরণ করিয়ে দেয় । জগন্নাথ - চন্দ্রকান্তের সংলাপ (১।৭) 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের চন্দ্রগুপ্ত - চাণক্যের সংলাপের (৪।২) অনুরূপ । চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের কবল থেকে মুক্তি চান, চন্দ্রকান্ত চান বুড়া গোঁহাইর হাত থেকে মুক্তি ।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ সিংহে'র রাজপুতরা সাহসী জাতি। তারা মরতে জানে, মারতেও জানে। এই ভাব কলিবর বুঢ়া গোঁহাইর একটি সংলাপেও বিদ্যমান। সেনাপতি মিডিমাহাকে (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে) বলেন - "জানা সেনাপতি ডিলুয়া। আমি অসমীয়া মানুহ। আমি হাঁহি হাঁহি মরিবও জানো, মারিবও জানো"। (১৫।২)।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে শিশু বা বালক বালিকাকে কেন্দ্র করে করুণ রস সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয়। (যেমন - 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের ভিক্ষুক বালা)। 'বেলিমারে'র মধ্যেও অনুরূপ বিষয় লক্ষণীয়। যেমন বালক জয়রাম মাকে বলছে - "আই, মোর বর ভোক লাগিছে। খাবলৈ দিয়াঁ আই, মোর বর ভোক লাগিছে। নহলে মই মরিম এতিয়া।" "মাক" বলেন - "হাতত কুটা এগছকে নাই মোর মইনা কি দিম? দেউতারে রাতিলৈ মনে মনে থরলৈ গৈ কিবা পায় যদি আনিলে খাবি মোর সোনাই।"

বেজবরুয়া তাঁর নাটকে একাধিকবার পত্রপাঠের ব্যবস্থা রেখেছেন। বঙ্কিমের উপন্যাস থেকেও (যেমন - 'কৃষ্ণকান্তের উইল') বেজবরুয়া এই রীতি নিয়ে থাকতে পারেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের মত গীতাধিক্য এই নাটকেও বিদ্যমান।

বেজবরুয়ার 'চক্রধ্বজ সিংহ' (১৯১৫) নাটকে চক্রধ্বজ সিংহের রাজত্ব কালে লাচিত বরফুকন মোগল সেনার বিরুদ্ধে যে দু'টি সার্থক অভিযান চালিয়েছিলেন তাই বর্ণিত হয়েছে। লাচিত বরফুকন চরিত্রটি 'মেবার পতনে'র গোবিন্দ সিংহকে স্মরণ করিয়ে দেয়। উভয় পিতা এবং উভয় পুত্রই বীর। 'মেবার পতনে'র হেদায়েত আলি খাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় এই নাটকের রচিত খাঁ। উভয়ের বাক্যভঙ্গীই এক। চক্রধ্বজ সিংহ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি -

দূত - সেনাপতি রামসিংহের কোঠত এতিয়াই অসমীয়ার বরহিলৈর গুলী ~~আহি~~ এটা পরি সেনাপতির ভতিজাক মরিল।

রচিত খাঁ - রামসিংহক কৈদে, তাক ~~মই~~ কবর দিয়ক। ~~ত~~ মই ভুল করিছো, তাক ধরি দিবলৈক। আচ্ছা অভিয়াও। সিরাজি লাও। গান গাও--- (৫।১)।

রচিত খাঁর চরিত্রের এই অস্থিরতা, খেয়ালিপনা 'মেবারপতনের' হেদায়েত আলি খাঁর মধ্যেও দেখা যায়। তবে হেদায়েতের মত রচিত খাঁকে কাপুরুষ বলা সঙ্গত হবে না, রচিত খাঁর মান সম্মান বোধ আছে (হেদায়েতে যা নেই)। রামসিংহ তাঁকে অবমাননা করলে তিনি বঙ্গদেশ চলে যান। আত্মম্ভরিতায় কেউ কম নয়। রচিত খাঁ বাদশাহকেই মানেন, রামসিংহকে তিনি পরোয়া করেন না। আর হেদায়েত আলি খাঁ, তিনি যে সেনাপতি তা তাঁর অধীনস্থদের বারবার মনে করিয়ে দিতে বিস্মৃত হন না। দুটো চরিত্রই মাতাল। রচিত খাঁ মদ খেয়ে মাতাল, হেদায়েত মদ না খেয়েই।

গজপুরীয়ার চরিত্রটিতে শেকসপীয়ারের ফলস্টাফ চরিত্রের ছায়া আছে, এই চরিত্রটির সঙ্গে হেদায়েতেরও সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। উভয়েই নিজেকে বীর বলে জাহির করতে চান, সেজন্য মিথ্যা বলতেও পিছপা নন। সেই মিথ্যা প্রকাশ পেলে কেউই লজ্জিত নন। গজপুরীয়া গর্ববোধ করেন তিনি দুজন মোগল সেনাপতিকে বন্দী করেছেন। আসলে তা সাধিত হয়েছে পিয়রামের দ্বারা। আর হেদায়েত মানসিংহকেও দুর্বল সেনাপতি মনে করেন। অথচ শত্রুর কাছে তিনি সর্বাগ্রে হস্তদ্বয় এগিয়ে দেন যাতে স্ব মস্তক বাঁচে। পদিয়া খোয়া গোঁহাই লাচিতের কন্যা চেনেহীর ভাবী স্বামী। তার সাথে মেবার পতনের সত্যবতী পুত্র অরুণের সাদৃশ্য আছে। পদিয়াখোয়া গোঁহাই ভাবী শ্বশুরের পার্শ্বে স্থিত থেকে যুদ্ধ করেছে। অরুণ মায়ের সাথে দেশমাতৃকার গান গেয়ে বেড়িয়েছে, গজসিংহকে মেবারের যুদ্ধে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে। (১১৩)। রূপহী চরিত্রটিতে দ্বিজেন্দ্রর 'সাজাহানের' পিয়ারা চরিত্রের প্রভাব আছে বলে মনে হয়। রূপহী পিয়ারার মতই চোখে মুখে কথা বলে, কথায় কথায় গান গায়।

বেজবরুয়া 'জয়মতী' (১৯০০) নাটকের 'পাতনি'তে লিখেছেন যে তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন এবং এই নাটকের পিয়ারা চরিত্রের কিঞ্চিৎ আভাস জয়মতী চরিত্রের প্রথমাংশে কিছুটা

পড়া সম্ভব। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক 'সাজাহানে'র অন্যতম পুত্র সুজার কণ্ঠ পিয়ারা পুষ্পমাল্য প্রদান করে, গান গেয়ে রসিকতা করে। 'জয়মতী' নাটকেও জয়া তার স্বামী গদাধরের কাছে সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রাণের আবেগ প্রকাশ করে।

বেজবরুয়ার 'দেবযানী' (১৯১১) নাটিকাটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, রচনা স্থান হাওড়া (কলকাতা)। কচ ও দেবযানীর প্রেমকথা ভিত্তিক বেজবরুয়ার এই নাটিকাটি রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ'কে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'বিদায় অভিশাপে'র কাহিনীও কচ দেবযানী কথা। এটি সমিল অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। প্রথম দর্শনটির সাথে 'বিদায় অভিশাপের' অদ্ভুত রকম সাদৃশ্য আছে। উভয় নাটিকার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি।

রবীন্দ্রনাথের দেবযানী বলেন -

যে বিদ্যার তরে
মোরে করো অবহেলা সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ। তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবেনা করিতে প্রয়োগ।

আর বেজবরুয়ার দেবযানী বলেন -

অতকাল করি তুমি কঠোর যতন
যে বিদ্যা লভিলা, বিদ্যা মৃত্যুসঞ্জীবনী
ফলবতী নহব, তোমাত নিশ্চয়।

বেজবরুয়ার নাটকের সুদীর্ঘ স্বগতোক্তি (যেমন - দেউরামের উক্তি - 'লিতিকাই', ৫।২) গিরিশ চন্দ্র প্রমুখ নাট্যকারের স্বগতোক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয় (যেমন - 'নলদময়ন্তীর পুষ্করের উক্তি - ২।১)।

পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া
(১৮৭১ - XXXX ১৯৪৬)

অসমীয়া কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা কবিরূপে পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার আলোচনা করেছি। নাট্য রচনায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল।

পদ্মনাথ আর বেনুধর রাজখোয়া দু'জনে মিলে একটি নাটক রচনা করেছিলেন, নাম 'ডেকা - গাভরু'। এই বেনুধর রাজখোয়া বাড়ীতে চিঠি দিতেও পদ্য লিখতেন, অসমীয়ায় নয় / বাংলায়। যেমন 'মন্দির হয়েছে জুর, শুন পিতৃবর'। হাই স্কুলে পাঠকালে পদ্মনাথ কামাখ্যার নাটমন্দিরে 'অভিমন্যু - বধ' বাংলা থিয়েটার দেখেন (১৮৮৫ সালে দুর্গাপূজার সময়) এবং ~~XX~~ মুগ্ধ হন। তিনি এই ~~XX~~ নাটক বাজার থেকে কিনে এনে দীননাথ বেজবরুয়ার বৈঠকখানায় অভিনয় করে শান্তি পান। তখনই গোহাঞি বরুয়া অসমীয়া নাটক লিখতে অনুপ্রাণিত হন। তাঁর ভাষায় -"এখন অসমীয়া নাটক রচনা করিবলৈ তেতিয়াই মই কৃত সংকল্প হওঁ।" গোহাঞি বরুয়ার অসমীয়া সাহিত্যচর্চার মূলে জোনাকী - পত্রিকার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তদুপরি সেই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সারস্বত সাধকদের দর্শন করে বা তাঁদের রচনা পড়ে আনন্দ পান।[১০] এই আনন্দ তাঁকে অসমীয়া সাহিত্য চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছে।

পদ্মনাথের 'জয়মতী' (১৯০০) ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে জয়মতীর পতিভক্তি ও স্বার্থত্যাগ। ১৭৬৩ সাল থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত আসামের বড় দুর্যোগের সময়। এই সময় সাতজন রাজা সিংহাসনে আসীন হন ও সিংহাসন চ্যুত হন। সর্বশেষ রাজা চুলিকফা বা লরা রজা (যার অর্থ বালক রাজা) নিজের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করবার জন্য সমস্ত রাজকুমারের অঙ্গচ্ছেদ করেন। রাজপুত্র গদাপাণিকে রক্ষা করবার জন্য পত্নী জয়মতী স্বামীকে নাগা পাহাড়ে প্রেরণ করেন। তিনি নিজে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে মৃত্যু বরণ করেন, তবুও পতির সন্ধান দেন নাই। এটি পঞ্চাংক নাটক। প্রতিটি অংক গর্ভাংকে বিন্যস্ত।

জয়মতী প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের 'নলদময়ন্তী'র কথা মনে পড়ে । 'নলদময়ন্তী' নাটকটি ১৮৮৩ সালে প্রথম অভিনীত হয়েই দর্শকের মনপ্রাণ কেড়ে নেয় । পদ্মনাথ গিরিশচন্দ্রের 'অভিমন্যু বধে'র (১৮৮১) সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন । সুতরাং ধরে নেওয়া যায় 'নলদময়ন্তী' তাঁর অপঠিত ছিল না । 'জয়মতী' ও 'নলদময়ন্তী'র মধ্যে সাদৃশ্য অনেক । যেমন উভয়ের পতিই বীর ও রাজপুত্র, উভয়েই পতিপ্রাণা । উভয়েই একাধিক সন্তানের জননী । পার্থক্যও রয়েছে, যেমন জয়মতী পতির জন্য কষ্ট করে মৃত্যু বরণ করেছেন, দময়ন্তীকে মরতে হয়নি ।

নল দুষ্টগ্রহের চাপে দময়ন্তীকে নিদ্রাবস্থায় বনে একাকী ফেলে যেতে চাইছেন, কিন্তু মন চাইছে না যেতে (৩।১), এই দৃশ্য স্মরণ করিয়ে দেয় জয়মতীর পঞ্চমাংকের প্রথম দৃশ্যটিকে । কারাগারে গদাপাণির সঙ্গে জয়মতীর দেখা হল । গদাপাণিরও জয়মতীকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে, অথচ মন চাইছে না (৫।১)। জয়মতী চরিত্রের সম্যক বিকাশের জন্য পদ্মা চরিত্রের অবতারণার মূলে বাংলা সাহিত্যের প্রেরণা থাকতেও পারে । যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলায়' শ্যামা সুন্দরী, 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে 'সরমা' ।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে সুদীর্ঘ স্বগতোক্তি দেখা যায় । যেমন 'নল দময়ন্তী'র দ্বিতীয় অংকের প্রথম গর্ভাংকে পুষ্করের উক্তি । এই ধরণের স্বগতোক্তি পদ্মনাথের সারা নাটকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ।

দময়ন্তী কোন দেবতাকে পতি হিসেবে বরণ না করে নর নলকে বরণ করার ফলে দেবতাদের বিরাগ ভাজন হন । এই প্রসঙ্গে কলির উক্তি উল্লেখ্য :-

> একাদশ বর্ষ করি রন্ধ্র অন্বেষণ ।
> বৃথা পরিশ্রম - মনোরথ না পূরিল ।
> ধর্মপরায়ণ নল বিচক্ষণ
> নারিলাম প্রবেশিতে শরীরে তাহার,
> নাহি অনাচার ---

মম অধিকার নিত্যাচার জানে নাহি
হায়, না দেখি উপায়
ঈর্ষানলে দহে প্রাণ।
ছি। ছি।
কত অপমান সহিলাম স্বয়ম্বরে, -
দময়ন্তী যৌবনের তরে
দেবে অনাদরে।
নলে বরে দেবসভা মাঝে
কি প্রেম বন্ধন আছে দুইজনে,
অবিচ্ছেদ বহিছে প্রবাহ
অহরহ হেরি প্রাণে জ্বলে যদি
জল আর দেখিব কয়েকদিন।
নল রাজে যদি নাহি পারি
বৃথা কলি নাম ধরি
সংসারের অধিকারী হইব কেমনে ?
ক্রীড়াদাসী কুমতি আমার -
কিন্তু নলে কোন ছলে না পারে ভুলাতে।
(২।১)

'জয়মতী'র নরাবতার উক্তির সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে :-

গদাপাণি।

ভীষণ হইনাম, শুনি মোর কাঁপে হিয়া
কাঁদিছে অন্তরটায়, কি জানো কি জানি
পরিছে মনতও আজি তাহা নিতে দেখা
বীরবাহু গদাপাণি খেয়ালি খুঁজত, -
প্রকাণ্ড পুরুষ আর, ভীম গদাধারী
অকনে শক্ত মিটো শত জন নই।

XIX

অসমাপ্ত নিরাপদ ন করিব যোক,
ন বধিলে পদাপাণি নৃপুচে উপায়।
আর, এক ঈর্ষানলে দহিছে অন্তর, -
জয়মতী পত্নী লাভ আর, হিয়া উদ্দেশ্যই
সঁপিছিলো যার্, ডাল পোয়া যার হস্তে
আজি সর্বস্ব সঁপিব পারো, পারো দিব
অকাতরে সিংহাসন এরি, কিন্তু হায়
নৃপুরিল প্রেম আশা, নাই প্রতিদান।
ঘিন করি নিল পালে যোক! নিল পালে
যাচি দিয়া প্রেম মোর অযাচিত পালে
কিন্তু সেই ডাল পোয়া, পদাপাণি বীরে
সেই পদাপাণি, প্রেমত বিঘিনি মোর।
যার নামে ঈর্ষানলে জ্বলি উঠি মন
লম তার প্রতিশোধ লম এই বার,
লই তার প্রাণ আজি, বিরহ অনল
জ্বলম প্রতিজ্ঞা মোর জয়ার বুকুত।

XXXX (১১১)

গিরিশচন্দ্রের নাটকে সাধারণ মানুষের সংলাপ (যেমন 'নল দময়ন্তী'র বৃদ্ধা, লোক ব্যাধ প্রভৃতি) পাই পদ্যে, 'জয়মতীতে'ও অনুরূপ রীতি গৃহীত হয়েছে। যেমন - বগী, চিনু, জিনুর সংলাপ।

পদ্মনাথের 'সাধনী'ও (১৯১১) ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকের নায়িকা একজন মহিষী, নাম সাধনী। তিনি চুটীয়ার সর্বশেষ রাজা নীতিপালের পত্নী, ইনিও পতিগত প্রাণা। চন্দন গিরির শৃঙ্গ থেকে লম্ফ দিয়ে ইনি সতীত্ব রক্ষা করেন। 'সাধনী' পড়তে-পড়তে নল দময়ন্তীর কথা স্মৃতি পথে উদিত হয়।

নল দময়ন্তীর মতো এখানেও নাট্যকার স্বয়ংবর সভার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন, নাট্যকার একাধিক বার 'নল দময়ন্তী'র কথা উল্লেখও করেছেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় নালীয়ার উক্তি -

(১) এতিয়া স্বয়ম্বর পণ রক্ষা করেহি বা কোনে? রামেই আছে না অর্জুনেই আছে? নাই পঞ্চনলেই বহেহি? (২।৩)

(২) রাম, কৃষ্ণ, অর্জুন, নল ই বিলাকর ভিতরর একজনর অবতার বুলি মোর ভ্রম হৈছিল। (২।৩)

(৩) চন্দনগিরির বর্ণনার প্রসঙ্গ আছে -

ইয়াতে এদিন হাঁয় দময়ন্তী সতী
উঠিছিল আহি আহি বাট হেরুয়াই ---
মহাসতী দময়ন্তী কেনকই আহি ---

নল দুষ্ট গ্রহের প্রভাবে হিতাহিত বুদ্ধি হারিয়েছিল। স্ত্রী, মন্ত্রী কারো হিত কথা তাঁর ভাল লাগত না। পদ্মনাথের নীতিপালও যেন দুষ্ট গ্রহ কবলিত। সাধনী বলেন --

পরিছা ভ্রমত।
নিচিনা বন্ধু কোন। --------- (৩।৫)

কিংবা স্মরণ করা যেতে পারে সাধনীর এই উক্তিটি - (মিত্রদের প্রতি অবিচার, শত্রুদের সুযোগ দান প্রসঙ্গে)

হিতে বিপরীত
বোলে লোকে ইয়াকেই।
কালর কুটীলা গতি লোনাবর গুণে
কত চিন্তা কত যত্ন হইছে বিফল (৩।৫)

মনে হয় পদ্মনাথ 'সাধনী' রচনার সময় গিরিশ চন্দ্রের 'নল দময়ন্তীকে' স্মৃতি পটে

রেখেছিলেন। তাই নীতিপাল ও মাধবী যখনই কথা বলেন তখনই ভ্রম হয় - এ নল ও দময়ন্তীর সংলাপ নয়তো। নল বীর, নীতিপালও বীর। উভয়েই রাজা, তবে নীতিপালের বংশ গৌরব ছিল না। (পূর্বে তিনি রাখাল ছিলেন)। তাজ অমিত্রাক্ষর তথা গৈরিশ ছন্দ পদ্মনাথের নাটকে প্রভূত পরিমাণে প্রযুক্ত হয়েছে। পদ্মনাথের 'গদাধর' (১৯০৭) ঐতিহাসিক নাটকে জয়মতীর মৃত্যুর পর গদাপাণি কী করে রাজা হলেন এবং রাজা হয়ে কিভাবে দেশে শান্তি স্থাপন করলেন তা বর্ণিত হয়েছে। বাংলা যাত্রায় দেখা যায় সস্তা হাত তালির জন্য গালভরা সংলাপ, সেই সাথে চরিত্রের লম্ফ ঝম্ফ পূর্ণ অভিব্যক্তি। এই নাটকের গদাপাণির সংলাপও তদ্রূপ। পতিভক্তি এই নাটকেও বর্ণিত হয়েছে। এখানে সতী টির নাম ফুকননী (৩।৫)। সাধারণ মানুষের সংলাপ এই নাটকে গদ্যে দেওয়া হয়েছে। (যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় সেনাপতির সংলাপ)। এই নাটকের 'রাজমাও' চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজউদ্দৌলা (১৯০৬) নাটকের আলিবর্দী মহিষীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আলিবর্দী মহিষী সিরাজের জন্য সিরাজবিরোধীদের অনুরোধ করেছেন সিরাজকে ক্ষমা করতে। অনুরূপ কাতরতা 'রাজমাও'য়ের মধ্যেও দেখতে পাই। রাজমাও অর্থাৎ রাজমাতা - লরা রজার মাতা। তিনি পুত্রের অন্যায়ের সঙ্গে পরিচিত। সেজন্য তিনি দুঃখিত। কিন্তু হাজার হলেও 'লরা রজা' তাঁর পুত্র। তাই তার প্রাণ যাতে রক্ষা হয় সেজন্য তাঁরও কম ভাবনা নয়। পদ্মনাথের 'লাচিত বর ফুকন'ও (১৯১৫) ঐতিহাসিক নাটক। দেশপ্রেম এই নাটকের উপজীব্য বিষয়। লাচিতের বীর্যবত্তা এখানে প্রকাশিত হয়েছে। এই নাটকের লাচিতের দেশপ্রেম গিরিশচন্দ্রের সিরাজ উদ্দৌলাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। রমনী গাভরুর দেশপ্রেম দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবারপতনের' সত্যবতীর অনুরূপ। গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে 'জহরা' নামে একটি চরিত্র আছে। জহরা পতিপ্রাণা নারী। স্বামীহন্তার প্রতিশোধ কল্পে সে করতে পারে না এমন কিছুই নেই। সেজন্য সে ছদ্মবেশ নিয়েছে, নবাব ও নবাব-শত্রুর শিবিরে খুব সহজভাবে যাতায়াত করেছে। রমনী গাভরুও ছদ্মবেশ নিয়েছে এবং প্রেমিক লাচিতের সাথে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে। এই চরিত্রটিতে মতিবিবি,

সত্যবতী, জহরা প্রভৃতি চরিত্রের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে মনে হয়। মোগলের অতর্কিত আক্রমণ থেকে রমনী গাভরু লাচিৎকে রক্ষা করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) নাটকে ছায়াও চন্দ্রগুপ্তকে অনুরূপ ভাবে রক্ষা করেছিল। রমনী গাভরু পুরুষ সৈনিকের বেশে মোগল শিবিরে বাস করেন। নারীর এই ছদ্মবেশ বঙ্কিমের উপন্যাসে দেখা যায়। (যেমন 'আনন্দমঠ'-এ শান্তি, 'কপালকুণ্ডলায়' মতিবিবি) ইংরাজী সাহিত্যে সে নজীর অনেক আছে। (যেমন শেকসপীয়রের "দি মার্চেন্ট অব্ ভেনিস"-এর পোর্শিয়া চরিত্র)। মোগল শিবিরে ছদ্মবেশে অবস্থানের পরিকল্পনা দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চন্দ্রগুপ্তের গ্রীক শিবিরে অবস্থান করে শিক্ষার দৃশ্য থেকেও নাট্যকার পেতে পারেন। লাচিতের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা'র মোহনলাল চরিত্রটিকে যেন খুঁজে পাওয়া যায়। পদ্মনাথের রমনী গাভরু চরিত্রটির পরিকল্পনার পশ্চাতে মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রের জনা চরিত্রের প্রেরণাও থাকতে পারে। জনাও যুদ্ধ প্রিয়, তার মূল কারণ দেশপ্রেম। শেক্সপীয়ারের বহিরঙ্গ প্রভাবজাত যে সকল বৈশিষ্ট্য গিরিশচন্দ্রের নাটকে দেখা যায় (যেমন - বিষ প্রদান, নিষ্ঠুর হত্যা, আকস্মিক মৃত্যু, ভৌতিক চরিত্র, নারীর পুরুষ বেশ ধারন ইত্যাদি) তার কিছু-কিছু পদ্মনাথের নাটকেও বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে রমনী গাভরু চরিত্রটি স্মরণ করা যায়।

পদ্মনাথের 'বানরজা' (১৯০৩) পৌরানিক পঞ্চাংক নাটক। উপজীব্য বিষয় উষা - অনিরুদ্ধের প্রণয় কাহিনী। এই নাটকের গতিভঙ্গি, ভাবপ্রবণ উক্তি, অযথা লম্ফ ঝম্ফ পূর্ণ কৃত্রিম সংলাপ, পদ্য ও পদ্য মিশ্রিত অমিত্রাক্ষর তথা গৈরিশ ছন্দ, সাধারণ মানুষের চরিত্রের গদ্য সংলাপ, দেশপ্রেম গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'বানরজা'র দ্বিতীয় অংকের পঞ্চম গর্ভাংক বাণের দীর্ঘ একাত্ম ভাষণে শুরু এবং শেষ। চন্দ্রগুপ্তের তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যের একাত্ম ভাষণটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

বেণুধর রাজখোয়া

বেণুধর রাজখোয়ার (১৮৭২ - ১৯৫৫) জন্ম ডিব্রুগড় মহকুমায়, স্নাতক হন কলকাতা থেকে। তাঁর বাংলা ভাষাপ্রীতি সর্বজন বিদিত। তিনি বাড়িতে চিঠি দিতেও বাংলায় পদ্য লিখতেন তার নমুনা XXXXXXXX XXXXXXXXX পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। রাজখোয়া সমাজের দোষ সংশোধনের জন্য কয়েকটি নাটক রচনা করেন। যেমন - 'কুরি শতিকার সভ্যতা' (১৯০৮), 'অশিক্ষিতা স্ত্রী' (১৯১২) ইত্যাদি। সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে বঙ্গসাহিত্যে ইতিপূর্বে বহু নাটক রচিত হয়েছে। যেমন মধুসূদনের - 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৯৬০), দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'জামাইবারিক' (১৮৭২) ইত্যাদি। রাজখোয়ার পৌরাণিক নাটক 'দুর্যোধনর উরুভঙ্গর' (১৯০১) কাহিনী কাশীদাসী মহাভারত থেকে নেওয়া। বিষয়বস্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ অধ্যায়। দুর্যোধন আত্মরক্ষা কল্পে দ্বৈপায়ন হ্রদে পলায়িত। ব্যাধের মুখে এই সংবাদ পেয়ে পঞ্চপান্ডব সেখানে উপস্থিত হন এবং দুর্যোধনকে সমর ক্ষেত্রে আহ্বান করেন। এখানেই এই কুরুপুত্রের উরুভঙ্গ হয়। দুর্যোধন বধে নাট্য কাহিনীর পরিসমাপ্তি। এই নাটকে কাশীদাসী মহাভারতের অনুসৃতি সমালোচকরাও লক্ষ্য করেছেন।[১১] এতে রাজখোয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন। রাজখোয়ার 'দরবার' (১৯০২) নাটকে নেপালী কাবুলী ইত্যাদি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষাও স্থান পেয়েছে। এই নাটকের ষষ্ঠ অংকের প্রথম দর্শন থেকে একটু নমুনা দেওয়া যাক --

ছিলটিয়া - মিঠাই খাইছিলা কেন? এখন সাত আনা দিবার টানাটানি।

লরা - আরে মিঞা

ছিলটীয়া - মিঞা মিঞা করস কেন?

লরা - মুন্সীজী

ছিলটীয়া - আরে তুই বর আহাম্মক।

বেনুধর রাজখোয়া এবং দুর্গাপ্রসাদ মজিন্দার যৌথভাবে 'কলিযুগ' (১৯০৪) নাটক রচনা করেন। ইংরেজী সাহিত্যে বোমন্ট ও ফ্লেচার যৌথভাবে বহু নাটক রচনা করেছেন। দেবতাদের মানুষের মত করে চিত্রিত করা হয়েছে 'কলিযুগ' নাটকে। এই দুঃসাহসের মূলে কিন্তু বঙ্গের সরস্বতীর বরপুত্র মধুসূদন, তাঁর প্রভাব অসমীয়া সাহিত্যে নানাভাবে বিস্তৃত।

রাজখোয়ার 'তিনি ঘৈনী'তে (১৯২৮) বহু বিবাহের অশুভ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে। ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে এই বিষয় নিয়ে একাধিক নাটক রচিত হয়েছে। তার মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্ন-এর 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজখোয়া "আলী বাবা এণ্ড দি ফোরটি থী ব্স" অবলম্বনে 'চোরর সৃষ্টি' (১৯৩১) রচনা করেন। স্মরণীয় আরব্য উপন্যাসের এই স্মরণীয় কাহিনী নিয়ে ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'আলিবাবা' রচনা করেন ১৮৯৭ সালে। এই নাটকটি এক সময়ে পাঠক ও দর্শক মহলে খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। 'চোরর সৃষ্টি'র রচনার মূলে বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা'র প্রেরণা থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাঁর অন্য কোন নাটকে ক্ষীরোদ প্রসাদের প্রভাব আমাদের চোখে পড়েনি।।

চন্দ্রধর বরুয়া

চন্দ্রধর বরুয়াকে (১৮৭৪ - ১৯৬১) ডঃ হরিচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'অসমীয়া নাট্য সাহিত্যর জিলিঙনি' গ্রন্থে 'মধুলোহি বৃত্তিধর' বলে উল্লেখ করেছেন। একদা মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সম্ভবতঃ তাঁর আদর্শেই বরুয়া মহাশয় 'মেঘনাদ বধ' (১৯০৪) নাটক রচনা করেন। এটি গৈরিশ ছন্দে রচিত প্রথম অসমীয়া নাটক, অন্যদিকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনুরূপ চরিত্রচিত্রণ পদ্ধতিতে মেঘনাদ উজ্জ্বল চরিত্র হয়ে উঠেছে এই নাটকে।

বরুয়ার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'মেঘনাদ বধ' নাটক। এই নাটকের 'পাতনি'তে (ভূমিকা) নাট্যকার লিখেছেন — '' এই নাটকর সরহ খিনি ভাব এগরাকী মহাকবির পরা অনা হৈছে। তার লগতে অভিনয় করিবলৈ সুবিধা হবর নিমিত্তে, লিখকে বহুত ঠাইত নিজর ভাবো মিহলি করিছে। কিন্তু কবির ভাব নরচর নকরাকৈ রাখিবলৈ যথাসাধ্য যত্ন করা হৈছে আরু সুবিধা বুজি কোনো - কোনো ঠাইত, তেওঁর ভাষাকে ভাঙি থোয়াও হৈছে, তথাপি লিখকর হাতত পরি মহাকবির রচনার সৌন্দর্য নুটুটাকৈ থকা নাই। সেই বাবে পাঠক সকলে যেন দায় ন ধরে।''

বরুয়া যে মহাকবির কথা উল্লেখ করেছেন, ইনি বাংলা সাহিত্যের মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনের কাব্যের নাট্যরূপ দিতে গিয়ে চন্দ্রধর যে টুকু স্বাধীনতা নিয়েছেন তা সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে, একথা বলা চলে না। তবু মধুর প্রভাব তিনি মনে প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছেন। মধুসূদন দত্ত থেকে চন্দ্রধর বরুয়া আরো একটি বস্তু অসমীয়া সাহিত্যে এনেছেন, তাহল মধুসূদন ব্যবহৃত নামধাতু প্রয়োগ পদ্ধতি। যেমন — ব্যাখিছিল, আবির্ভাবি, প্রদানিলে, প্রস্থানিলে ইত্যাদি। বরুয়ার 'মেঘনাদ বধ' নাটকের প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্য প্রমোদ কানন। এখানে অবশ্য 'দৃশ্য' নয় 'দর্শন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গে যেখানে আমরা মেঘনাদ — প্রমীলাকে দেখতে পাই,

সেটিও প্রমোদ কানন। মেঘনাদ ধাত্রী 'প্রভাষা' এই নাটকে দূতরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। মধুসূদনের মানসপুত্র মেঘনাদ প্রমোদ বনে প্রমদাদল পরিবৃত। প্রভাষার কাছ থেকে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ ও রাবণের যুদ্ধযাত্রার সংকল্পের কথা শ্রবণ করে মেঘনাদ বলেন --

--- হা ধিক মোরে, বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা হেথা আমি বামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিত, আন রথ ত্বরা করি,
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।

বড়ুয়ার মেঘনাদও ঐ একই পরিস্থিতিতে একই ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করেন -

--- শতধিক মোর প্রতি
বেড়ি আছে লংকা পুরি প্রবল শত্রু যে ...
রমণীর সমাজত, প্রমোদ বনত
বিলাস ভুগিছো মই নিশ্চিন্ত মনের ...
তুরন্ত আনক রথ,
ঘুচাম কলংক আজি
রিপুকুল সমূলি নির্মূল করি।

'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র প্রভাব চন্দ্রধর বড়ুয়ার 'মেঘনাদ বধ' নাটকের পাতায় - পাতায়। বড়ুয়ার নাটকের ভগবতী ও ইন্দ্র প্রসঙ্গ (১১৩) মধুসূদনের দ্বিতীয় সর্গের ভগবতী - ইন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বড়ুয়ার প্রমীলা - বাসন্তীর সংলাপ (১১৫) মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র অনুরূপ। মধুসূদনের প্রমীলা বলেন -

রঘুবর পতিবৈরী মম,
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,
নিজ-ভুজবলে তিনি ভুবন-বিজয়ী,
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ? ...
লও সঙ্গে, শূর, তুমি ওই মোর দূতী।
কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে বামা, যাও ত্বরা করি। (তৃতীয় সর্গ)

বরুয়ার প্রমীলাও বলেন -

রঘুপতি পতির অরাতি মোর,
তেওঁ বুলি কিন্তু মই তেওঁর লগত
অনর্থক নকরো বিবাদ।
পতি মোর বীরেন্দ্র কেশরী,
নিজের বলত তেওঁ ভুবন বিজয়ী,
তেওঁর সলনি মোর
নাই প্রয়োজন যুজিবর।
যাব এই দূতী মোর তোমার লগত
নিবেদিব রাঘবক অভিপ্রায় মোর।
যোয়া শীঘ্র বীরবর,
অপেক্ষি থাকিম আমি সমরভূমিত। (১।৫)

প্রমীলার সখী নৃমুণ্ডমালিনী উভয় গ্রন্থেই বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত মন্দোদরী - প্রমীলা - মেঘনাদের সংলাপ (৩।১), বিভীষণ - মেঘনাদ - লক্ষ্মণের সংলাপ (৩।৪) 'মেঘনাদ বধ কাব্যানুগ। রাম-লক্ষ্মণের উদ্দেশে যে-সব কু-বিশেষণ 'মেঘনাদ বধ কাব্যে' ব্যবহৃত হয়েছে তা প্রায় সবই এই নাটকেও বিদ্যমান। যেমন - বর্বর, অধম, ইত্যাদি। এই নাটক এক কথায় 'মেঘনাদ বধ কাব্য'রই [illegible] নাট্যরূপ। নাট্যকার নাটকের সূচনা করেছেন

'অমিত্রাক্ষর ছন্দ দিয়ে, তারপর আশ্রয় নিয়েছেন গৈরিশ ছন্দের, সর্বশেষে গদ্যের। এই বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

বরুয়ার 'তিলোত্তমা সম্ভব' নাটকের প্রকাশ কাল ১৯১৯ সাল। এই নাটকটির উপজীব্য মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য'। (১৮৬০)এই নাটক-এরও সংলাপ পদ্য ও গদ্যে। গদ্য সংলাপ প্রযুক্ত হয়েছে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে। এই নাটকে 'দর্শনের' পরিবর্তে 'দৃশ্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'চন্দ্রধর বরুয়া তাঁর 'তিলোত্তমা সম্ভব' নাটকের ভূমিকায় ('পাতনি') বলেছেন- "মেঘনাদ আরু তিলোত্তমা দুইও একখন ফুলনির ফুলেরেই গথা। ইয়া তো তার দরেই মাজে- মাজে লিখকর ফুটুকা ফুলো সুমাই দিয়া হৈছে, সেইবাবে আরু গাঁথিব নজনার দোষতো হ আপচু হৈছে বুলিহে লিখকে ভয় করিছে"।

নাট্য প্রয়োজনে মধুসূদনের কাব্যের চরিত্র সংখ্যা বরুয়া হ্রাস করেছেন আবার নতুন চরিত্রও সংযোজন করেছেন। নতুন চরিত্র - যেমন, সুন্দ-বন্ধু রঞ্জন, সৈনিক কর্মচারী নিরঞ্জন ইত্যাদি। মধুসূদনের 'রাত্রি নিদ্রা - স্বপ্ন' এই নাটকেও বিদ্যমান।

মধুসূদনের আরাধনা ধাতা তথা ব্রহ্মাকে বলেন -

সুন্দ উপসুন্দাসুর বলী,
দলি আদিতেয়-দলে বিষম সংগ্রামে
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি,
লন্ডভন্ড করি স্বর্গ - দাবানল যথা
বিনাশে কুসুমে পশি কুসুম কাননে
সর্বভুক্। রাজচ্যুত, পরাভূত রণে,
তোমার আশ্রয় চায় নিরাশ্রয় এবে
দেবদল - নিদাঘার্ত পথিক যেমতি
তরুবর পাশে আসে আশ্রয়-আশায়। ....

হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে
বদ্ধ দেবকুলে, দেব, উদ্ধার গো আজি। (তৃতীয় সর্গ)

এবার বরুণার আরাধনার উক্তি শ্রবণ করা যাক -

দেবেন্দ্রই দেব সেনাপতি
আর দিক্‌পাল সকলে
বন্দিছে অভয় পদ,
সুপ্রসন্ন হোয়া দয়াময়
দেবতা আশ্রিত তব অভয় পদর
দুরন্ত দানব সকলে,
দেবতাকে খেদি
অধিকার করিছে ত্রিদিব,
বিপদে বিপন্ন দেবতা
অভয় প্রদানি প্রভু
রক্ষা করা আশ্রিত জনক। (২১৫)

আরাধনার উক্তি শুনে মধুসূদনের ব্রহ্মা বলেন -

এ বারতা বৎসে, অবিদিত নহে,
সুন্দ উপসুন্দাসুর দৈব বলে বলী,
কঠোর তপস্যা ফলে অজেয় জগতে
কি অমর কিবা নর সমরে দুর্ব্বার
দোঁহে। ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি
নির্ব্বারিতে এ দানব দুয়। (তৃতীয় সর্গ)

বর্‌ুয়ার ব্রহ্মাও বলেন -

সুবিদিত সকলো সম্বাদ মোর
সুবিদিত অমরর মনর কামনা
সুন্দ উপসুন্দ দুয়ো
কঠোর তপস্যা করি
অজেয় অবধ্য জগতত
ভ্রাতৃভেদ বিনে
কদাপি নহয় মৃত্যু , বিধির বিধান ।
জনালো সংকেত
যোয়া দেবদল
ভায়ে ভায়ে বিরোধ প্রটোয়া ।   (২।৫)

বর্‌ুয়ার 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের কায়াগঠন কৌশল 'নল-দময়ন্তী' প্রমুখ বাংলা নাটকের মতই বলা যায় । সংলাপ গদ্য , পদ্য ও গৈরিশ ছন্দ মিশ্রিত । বাংলা পৌরাণিক নাটকে যেমন গীতাধিক্য পরিলক্ষিত হয় (যেমন - 'নল - দময়ন্তী ') তা এই নাটকেও বিদ্যমান ।

চন্দ্রধর বর্‌ুয়ার 'রাজর্ষি'র (১৯৩৭) হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে আহৃত হয়েছে । কৃত্তিবাসী রামায়ণের কালুচরিত্র চন্দ্রধরের এই নাটকেও আছে । তবে এই কালুর সংলাপ হিন্দিতে । অমিত্রাক্ষর ছন্দ এই নাটকেও বিদ্যমান ।

চন্দ্রধর বর্‌ুয়ার নিম্নোক্ত নাটক কয়টির রচনা কাল আমাদের আলোচনার সময়-পরিধিতে পড়েনা , তবু তাদের বিষয়বস্তু আলোচ্যযুগের (১৯৬৩) সঙ্গে সম্পর্কিত বলে এখানে সামান্য উল্লেখ করা গেল । বর্‌ুয়ার 'মোগল বিজয়'(১৯৬৩) ঐতিহাসিক নাটকটির সংলাপ পদ্যে । 'দর্শনে'র পরিবর্তে এখানেও পাই 'দৃশ্য' । বর্‌ুয়ার 'অহোম সন্ধ্যা' (১৯৬৩) নাটকটির নাম রমেশচন্দ্র দত্তের 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' উপন্যাসটির নামকে স্মরণ করিয়ে দেয় । রমেশ চন্দ্রের উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে রাজপুত গৌরব সূর্য অস্তমিত হওয়ার কাহিনী , 'অহোম সন্ধ্যা'য় বর্ণিত হয়েছে

আহোম গৌরব সূর্য অস্তমিত হওয়ার কাহিনী । এখানেও সংলাপ গদ্য । 'দর্শন'র পরিবর্তে 'দৃশ' ব্যবহৃত হয়েছে ।

বরুয়ার 'বিয়াবিলৈ' (প্রকাশকাল ১৯৭৫) একটি প্রহসন । এতে এক বৃদ্ধ একজন তরুণীকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক । সেই বিবাহ পণ্ড হয় এবং তরুণীর সঙ্গে বিবাহ হয় এক তরুণের । নাম জয়ন্ত । এই প্রহসনটি বাংলা সাহিত্যের একটি বিখ্যাত প্রহসন দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'কে স্মরণ করিয়ে দেয় । সেখানেও এক বিবাহোন্মত্ত বৃদ্ধের তরুণী - বিবাহের লালসা পণ্ড করে দেয় পাড়ার যুবকরা, তবে সেখানে পাত্রী সাজানো হয়েছিল একটি ছেলেকে ।

দুর্গেশ্বর শর্মা

দুর্গেশ্বর শর্মার (১৮৮৫ - ১৯৬১) জন্ম যোরহাট । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন যজ্ঞে যেসব অসমীয়া তরুণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন শর্মা তাঁদের অন্যতম । গুণ অনুসারে নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে চন্দ্রধরের পরেই শর্মার স্থান । তাঁর 'পার্থ - পরাজয়'র (১৯০৬) কাহিনী মূলতঃ 'জৈমিনী ভারতের' হলেও নাট্যকার সম্ভবতঃ কাশীদাসী মহাভারত থেকেই নাটকটির কথাবস্তু গ্রহণ করেছেন । জৈমিনী ভারতের অশ্বমেধ পর্বে পুত্র বভ্রুবাহনের হস্তে পিতা অর্জুনের পরাজয় ও মূর্ছা যাওয়া বর্ণিত হয়েছে । অসমীয়া পদ পুঁথি ও কাশীদাসী মহাভারতে অর্জুনের মৃত্যু এবং নাগলোক থেকে বভ্রুবাহন সঞ্জীবনী মনি x এনে অর্জুনকে পুনরায় সঞ্জীবিত করেছে বলে বর্ণিত হয়েছে । গঙ্গাদেবীর প্রতিশোধ প্রবৃত্তিকে এই নাটকের ঘটনা বিকাশের প্রধান কারণরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে । অর্জুন অন্যায়ভাবে ভীষ্মকে শর শয্যায় ফেলেন ।

ফলে ভীষ্ম জননী গঙ্গাদেবী পুত্র হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত বভ্রুবাহনকে সর্বপ্রকার সহায়তা করে। বভ্রুবাহন অর্জুন বধে সমর্থ হয়। পরে অবশ্য বভ্রুবাহনই পিতাকে পুনর্জীবিত করে। পান্ডবের অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন, যজ্ঞীয় অশ্বের মণিপুর প্রবেশ ও বন্ধন, অর্জুনকে পিতৃবোধে বভ্রুবাহনের প্রণাম ও অপমান, উলূপী, চিত্রাঙ্গদা ও প্রভাবতী কর্তৃক অনুপ্রেরিত হয়ে অর্জুনের বিরুদ্ধে বভ্রুবাহনের যুদ্ধযাত্রা, গঙ্গার সহযোগিতায় বভ্রুবাহন কর্তৃক অর্জুন ও বৃষকেতু বধ, যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণের উপস্থিতি, সঞ্জীবনী আনয়নের জন্য বভ্রুবাহন ও কৃষ্ণের পাতাল যাত্রা, গঙ্গার প্রতিবন্ধকতা, গঙ্গা কর্তৃক অর্জুনের ছিন্ন মুন্ড অপহরণ, কৃষ্ণের সহায়ে পুনর্প্রাপ্তি, মৃত বীরদ্বয়ের পুনর্জীবন লাভ, পিতা ও পুত্রের মিলন - এই নাটকের প্রধান ঘটনা। এইসব ঘটনা কাশীদাসী মহাভারতে দৃষ্ট হয়। বাংলা মহাভারতে 'পুন্ডরীক' নামে একটি চরিত্র আছে। পুন্ডরীক নাগশিশু। শর্মার নাটকে সে বভ্রুবাহনের ভৃত্য। [illegible] ডঃ হরিচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা উভয়েই এই নাটকে কাশীদাসী মহাভারতের প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছেন।[১২] এতদ্‌ব্যতীত বভ্রুবাহনের চরিত্রের সাহস, বীরত্ব, মাতৃভক্তি, স্বদেশপ্রীতি মধুসূদনের মেঘনাদকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রভাবতী চরিত্র শর্মার মৌলিক সৃষ্টি। প্রভাবতী বভ্রু বাহনের পত্নী। এই চরিত্র প্রমীলার অনুরূপ। ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মাও তা স্বীকার করেছেন।[১৩] 'পার্থ-পরাজয়' নাটকের অন্ধমালিনীর [illegible] চরিত্রটি বড় মনোরম। এই চরিত্রটি বঙ্কিমের 'রজনী' (১৮৭৭) উপন্যাসের রজনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নানা জটিল ও রহস্যময় ঘটনার মধ্য দিয়ে নায়ক শচীশ ও অন্ধ রজনীর বিবাহ হয়। তারপর জনৈক মহাপুরুষের দয়ায় তার দৃষ্টি লাভ হয়। শর্মার 'অন্ধমালিনী' বঙ্কিমের 'রজনী' ও ইংরেজ ঔপন্যাসিক লিটন রচিত দি লাস্ট ডেইজ অব্ পম্পি উপন্যাসের 'নিদিয়া' চরিত্রটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শর্মা অন্ধমালিনীর চরিত্র চিত্রণে সরাসরি উক্ত ইংরেজী উপন্যাস থেকে প্রেরণা পেতেও পারেন, তবে লিটন রচিত চরিত্রটির চাইতেও বঙ্কিমের 'রজনী' অনেক বেশী পরিচিত। বেজবরুয়া যুগে বঙ্কিমের উপন্যাস আসামে খুবই জনপ্রিয় ছিল। শর্মা বঙ্কিমের 'রজনী' পড়েছিলেন নিশ্চয়ই।

অম্বিকা গিরি রায় চৌধুরী

আনুমানিক ১৮৬০ সাল থেকেই বাংলা নাটক আসামে অভিনীত হতে থাকে। অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী মহাশয় (১৮৮৫ - ১৮৬৭) বাংলা নাটক সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। তাঁর 'জয়দ্রথ বধ' নাটকের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন - "সেই কলিত বরপেটা নগরত চারিটা যাত্রাদলে 'রাম বনবাস', 'সীতাহরণ', 'কীচক বধ', 'যুধিষ্ঠিরর অশ্বমেধ যজ্ঞ', 'নল দময়ন্তী' ইত্যাদি আদি বঙলা নাটকর যাত্রাভিনয় চলাই আছিল। যুকলি মত্তর বাবে নাটক যাত্রনাটি লিখার ধরন বুজি নবলৈকে বঙলী নাটক কেখন সমান মই গোটাই ললোঁ। কারণ, সেই সময়ত এই বিষয়ত মই একেবারে কেচা। অবশ্যে কিছু ভাবো বঙলা নাটকর পরা লোয়া হৈছিল। কারণ, তেতিয়া মোর সাহিত্য সৃষ্টি করাতকৈ বঙলা নাটকক খেদাহে প্রধান উদ্দেশ্য আছিল। ..... জন সাধারণর যুকলি মত্তর উপযোগী করি অমিত্রাক্ষর ছন্দত লিখিবলৈ আরম্ভ করিলোঁ ....।" সুতরাং রায় চৌধুরীর নাটকে বাংলা নাটকের প্রভাব যে থাকবে তা সহজেই অনুমেয়।

অম্বিকা গিরি রায় চোধুরী 'জয়দ্রথ বধ' নাটক রচনা করেন xxxxx আনুমানিক ১৯১১ সালে, প্রকাশ করেন ১৯৬১ সালে। গিরিশ চন্দ্রের 'নল দময়ন্তী'র মত 'জয়দ্রথ বধ' নাটকের প্রতিটি অংক গর্ভাংকে বিন্যস্ত। ভাঙা অমিত্রাক্ষর বা গৈরিশ ছন্দ এই নাটকেও বিদ্যমান। প্রতিটি গীতের সুরের নাম দেওয়া হয়েছে। একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি --

ছোকরার গীত

(রাগিনী দেশমল্লার বরগীত - অলকাপ)

কিদরে সুখির করোঁ অখির পরাণ
থাকি থাকি বাজে শোক - বেদনার তান।
প্র্যার পুতলা মোর অভিমন্যু ধন
অন্যায় রণত পরি হেরালে জীবন ,-
রাজ্যর লোভত মই হেরুয়াই জ্ঞান
রণত পঠাই তার নাশিলো পরাণ ।
নসহে প্রাণত আরু শোকানল জর
নো খোজোঁ বাঁচিবলৈ এই শোকভার ।   (১।২)

সংলাপ গদ্য-পদ্য মিশ্রিত , বিশেষ করে সাধারণ মানুষের সংলাপ গদ্যে । সংলাপ ভক্তিরসাত্মকও বটে । এই এ সবই গিরিশের 'নলদময়ন্তী'কে স্মরণ করিয়ে দেয় । মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য'কে গিরিশচন্দ্র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন । ১৯০৪ সালে চন্দ্রধর বরুয়া গৈরিশ ছন্দে 'মেঘনাদ বধ' নাটক রচনা করেন । এই নাটকের সঙ্গে রায়চৌধুরী মহাশয় পরিচিত ছিলেন। কারন রায়চৌধুরী মহাশয় বরপেটার একটি যাত্রাদলকে বাংলার পরিবর্তে অসমীয়া যাত্রা করার জন্য দুইটি অসমীয়া নাটক এনে দিয়েছিলেন । 'মেঘনাদ বধ' নাটকটি তার মধ্যে একটি ।

নবীন চন্দ্র বরদলৈ

নবীনচন্দ্র বরদলৈর 'গৃহলক্ষ্মী' নাটকটির প্রকাশ কাল ১৯২১ সাল। এটি ডঃ মহেশ্বর নেওগর মতে মদ্যপান সমস্যার প্রথম সামাজিক নাটক।[14] নায়ক হরিচরণ ধনীগৃহের শিক্ষিত মদ্যপ যুবক, তাঁর স্ত্রী গোলাপী পতিব্রতা নারী। হরিচরণ অসৎসঙ্গে মিশে মদ্যপান করে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে এবং তিন দিন হাজত বাস করে। শেষে স্ত্রী গোলাপী নিজের গায়ের গহনা দিয়ে স্বামীকে মুক্ত করে। এই নাটকটি পড়তে-পড়তে গিরিশ চন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকটির কথা মনে জাগে। যোগেশ চন্দ্র মদ্যপ, কিন্তু চরিত্রহীন নয়, হরিচরণ মদ্যপ এবং চরিত্রহীন। যোগেশ ঘড়ি আর ঘড়ির চেন বন্ধক দিয়ে মদ খেয়েছেন, হরিচরণ খেয়েছে বাড়ি বন্ধক রেখে। যোগেশের ভ্রাতা রমেশ ধরিবাজ লোক। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য করতে পারেনা হেন কর্ম নেই। তার সঙ্গে এসে জুটেছে কাঞ্চনীচরণ আর তার পত্নী জগমণি। বরদলৈর নাটকে রমেশের ভূমিকা নিয়েছে হীরালাল, জগমণির ভূমিকা নিয়েছে বিমলা,- উভয়েরই লক্ষ্য অর্থপ্রাপ্তি তথা স্বার্থ সিদ্ধি। হীরালাল ও বিমলা - এদের হৃদয় বলে কিছু নেই, উভয়েই অর্থ পিশাচ। হরিচরণ হীরালালকে ৪০০০, টাকা দিয়েছেন, বিমলাকে দিয়েছেন ৫০০০, টাকা। এতেও তারা সন্তুষ্ট নয়, তাদের দৃষ্টি আরো অধিক প্রাপ্তির দিকে। হরিচরণ মদ্যপ, চরিত্রহীন। যোগেশ ব্যতীত হরিচরণ চরিত্রে আরো দুটি চরিত্রের প্রভাব আছে বলে মনে হয়। এই চরিত্র দুটি হল 'প্রফুল্ল'র শিবনাথ ও ভজহরি। দুটি চরিত্রই কুসঙ্গে পতিত হয়েছে। শিবনাথ পতনের কুরুতেই রক্ষা পেয়েছে, ভজহরি অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে তারপর ফিরে আসতে চেষ্টা করেছে। হরিচরণও কুসঙ্গে পড়েছে। ভজহরির মত অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে তারপর ফিরে আসতে চেষ্টা করেছে। 'প্রফুল্ল' নাটকের নায়িকা প্রফুল্ল। সুরেশের ভাষায় প্রফুল্ল

সাক্ষাৎ লক্ষ্মী !"যার মুখ দেখলে প্রাণ শীতল হয়, যার সরলতার তুলনা হয় না, যার মিষ্ট কথা শুনলে আমারও প্রাণ নরম হয় .....!" (২১০) অরণ্যজাত অম্লান কুসুমের মত প্রফুল্ল। সংসারের ধূলি মালিন্য তার অঙ্গ স্পর্শ করে নাই। গৃহলক্ষ্মীর মাধুর্য, সরলতা, প্রেম, সহনশীলতা, আত্মদানের সুমহৎআদর্শমণ্ডিত ভারতীয় বধূ চরিত্র হলো প্রফুল্ল। রমেশ তার এই স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করেছে। প্রফুল্লর সব কটি গুণ 'গৃহলক্ষ্মী'র সোনালীর মধ্যে বিদ্যমান। তাইতো বরদলৈর তাঁর নাটকের নাম রেখেছেন 'গৃহলক্ষ্মী'। ইচ্ছা করলে নাট্যকার নাটকটির নাম 'সোনালী'ও রাখতে পারতেন, যেমন - 'প্রফুল্ল'। হরিচরণের মা যোগেশের মাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। উভয়ে সরল-চিত্ত, সন্তানের উপর তাঁদের অগাধ স্নেহ, সন্তানের বিপদে উভয়েই বিহ্বলা। অপরের নিষ্ঠুর পরিহাসে যোগেশ মাতাল হয়ে পীতাম্বরের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এই মাথা ফাটানোর দৃশ্য 'গৃহলক্ষ্মী' নাটকেও আছে। হরিচরণ সুবল নামক জনৈক ভদ্রলোকের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। 'প্রফুল্লে'র পীতাম্বর যোগেশের হিতৈষী। 'গৃহলক্ষ্মী'র সুবলও হরিচরণের হিতৈষী। সে প্রস্তুত হয়ে আদালতে বিচার প্রার্থী হয়েছে, আবার হরিচরণ অনুতপ্ত হলে সুবল মামলা তুলে নিয়েছে (২১১)। সুবল চরিত্রে পীতাম্বরের দূরপ্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। 'প্রফুল্ল' নাটকে বাড়ি বিক্রয় প্রসঙ্গ আছে, 'গৃহলক্ষ্মী' নাটকে আছে বাড়ি বন্ধক রাখার প্রসঙ্গ। গিরিশচন্দ্রের নাটকে প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষের চরিত্র থাকে। 'প্রফুল্ল' নাটকে মদন ঘোষ এই জাতীয় চরিত্র। (যদিও তার দলিল চুরি, যাদবকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ - মহাপুরুষোচিত নয়)। 'গৃহলক্ষ্মী'তে এই জাতীয় চরিত্র প্রভাকর, হরিচরণের পিতৃবন্ধু। প্রফুল্ল নাটকে ইনস্পেকটর, জমাদার, পুলিস আছে। 'গৃহলক্ষ্মী' নাটকেও জমাদার, 'কনিস্টবল' আছে। সরকারী কর্মচারীর উৎকোচ গ্রহণ প্রসঙ্গ উভয় নাটকেই আছে। গৃহলক্ষ্মী নাটকের জমাদার পাঁচ টাকা উৎকোচ নিয়েছিল। (২১২)।

প্রফুল্ল নাটক দেখি, টাকার বিনিময়ে কারাগারে যা খুশি করা সম্ভব।

প্রফুল্ল শাশুড়ীর প্রিয় ছিল, গোলাপীও শাশুড়ীর প্রিয়। গিরিশ চন্দ্রের সব নাটকেই গানের প্রাচুর্য দেখা যায়। তুলনামূলক ভাবে প্রফুল্ল নাটকে গানের সংখ্যা কম। গৃহলক্ষ্মী নাটকে গীত একেবারে কম বলা যাবে না। প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্যেই তিনটি গীত আছে। যা হোক - একথা সুনিশ্চিত যে 'গৃহলক্ষ্মী' রচনায় গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকটির দ্বারা বরদলৈ যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছেন। 'প্রফুল্ল' দীর্ঘকাল মঞ্চসফল নাটকরূপে খ্যাত ছিল। এতদ্ব্যতীত 'গৃহলক্ষ্মী' নাটকের 'বিমলা' নামটিও বঙ্কিমস্মৃতি বিজড়িত। বরদলৈ এই নাটক 'দুর্গেশনন্দিনী' গ্রন্থটির কথা একবার উল্লেখও করেছেন। (১১৩)। হতে পারে বিমলা নামটি তিনি দুর্গেশনন্দিনী থেকে নিয়েছেন। বরদলৈর 'কৃষ্ণলীলা' (১৯৩৩) পৌরাণিক নাটক। এটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। গিরিশচন্দ্রের নাটকের মতো এই নাটকেও প্রচুর গীত দৃষ্ট হয়।

ঘনকান্ত বরুয়া

নবীনচন্দ্র বরদলৈর 'গৃহলক্ষ্মী'র সঙ্গে আরো একটি সামাজিক নাটকের নাম বলতে হয়। সেটি হল 'উষা'। নাট্যকার ঘনকান্ত বরুয়া। গৃহলক্ষ্মীতে গোলাপী মদ্যপ স্বামী ও স্বেচ্ছাপ্রসূত পরিবারকে রক্ষা করেছে - সেজন্য তাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। 'উষা' নাটকে কিন্তু সুমিত্রা একটি সংসারকে ধ্বংস করেছে। 'উষা' নাটকের কাহিনী তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাংলা স্বর্ণলতা (১৮৭৪) উপন্যাসের অনুরূপ। এই উপন্যাসটির লেখকের জীবদ্দশাতেই সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমের জনপ্রিয় উপন্যাসেরও

এত কাট্‌তি ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, 'স্বর্ণলতার' নাট্যরূপ 'সরলা' একদা কলকাতা ও কলকাতার বাইরে বিভিন্ন স্থানে শত শত রজনী ধরে অভিনীত হয়ে দর্শককে করুণ রসে আপ্লুত করেছিল। আসামেও এর জনপ্রিয়তা স্বাভাবিক। সুতরাং এই করুণ রসাত্মক সামাজিক উপন্যাসটির কাহিনী ঘনকান্ত বরুয়াকে আকৃষ্ট করেছিল বলা চলে।

'স্বর্ণলতা' উপন্যাসটির কাহিনী দুটি সুস্পষ্ট বিভাগে বিভক্ত। বিধুভূষণের পত্নী সরলার মৃত্যুর পর প্রথম বিভাগ সমাপ্ত। দুই ভাইয়ের একান্নবর্তী পরিবার। বড়ভাই শশীভূষণ উপার্জনশীল। ছোটভাই বিধুভূষণ সপরিবারে বড় ভাইয়ের উপর নির্ভরশীল। বড়ভাইয়ের স্ত্রী প্রমদা রাণীর হালে থাকেন। তিনি ছোটভাই ও ছোটভাইয়ের বউকে বাক্যবাণে জর্জরিত করেন। বাক্যবাণে জর্জরিত বিধুভূষণের উপার্জনের আশায় কলকাতা যাত্রা, পথে নীলকমলকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া, মুদীর দোকানে রাত্রি যাপনের কৌতুককর অভিজ্ঞতা, কলকাতা xxx সম্পর্কে xxx গেঁয়ো নীলকমলের হাস্যকর আচরণ, কালীঘাট মন্দিরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, শেষ পর্যন্ত দুইজনের বিচ্ছেদ, যাত্রার দলে বিধুভূষণের যোগদান, উপার্জনের টাকা বাড়ীতে প্রেরণ, খল অথচ বোকা গদাধরের সে টাকা আত্মসাৎ করা, দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে সরলার মৃত্যু, শ্যামা ঝির উদার চরিত্র ও পরার্থপরতা এই উপন্যাসে সুনিপুণ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। স্বর্ণলতার শেষাংশে প্রেম কাহিনী রয়েছে। কলকাতায় গোপালের দারিদ্র্যপূর্ণ জীবন, সহপাঠী হেমচন্দ্রের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব, হেমচন্দ্রের ভগিনী স্বর্ণলতার সঙ্গে তার পরিচয় ও প্রণয়, হেমচন্দ্রের ব্যাধি, xxx পুরু শশাঙ্কশেখরের শঠতা এবং পরিশেষে সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে স্বর্ণলতার সঙ্গে গোপালের পরিণয় ও সুখময় দাম্পত্য জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ বর্ণিত হয়েছে। 'সরলা' নাটকে উপন্যাসের কাহিনীর প্রথম বিভাগটুকু নেওয়া হয়েছে। 'সরলা' নাটকের সঙ্গে ঘনকান্ত বরুয়ার 'উষা'র সাদৃশ্য রয়েছে।

বরুয়ার যোতদার লক্ষীকান্ত স্ত্রী সুমিত্রার কথামত ভাই দেবকান্তকে পৃথক করে দেন। 'সুর্ণলতা'র শশিভূষণের স্ত্রী ও দেবর বিধুভূষণ ও তার স্ত্রী সরলার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। দেবকান্ত নিরুপায় হয়ে পত্নী উমা ও পুত্র কমলকে ছেড়ে নগরে কর্মের সন্ধানে যায় এবং চাকরী পেয়ে বাড়ীতে নিয়মিত টাকা পাঠায়। সে টাকা সুমিত্রার প্ররোচনামত ভাই গোবর্ধন কমলের সই জাল করে আত্মসাৎ করে। 'সুর্ণলতা'র বিধুভূষণও বৌদির ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে কলকাতা যায় এবং চাকরী পেয়ে মাসে মাসে টাকা পাঠায়, সে টাকা গদাধর আত্মসাৎ করে। অর্থাভাবে সরলা ও তার পুত্র গোপাল কষ্ট পায়। কষ্ট পায় 'উমা' নাটকের উমা ও কমল। গোবর্ধনের জালিয়াতিও ধরা পড়ে এবং সে জেলে যায়। উমার মৃত্যু হয়েছে, সরলারও মৃত্যু হয়েছে। সরলা পতিপ্রাণা, উমাও পতিপ্রাণা। লক্ষীকান্ত সর্বস্বান্ত হয়েছে, সর্বস্বান্ত শশিভূষণও হয়েছে। এক কথায় বরুয়ার লক্ষীকান্ত, সুমিত্রা, দেবকান্ত, উমা, কমল, গোবর্ধন যথাক্রমে 'সুর্ণলতা'র শশিভূষণ, শশিভূষণের স্ত্রী প্রমদা, বিধুভূষণ, সরলা, গোপাল ও গদাধর। 'সুর্ণলতা'য় বর্ণিত হয়েছে একটি নারী কেমন করে একটি সংসারকে নষ্ট করেছিল (প্রথম ভাগে)। বরুয়ার 'উমা'তেও একটি নারী একটি সংসারকে কিভাবে নষ্ট করেছিল, তা বর্ণিত হয়েছে। উভয় নাটকের কাহিনীর ও বক্তব্যের সাদৃশ্য একান্ত লক্ষণীয়। উভয় নাটকেই দেখানো হয়েছে, যৌথ পরিবারের যুগে নারী যেমন সংসারকে নষ্ট করেছে তেমনি ধরেও রেখেছে।

অতুল চন্দ্র হাজরিকা

অসমীয়া নাট্য সাহিত্যে অতুলচন্দ্র হাজরিকা (১৯০৬)একটি বিশিষ্ট নাম। হাজরিকা তাঁর 'নরকাসুর' (১৯৩০), 'নন্দদুলাল' (১৯৩০), 'সাবিত্রী' (১৯৩১) ইত্যাদি নাটকে অত্র অমিত্রাক্ষর তথা গৈরিশ ছন্দ প্রয়োগ করেছেন।

হাজরিকার 'বেউলা' পঞ্চাংক নাটক। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। ১৯২৯ সালে 'অবাহন' পত্রিকায় নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই নাটকের আখ্যানভাগ 'পদ্মপুরাণ' থেকে গৃহীত। নাট্যকার তারানাথ চক্রবর্তী প্রণীত 'বেউলা' থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

'দাতাকর্ণ' (১৯২৯) একাংকিকা, অমিত্রাক্ষর ছন্দবন্ধ। হাজরিকার 'শ্রী রামচন্দ্র' ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই নাটক প্রসঙ্গে ডঃ হরিচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন - "নাট্যকারে পাতনিত কোয়ামতে 'শ্রী রামচন্দ্র'র কাহিনী বিন্যাসে মাধব কন্দলী রামায়ণর অনুকরণ করা হৈছে। কিন্তু দুই এঠাইত ইয়ার অন্যথাও চকুত পরে। চন্দ্রধর বরুয়ার 'মেঘনাদ বধ' (১৯০৪) নাট তথা মাইকেল মধুসূদন দত্তর 'মেঘনাদ বধ' কাব্যর' ছাঁ উপলব্ধি হয়।"[১৫]

মধুসূদনের মেঘনাদ এবং চন্দ্রধর বরুয়ার মেঘনাদ মৃত্যু ভয়ে ভীত নয়। শংকর প্রমুখ দেবতা মেঘনাদের বিপক্ষে দাঁড়ালে চন্দ্রধরের মেঘনাদ বলেছিল "মেঘনাদ মই, মৃত্যুকে ন করো ভয়।" অনুরূপ উক্তি হাজরিকার মেঘনাদের মুখ থেকেও নিঃসরিত হয়েছে। যেমন - "মৃত্যুর ভয়ত মেঘনাদ ন হয় কাতর"। রামলক্ষ্মণের বিরুদ্ধে মধুসূদনের মত হাজরিকাও কুবিশেষণ (অধম, দুর্মতি, নরাধম, কাপুরুষ ইত্যাদি) প্রয়োগ করেছেন। ('শ্রী রামচন্দ্র' ৪।৬) ক্ষুদ্র বালক তরণীসেন দেশপ্রেমের জ্বলন্ত প্রতীক। এই চরিত্র কন্দলি রামায়ণের নয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুরূপ। তরণীসেনে দেশপ্রেম আরোপ মধুসূদনের মেঘনাদ চরিত্রের প্রভাব বলে মনে হয়।

হাজরিকার নাটকে গদ্যের থেকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ বেশী করে পরিলক্ষিত হয়। কাব্যিক ও আলঙ্কারিক ভাষা প্রয়োগের প্রতি নাট্যকারের লক্ষ্য বেশী। এই প্রসঙ্গে তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে তুলনীয়। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে যেমন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রকে ছাপিয়ে কবি দ্বিজেন্দ্রর সাক্ষাৎ প্রায়শঃই মিলে, তেমনি হাজরিকার নাটকেও আমরা কবি হাজরিকাকে দেখতে পাই বেশী।

'বেউলা'র (১৯৩৩) চন্দ্রধর দেশপ্রেমিক। লঙ্কেশ চন্দ্রকেতু তাঁকে মনসাপূজা করতে জোর করলে তিনি বলেন - "কামরূপের বণিক সন্তান এই চন্দ্রধর।"

'শ্রীরামচন্দ্র' (১৯৩৮) নাটকের চতুর্থ অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে মেঘনাদ-বিভীষণের সংলাপ 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র মেঘনাদ - বিভীষণের সংলাপকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'শ্রীরামচন্দ্র' নাটকটির কিছু সংলাপ উদ্ধৃত করছি --

বিভীষণ - ধ্বংস হব লংকা আজি নিজর দোষত সেই বাবে
বিভীষণ সম্পূর্ণ নির্দোষ ধর্ম মই অবশ্যে পালিম।

মেঘনাদ - নলবা ধর্মর নাম,
যিধর্মই স্বদেশর সুপুত্রর দ্বারা
বিদেশীর পদসেবা করে সমর্থন
সেই ধর্ম যায় যেন রসাতলে।
জননী জন্মভূমি লংকার সেবাই
একমাত্র মহা ধর্মবুলি
বেদবাণী বুলি মানে লঙ্কার সন্তানে
কোনো ধর্ম আতকৈ নহয় ডাঙর। ...
জাতিদ্রোহী ~~করিছা নিজর~~ জাতিদ্রোহী দেশদ্রোহী হৈ
সর্বনাশ করিছা নিজর
সর্বনাশ করিছা দেশর --

অতুলচন্দ্র এখানে রাম-লক্ষ্মণকে বিদেশী আক্রমণকারীরূপে দেখেছেন ।

এইবার 'মেঘনাদ বধ কাব্য'র ৬ষ্ঠ সর্গ থেকে অনুরূপ অংশ উদ্ধৃত করে সাদৃশ্য দেখাচ্ছি -

(মেঘনাদের উক্তি বিভীষণের প্রতি)

তবজন্মপুরে, তাত পদার্পণ করে
বনবাসী । *** *** ***
কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি - ভ্রাতৃ পুত্র তব ?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?

(মেঘনাদের উক্তির উত্তরে বিভীষণ)

নাহি দোষী আমি, বৎস, বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি, নিজ কর্মদোষে, হায় মজাইলা
এ কনক লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি । ...
রুষিলা বাসবত্রাস ....
কহিলা বীরেন্দ্র বলী, ধর্মপথ-গামী
হে রাক্ষসানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি, - কোন্ ধর্মমতে কহ দাসে, শুনি
জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব জাতি - এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃপর সদা ।
এ শিক্ষা হে রক্ষোবর কোথায় শিখিলে ?

হাজরিকার 'কুরুক্ষেত্র' (১৯৩৬) নাটকে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন -

স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র হল সমাপন
আজি ধ্বংস মহাভারতত
প্রজাতন্ত্র হব আরম্ভন ।
যুধিষ্ঠির রজা মই প্রজার সেবক
প্রজার আশীষ লই পালিম প্রজাক
কিন্তু তুমি যদুপতি ।
রজা প্রজা সবারে নায়ক
ভারতর জনগণ 'নর নারায়ণ'
তুমিয়ে সারথি হই চলাবা পুনর ।   (৫।৩)

এতে যে সমসাময়িক রাজনীতিক ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছে তা বঙ্গ সাহিত্যেই প্রথম পরিলক্ষিত হয় । নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক - কুরুক্ষেত্র - প্রভাস' এই কাব্যত্রয়ীতে শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ রাজনৈতিক চিন্তার পরিচয় আমরা পেয়েছি ।

হাজারিকার 'শ্রী রামচন্দ্র'র (১৯৩৭) সরমা 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র সরমার মতই দয়ার্দ্রচিত্তা । তবে নাট্যকার এই চরিত্রে বীরত্বের যে প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তা' তাঁর মৌলিক সৃষ্টির পরিচায়ক ।

হাজারিকা 'নরকাসুর' (১৯৩০) নাটকে নরকাসুরকে অসুর বলে অবজ্ঞা করেন নাই । এই চরিত্রের প্রতি লেখকের সহানুভূতি সমুজ্জল । অসুরের প্রতি এই মনোভাবের উৎসও মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য' । মধুসূদনই আমাদেরকে রাবণ - মেঘনাদকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন ।

নকুল চন্দ্র ভূঞা

নকুল চন্দ্র ভূঞার (১৮৯৫ - ১৯৬৮) জন্ম শিবসাগর জেলার চারিঙে। রেল কোম্পানীর বৃত্তি নিয়ে তিনি ১৯২০ সালে কলকাতা যান টাইপ রাইটিং শর্টহ্যান্ড ও বুক কিপিং শিক্ষার জন্য। কলকাতা প্রবাসকালে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে আসামের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেছিলেন। তাঁর প্রথম নাটক 'জেরেঙার সতী' (১৯২৪) অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত একাঙ্ক নাটক। তাঁর 'স্বয়ংবরা' (১৯৩২) পৌরাণিক নাটক, নল-দময়ন্তীর প্রেম কথা এর উপজীব্য। স্মরণীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ আনুমানিক ১৮৮৩ সালে 'নল দময়ন্তী' রচনা করেন। 'নল-দময়ন্তী' বাংলা সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় নাটক। এই নল-দময়ন্তীই 'স্বয়ংবরা'র প্রেরণা উৎস হতে পারে।

'বদন বর ফুকন' (১৯২৭) ও 'চন্দ্রকান্ত সিংহ' (১৯৩১) ভূঞার দুটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক। উভয় নাটকের বিষয়বস্তু আহোম রাজত্বের অস্তাচল কাল। বদন বরফুকন আসামে মানদের আনয়ন করেন বলে নিন্দিত, যেমন বঙ্গে নিন্দিত মীরজাফর। সম-সাময়িক জাতীয় চেতনা উভয় নাটকেই বিদ্যমান। তবে 'চন্দ্রকান্ত সিংহে'র মধ্যেই তা বেশী প্রকট। নমুনা দেওয়া যাক, -

১। জগন্নাথ - মনত রাখিব, আপুনি
যি কামকে করক, সেই
কাম দেশর আরু প্রজার
মঙ্গলের নিমিত্তে হব লাগিব। (১।৩)

২। জগিম মোর জন্মভূমি বিপন্ন মোর
লক্ষ-লক্ষ অসমীয়া নর-নারী বিপন্ন
মোর চির স্বাধীন রাজ সিংহাসন
বিপন্ন। আরু ভাবিবর সময় নাই।

২। জন্ম - জননী জন্মভূমির আগত, জগতর
সকলোয়েই মিছা। (৪১৩)।

'চন্দ্রকান্ত সিংহ' নাটকের 'রাজমাও' একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহিলা। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্তের' 'মুরা' চরিত্রটিকে। উভয়েই পুত্রের কল্যাণ চান, উভয়েরই ইচ্ছা পুত্রের সিংহাসন নিষ্কণ্টক হোক। এই নাটকে বহু গীত সন্নিবিষ্ট হয়েছে - যা গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্র-লাল প্রমুখ নাট্যকারদের নাটকেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য।

প্রসন্ন লাল চৌধুরী

প্রসন্নলাল চৌধুরী (১১০২) মহাশয় দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করে অবসর গ্রহণ করেন। কেবল নাট্যসাহিত্য নয়, নাট্যকলার প্রতিও তাঁর অপরিসীম আগ্রহ ছিল। তিনি রঙ্গমঞ্চে নারী ও পুরুষ উভয় ভূমিকায় পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। চৌধুরীর 'নীলাম্বর' নাটকটির রচনা কাল ১১২১ সাল, কিন্তু প্রকাশিত হয় ১১৩৩ সালে। এই নাটক সম্পর্কে ডঃ হরিচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন - "নীলাম্বর'র ওপরত সেক্সপিয়রের 'ওথেলো' আরু দ্বিজেন্দ্রলালর 'চন্দ্রগুপ্ত'র ছাঁ (ছায়া) কিছু পরিছে। 'ওথেলো'র ইয়াগোর চরিত্র সৈতে নন্দর চরিত্রর আলেখিনি সাদৃশ্য স্পষ্ট।[১৬] নীলাম্বরের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করছি - পালবংশের শেষ রাজা সুবাহুর রাণী নিঃসন্তান ছিলেন। নন্দর পিতামহ সুবাহুর উপপত্নীর সন্তান। সুবাহুর মৃত্যুর পরও xxxxxxxxx উত্তরাধিকারী নিয়ে কলহ। (স্মরণীয় ইংলন্ডে দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পরও অনুরূপ সমস্যার উদ্ভব হয়)। রাজপুত্রের অভাবে নন্দর পিতামহ রাজ্য দাবী করেন। তিনি উপপত্নীর সন্তান - তাই তাঁকে জারজ আখ্যা দিয়ে অযোগ্য বলে স্থির করা হল। পরে এক রাখাল বালককে

রাজা করা হল। তার নাম নীলাম্বর। সঙ্গে সঙ্গে নন্দর পিতামহকে হত্যা করা হল। উপযুক্ত বয়সে নন্দ - 'নীলাম্বরের' বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। নীলাম্ব-রের বৃদ্ধ মন্ত্রীর নাম শচীপাত্র। কথিত আছে যে নন্দর পিতামহকে সেন বংশের প্রতিপালক ব্রাহ্মণ বংশের চক্রান্তে হত্যা করা হয়। হত্যাকারী স্বয়ং শচীপাত্রের পিতা। মৃত্যুকালে নন্দর পিতা বলে গিয়েছেন ব্রাহ্মণ বংশের উপর যথোচিত প্রতিশোধ নিতে। নন্দ পিতৃবাক্য বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সেই উদ্দেশে নন্দ ছদ্মবেশ নিয়ে নীলাম্বরের বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসেবে রাজান্তঃপুরে কার্য করতে থাকে। নন্দ রাজার কাছে অভিযোগ করে যে, রাণী চন্দ্রাবলীর সঙ্গে মন্ত্রী শচীপাত্রের পুত্র মনোহরের অবৈধ প্রণয় আছে। রাজা এই অভিযোগ বিশ্বাস করেন। এই অভিযোগে মনোহরকে হত্যা করে তাঁর মাংস শচীপাত্রকে খাওয়ানো হয়। শচীপাত্র সমস্ত ঘটনা বিদিত হয়ে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে গৌড়েশ্বর হুসেইন শাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গৌড়াধিপতি 'কমতাপুর' আক্রমণ করেন। নীলাম্বরকে হত্যা করা হল। রাণী চন্দ্রা ছদ্মবেশ ধারণ করে রাজাকে সাহায্য করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। মৃত্যুর পূর্বে রাজা বুঝতে পারলেন যে চন্দ্রা দোষরহিতা, এবং এই ষড়যন্ত্রের মূলে রয়েছে নন্দ। শচীপাত্রও শেষ মুহূর্তে গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারী নন্দের সমস্ত কথা জ্ঞাত হন এবং নন্দকে বধ করে নিজেও চিরদিনের জন্য মৃত্যু বরণ করেন।

নন্দ প্রতিহিংসার জ্বলন্ত প্রতীক। তার সর্বাঙ্গে "শিয়ালের বুদ্ধি, বাঘের লোলুপ দৃষ্টি, সাপের বিষ নিশ্বাস। তিরোতার ভ্রূণ-হত্যার বিভীষিকা।" সম্ভবতঃ এই নন্দর প্রতিহিংসার ভাষা দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত'র চাণক্যকে মনে করিয়ে দেয়। ধূর্ততার ব্যাপারে মনে করিয়ে দেয় ইয়াগোকে। সন্তানের মাংস পিতাকে খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে তার প্রতিহিংসার পরাকাষ্ঠা দেখানো হয়েছে। অরিস্টিস তার বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে। কীডের নাটকে থিরোনিমো তার ছেলের হত্যাকারীকে হত্যা করেছে। হ্যামলেট কাকাকে হত্যা করে

পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে। ওয়েবস্টারের কার্ডিনাল্ড তার বোনকে হত্যা করেছে পারিবারিক সম্মানের জন্য। কিন্তু পিতাকে সন্তানের মাংস দিয়ে ভোজ দেওয়া - এর চেয়ে জঘন্য প্রতিহিংসা আর হয় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য 'কোচবিহারের ইতিহাসে' অনুরূপ এক ঐতিহাসিক কাহিনী পাওয়া যায় যাকে ভিত্তি করে ১৮শ শতকে কবি রাধাকৃষ্ণ দাস বাংলায় 'গোসানী মঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন।[১৭] প্রসন্নলাল ঐ ইতিহাস বা বার্তা কাব্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন কি? নাট্যকার প্রতিহিংসামূলক ইংরেজী নাটকের দ্বারা বিশেষত সেকসপীয়র দ্বারাও প্রভাবিত হতে পারেন। অবশ্য সেই সাথে 'চন্দ্রগুপ্ত' - নাটকের চাণক্যের প্রভাবও পড়েছে। চাণক্য ছলে-বলে-কৌশলে নন্দবংশ ধ্বংসে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, চৌধুরীর নন্দও তদ্রুপ। নীলাম্বরের মাতা সুনীতি মুরার মতই পুত্রের হিতাকাঙ্ক্ষী। নন্দের বিশ্বাসী সহকর্মী চন্দকুমার 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের চন্দ্রকেতুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। চন্দ্রকেতু খুব বিশ্বাসী, চন্দ্রগুপ্ত তার প্রতি ভাল ব্যবহার করেন নাই, নন্দও তাই। কালীচরণকে দিয়ে নন্দ চন্দ্রকুমারকে হত্যা করেন। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চন্দ্রগুপ্তকে জারজ বলে তিরস্কার করা হয়েছে। [illegible] চৌধুরীর নাটকে নন্দের পিতামহকেও জারজ বলা হয়েছে। চন্দ্রগুপ্ত মগধরাজের অবৈধ সন্তান। 'নীলাম্বরের' নন্দের পিতামহও অবৈধ সন্তান। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্যের ক্ষত্রিয়ের উপর তথা নন্দবংশের উপর ক্রোধ, 'নীলাম্বর' নাটকের নন্দের ব্রাহ্মণের উপর তথা পালবংশের উপর ক্রোধ। মনোহরকে আজীবন পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে ললিতা। 'চন্দগুপ্তের' ছায়াও চন্দ্রগুপ্তকে ভালবেসে ব্যর্থ হয়েছে। শচীপাত্র নন্দকে তরবারি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। চাণক্যও নন্দকে হত্যা করেন, তবে অন্যকে দিয়ে। নীলাম্বর-গৃহে নন্দের অবস্থান আলেকজান্ডারের শিবিরে চন্দ্রগুপ্তের অবস্থানকে মনে করিয়ে দেয়, উভয়ের উদ্দেশ্য যদিও এক নয়। চন্দগুপ্তের ক্ষত্রিয়

বিদ্বেষ, সুন্দর ব্রাহ্মণ বিদ্বেষকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শচীপাত্রের নৃশংসতার মূলে রয়েছে পুত্রশোক, আর চাণক্যের নির্মমতার মূলে কন্যা ও পত্নী শোক (অবশ্য পরে তিনি এই কন্যা ফিরে পান)। 'চন্দ্রগুপ্তের' পাশে চাণক্য আর নীলাম্বরের পাশে শচীপাত্র। এ্যান্টিগোনাস দেশে যাবে, তার মনোবেদনা গ্রীক সৈন্যদের মুখের গানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। চৌধুরীর সৈন্যদলও গান গেয়েছে, তাতে মনোহরের বিরহব্যথা প্রকটিত হয়েছে। ('চন্দ্রগুপ্ত' - ৩।১, 'নীলাম্বর' - ১।১)।

আলোচিত—নাট্যকারগণ

নাম	পৃষ্ঠা
গুণাভিরাম বরুয়া	১৪৮
হেমচন্দ্র বরুয়া	১৫১
রুদ্ররাম বরদলৈ	১৫৪
পূর্ণকান্ত দেবশর্মা	১৫৫
দেবনাথ বরদলৈ	১৫৬
লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া	১৫৭
পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া	১৬২
বেণুধর রাজখোয়া	১৬৯
চন্দ্রধর বরুয়া	১৭১
দুর্গেশ্বর শর্মা	১৭৭
অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী	১৭৯
নবীন চন্দ্র বরদলৈ	২৮১
ঘনকান্ত বরুয়া	১৮৩
অতুল চন্দ্র হাজরিকা	১৮৬
নকুল চন্দ্র ভূঞা	১৯০
প্রসন্নলাল চৌধুরী	১৯১

- সূত্র নির্দেশ -

১। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যর জিলিঙনি - ডঃ শ্রী হরিচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ ১২২ - ২৬ ।

২। অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা - ডঃ মহেশ্বর নেওগ, পৃ ২১৮ ।

৩। Assamese Drama - Dr. Satyendranath Sarma, (1956)

৪। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড - ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৩য় সং (১৯৬৮) পৃ ১৮৯-২০৫ ।

৫। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যর জিলিঙনি - ডঃ শ্রী হরিচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ ১৪৩ ।

৬। 'রামনবমী নাটক' রায় বাহাদুর গুণাভিরাম বরুয়া রচিত - শ্রী যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত (১৯৬৫)।

৭। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যের জিলিঙনি - ডঃ শ্রীহরিচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ ১৩৬ ।

৮। - ঐ - - ঐ - পৃ ১৪৩ ।

৯। 'দ্বিজেন্দ্র লাল রায় ও আধুনিক অসমীয়া নাটক' - ডঃ জীবন চৌধুরী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ - আশ্বিন, ১৩৭৫ ।

১০। ভূমিকা - 'গোহাঞি বরুয়া রচনাবলী' - ডঃ মহেশ্বর নেওগ ।

১১। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যর জিলিঙনি - ডঃ শ্রী হরিচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ ২৫০ ।

১২। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যর জিলিঙনি - ডঃ শ্রী হরিচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ ২৭৩-৭৪, এবং অসমীয়া নাট্য সাহিত্য - ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা, পৃ ১৪৯ ।

১৩। অসমীয়া নাট্য সাহিত্য - ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা, পৃ ১৫১ ।

১৪। অসমীয়া সাহিত্যের রূপরেখা - ডঃ মহেশ্বর নেওগ, পৃ ৩০৪ ।

১৫। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যর জিলিঙনি - ডঃ শ্রী হরিচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ ৩৩১ ।

১৬। - ঐ - পৃ ৪০৭ ।

১৭। 'গোসানী মঙ্গল' - রাধাকৃষ্ণ দাস বিরচিত, শ্রী নৃপেন্দ্র নাথ পাল সম্পাদিত সংস্করণ ।

(গ) উপন্যাস

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা তাঁর 'অসমীয়া উপন্যাসর ভূমিকা' গ্রন্থে লিখেছেন - "আধুনিক ভারতীয় উপন্যাস - সাহিত্যর ভিতরত প্রথমেই নাম লব লাগিব বাঙলা উপন্যাসর। দরাচলতে উনবিংশ শতাব্দীর বঙলা সাহিত্যর উপন্যাসে বিশেষকৈ বঙ্কিম চন্দ্রর উপন্যাসে, ভারতর আন প্রান্তীয় সাহিত্যর উপন্যাস সৃষ্টিত আদর্শ যোগাইছিল। ভারতর সকলো প্রান্তীয় সাহিত্যতকৈ বঙলা সাহিত্য অধিক উন্নত।"[1]

১৮৪৪ সালে প্রথম যথার্থ বাংলা উপন্যাস বঙ্কিম চন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। আধুনিক অসমীয়া উপন্যাসের শুভ জয়যাত্রার সূচনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে, অর্থাৎ বঙ্গভাষায় উপন্যাস রচনার প্রায় তিরিশ বছর পর অসমীয়াতে উপন্যাস রচিত হয়। বঙ্গভাষার সাধক ও সেবকেরা এই তিরিশ বছরে বাংলা উপন্যাসকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। প্রতিবেশী রাজ্য আসামের সাহিত্যে তার প্রভাব অনিবার্য ভাবেই পড়েছে।

১৮৪৩ সালে আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারীগণ আসামে খৃষ্টধর্ম প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন, ১৮৪৬ সালে প্রকাশ করেন 'অরুণোদই' পত্রিকা। তাঁরা গদ্যে বহু tract বা ধর্ম প্রচার পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। অপরদিকে কলকাতার ক্রিশ্চিয়ান ট্রাক্ট অ্যান্ড বুক সোসাইটির উদ্যোগে হানা ক্যাথারিন ম্যুলেন্স নামে এক ক্রিশ্চিয়ান বিদেশিনী উত্তমরূপে বাংলা শিখে দেশী খৃষ্টানদের জন্য তাঁদের সমাজের ঘটনা অবলম্বনে 'ফুলমণি ও করুনার বিবরণ' রচনা করেন ১৮৫২ সালে। এই গ্রন্থটি একটি ইংরেজী আখ্যান The Last Day of the Week অবলম্বনে রচিত। ম্যুলেন্সের বাংলা গ্রন্থটি প্রকৃত অর্থে উপন্যাস নয়। 'আলালের ঘরের দুলাল'ই (১৮৫৮) বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস, রচয়িতা প্যারীচাঁদ মিত্র (ছদ্ম নাম টেকচাঁদ ঠাকুর)। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরন' অসমীয়াতেও অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন রেভারেন্ড গার্নির পত্নী। আসাম ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটির সঙ্গে বঙ্গদেশের শ্রী রামপুর মিশনারীদের ঘনিষ্ঠ যোগছিল। এতদব্যতীত 'এলোকেশী বেশ্যার কথা' এবং 'কামিনীকান্ত' ও বাংলা গ্রন্থের অসমীয়া

অনুবাদ বলে অনুমান করা হয় ।[২] 'কামিনীকান্তর নায়ক - নায়িকা বাঙালী , পটভূমি কলকাতা , রচিত হয়েছিল বাঙালী সমাজকে উদ্দেশ্য করে । 'এলোকেশী বেশ্যার নায়ক-নায়িকাও বাঙালী । পটভূমি কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল । 'ফুলমণি আর করুণা' দু'জন দেশীয় খৃষ্টান নারীর কাল্পনিক কাহিনী । উপরি উক্ত গ্রন্থ ত্রয় বাংলার গ্রাম্য জীবন, সুন্দর বাস্তব পরিবেশ, গ্রাম্য চরিত্রের অভিব্যক্তি, আচারনীতি , কুসংস্কারাদি 'জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে । বলা বাহুল্য এই সব গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ।

হেমচন্দ্র বরুয়া মহাশয় ১৮৭৬ সালে 'বাহিরে রংচং ভিতরে কোয়া ভাতুরী' প্রকাশ করেন । লেখককে সমাজের কুসংস্কার ভণ্ডামি ও দুর্নীতি ব্যথিত করেছে । সেই ব্যথাই এই ব্যঙ্গাত্মক কাহিনীর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে । বরুয়ার উদ্দেশ্য সমাজ সংস্কার , উপন্যাস রচনা নয় । একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে পূর্বে বাংলায় প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করেন, রচনা করেন 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত রাখার কী উপায়' (১৮৫৯) । তারও আগে ১৮২৩ সালে প্রমথ নাথ শর্মার 'নব বাবু বিলাস' প্রকাশিত হয় । প্রমথ নাথ শর্মা শ্রী ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্ম নাম । এই গ্রন্থে বাবু - জীবনের উচ্ছৃংখলতা ও অমিতাচার , খেয়ালি অস্থিরমতিত্ব , সৌজন্য ও সুরুচির অভাব , বাল্যকালে হিতকর শাসন - সংযমের অভাব ও পরিণামে দুর্গতি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে ।[৩] পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার কুফল ভবানীচরণ ও প্যারিচাঁদ মিত্রের উক্ত রচনা সমূহে দেখান হয়েছে । হেমচন্দ্র বরুয়ার উক্ত গ্রন্থটিতেও একই সুর ধ্বনিত হয়েছে । 'কোয়া ভাতুরী'র আট বছর পর পদ্মাবতী দেবী ফুকননীর 'সুধর্মার উপাখ্যান' (১৮৮৪) প্রকাশিত হয় । এই গ্রন্থের সত্যবান ও মাধব চন্দ্র দুই বন্ধু । সত্যবানের স্ত্রী সুধর্মা , মাধব চন্দ্রের স্ত্রী লীলাবতী । দুই বন্ধু বানিজ্য করতে বিদেশ যাবেন । সঙ্গে যাবে তাদের দুই স্ত্রী , যাবেন জলপথে নৌকা করে । ঝড় উঠল । ব্রহ্মপুত্রে নৌকাডুবি হল । লীলাবতী ও সুধর্মা কোনোরকমে প্রাণে বাঁচলেন ও এক আশ্রমে উঠলেন । এই আশ্রমে আসার পূর্বে এক ব্যাধ ও এক ধনী ব্যক্তি তাদের উপর বলাৎকার করতে চেয়েছিল , এক তপস্বী তাদের উদ্ধার করে তাঁর আশ্রমে আনয়ন করেন ।

খ্রীষ্টপূর্বে জনৈক মনোহর বরুয়ার উৎপীড়িতা পত্নী এই আশ্রমে এসেছেন। লেখিকার উদ্দেশ্য মানুষকে নীতিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। উক্ত নারীত্রয় ন্যায় ও ধর্মের পথে চলেছিল বলে রক্ষা পেয়েছে। এই গল্পে মুনি, মুনিকন্যা, আশ্রম, ব্যাধ ইত্যাদি রামায়ণ - মহাভারত ইত্যাদির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গিরিশ চন্দ্রের 'নলদময়ন্তী' ১৩০০ সালে (বাং) মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে দময়ন্তী ব্যাধ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল (৩।৩)। 'নলদময়ন্তী' প্রকাশিত হয় ইং ১৮৮০ সালে, আর 'সুধর্মার উপাখ্যান' প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে। ইতিমধ্যে বঙ্কিমের 'রাধারাণী' (১৮৮৬) ও 'সীতারাম' (১৮৮৭) ব্যতীত সবকটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, সুতরাং লেখিকা বঙ্কিমের উপন্যাসের সাথে পরিচিত ছিলেন এমন অনুমান করা যায়। গ্রন্থ মধ্যে লেখিকা বঙ্কিমের মত 'পাঠককে স্মরণ করেছেন। যেমন - "পাঠক। ন্যায় আর ধর্মত চলিলে মানুষের কারোহানি নাই"। মাঝে মাঝে ধর্মীয় আলোচনাও আছে। কাহিনীর মধ্য দিয়ে ধর্মকথা বা তত্ত্বকথা পরিবেশন বঙ্কিমও করেছেন। যেমন - 'দেবী চৌধুরাণী', 'আনন্দ মঠ', ইত্যাদিতে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৬৩) পুস্তিকায় গল্পের ছলে হিন্দু ধর্মের তাৎপর্যও শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬১), 'অভেদী' (১৮৭১) ও 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০) ইত্যাদিও এই প্রসঙ্গে স্মরনীয়, কারণ এইসব রচনায় কাহিনীর সঙ্গে ধর্মকথাও প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্কিমের উপন্যাসে কখনো কখনো তত্ত্বালোচনা প্রাধান্য পেলেও সত্যিকারের আধুনিক উপন্যাস জীবনের জটিলতা ও রহস্যে সমৃদ্ধ হয়ে তাঁর হাতেই প্রকাশ পেল। তাঁর উপন্যাসকে ঐতিহাসিক তথা ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস এবং সামাজিক তথা সমাজভিত্তিক উপন্যাস এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। বেজবরুয়া যুগের অসমীয়া সাহিত্যের উপন্যাসগুলিকেও আমরা ঐ দুই প্রধান অংশে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করে দেখাবো - তাতে বাংলা উপন্যাসের প্রভাব কতটা কি ভাবে পড়েছে। সূচনা পর্বের দু'একটি অসমীয়া উপন্যাসের আলোচনা এখানে করা হল পৌর্বাপর্য নির্দেশের জন্য।

ঐতিহাসিক তথা ইতিহাস - আশ্রিত উপন্যাস

পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া

পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার উপন্যাস দু'টি, 'ভানুমতী' (১৮৯২) এবং 'লাহরী' (১৯৮২)। অধ্যাপক শ্রী হেমন্ত শর্মা বলেন - - - '' ইংরাজ উপন্যাসিক স্কট, বঙালী উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রক অনুকরণ করি কেবা জনে লেখকে অসমীয়া উপন্যাস লিখিবলৈ লয়। এওঁ বিলাকর ভিতরত রজনীকান্ত বরদলৈ, (পদ্মনাথ) গোহাঁই বরুয়া আদিয়ে অগ্রনী আছিল।'' ৪

ড: মহেশ্বর নেওগ বলেন --'' বঙ্কিম চন্দ্র আদির অনুপ্রেরণা ও গোহাঞি বরুয়া আদিয়ে স্বীকার করিছে''। ৫ পদ্মনাথের উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রভাব সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য দু'টি তাৎপর্যপূর্ণ। পদ্মনাথের উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রভাব কতখানি তা নির্ণয়ের পূর্বে বঙ্কিমের উপন্যাসের কতিপয় প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য এখানে আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসের উৎকর্ষ গভীরভাবে আলোচনা করছি না। কেননা অসমীয়া সাহিত্যে বঙ্কিম - উপন্যাসের অনুসৃতি তাঁর গভীর জীবন দর্শন ও চরিত্রবৈচিত্র্য তথা সমস্যার গভীরতার দিক থেকে ততটা হয়নি, যতটা হয়েছে তাঁর উপন্যাসের বহিরঙ্গ লক্ষণের। তাই এখানে আমরা তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার্থে এই সব লক্ষণগুলির উল্লেখ করছি। প্রথমত: উল্লেখ করতে হয় পূর্বরাগের কথা। বিবাহের পূর্বে প্রণয় বঙ্কিমের উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য। ('কপাল কুন্ডলা' 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি)। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বিবাহোত্তর প্রণয়। তৃতীয়ত: সাধু সন্ন্যাসী কর্তৃক ঘটনা সূত্র নিয়ন্ত্রণ। ভবিষ্যৎ গননা, যোগবল, সাধু সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তি ইত্যাদি অতি প্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা বঙ্কিমের প্রায় উপন্যাসেই লক্ষিত হয়। চতুর্থত: তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে দু'টি করে সমান্তরাল প্রেমকাহিনী থাকে। একটি মুখ্য অন্যটি গৌন, একটি ইতিহাসের, অন্যটি কাল্পনিক। যেখানে দু'টি প্রণয় - কাহিনী নেই সেখানে নায়কের একাধিক পত্নী অথবা প্রণয়প্রার্থিনী আছে। (কপালকুন্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবী চৌধুরানী)। পঞ্চমত: নায়িকাদের নিবাস হৃদয়রাজ্যে,

সংসারের সঙ্গে তাদের যোগ নিতান্ত বহিরঙ্গ ও অনাবশ্যক । ষষ্ঠতঃ বঙ্কিমের অঙ্কিত দাম্পত্যচিত্র প্রেমসর্বস্ব , বাৎসল্য প্রভৃতি রস নাই বললেই চলে । বাৎসল্যের সামান্য আভাস মাত্র পাই 'বিষবৃক্ষে' কমলমণির পুত্র সতীশচন্দ্রের এবং 'আনন্দমঠে' কল্যানী ও মহেন্দ্রের সন্তানের মধ্যে । সপ্তমতঃ ইতিহাস প্রীতি । স্কটের উপন্যাসের দ্বারা বঙ্কিম প্রভাবিত । স্কটের উপন্যাসে যুদ্ধ বর্ননা, দুর্গ, মন্দির প্রভৃতির সমাবেশ দেখা যায় । এই সব বঙ্কিমেও বিদ্যমান । শেকস্পীয়ারের রোমান্টিক কমেডিতে নারী পুরুষের ছদ্মবেশে বিভিন্ন কার্যসাধন করেছে । (যেমন The Marchant of venice - এ পোর্শিয়া) বঙ্কিমের উপন্যাসেও নারীর পুরুষ বেশ ধারণ লক্ষণীয় । (যেমন'আনন্দ - মঠে'র শান্তি) ।

এখন আমরা পদ্মনাথের উপন্যাস দু'টি নিয়ে আলোচনা করব । পদ্মনাথের উপন্যাস দু'টির রচনাকাল ১৮৯২ সাল । বঙ্কিমের সব ক'টি উপন্যাস ১৮৬৫ থেকে ১৮৮৭ সালের মধ্যে রচিত । পদ্মনাথের উপন্যাস দু'টি বঙ্কিমের সব কটি উপন্যাস রচিত হওয়ার চার বছর পর রচিত হয় ।

পদ্মনাথ অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম যথার্থ ঔপন্যাসিক । স্কটও বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে ইতিহাসের পটভূমিতে রোমান্সপ্রধান উপন্যাস রচনার পথ দেখালেন গোহাঞি বরুয়া । বঙ্কিমের উপন্যাসের মত পদ্মনাথের উপন্যাসেও সংঘাতের প্রধান কেন্দ্র প্রণয় ।[6] পদ্মনাথ উনিশ বছর বয়সে 'ভানুমতী' রচনা করেন । এই উপন্যাসের পটভূমি মোয়ামরীয়া বিদ্রোহ । মহন্ত অনিরুদ্ধদেব মন্ত্রবলে একটি প্রস্তর খন্ডকে সর্প সর্পে পরিণত করেন । সেই সর্প রাজা সুকাফাকে দংশন করতে উদ্যত হলে মহন্ত সর্পটিকে স্পর্শ করেন , সঙ্গে সঙ্গে সর্পটি মারা যায় । সেই থেকে এই মহন্ত 'মায়া মরা' মহন্ত নামে খ্যাত । আবার অনেকে বলেন , মহন্ত তার অনুগামীদের অজ্ঞান তথা মায়া ছিন্ন করেন । এই 'মায়ামরা' শব্দটিই বিকৃত হয়ে 'মোয়ামরীয়া' রূপ নিয়েছে । আবার কেউ কেউ বলেন মোয়ামরা একটি বিলের নাম । বিলে মোয়া মাছের প্রাচুর্যের জন্য বিলের এই নামকরণ হয় । অনুরুদ্ধদেব মোয়ামরায় একটি শাখাসত্র স্থাপন করেন । এই সত্রের মহন্তগণ মোয়ামরীয়া বলে খ্যাত । রানী ফুলেশ্বরী বৈষ্ণব মহন্তদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করে মোয়ামরীয়া বিদ্রোহের বীজ বপন করেন ।[7]

নায়ক চারু গোহাঞি শৈশবে মাতা ও কিছুদিন পর পিতাকে হারিয়ে মরান গোহাঞি বরুয়ার ঘরে মানুষ হতে থাকে। মরান গোহাঞির কন্যা ভানুমতী। তার সাথে চারুর গড়ে ওঠে বাল্যপ্রীতি, পরে তাই যৌবনের প্রেমে পরিণত হয়। এক রাজপুত্রের সঙ্গে ভানুমতীর বিবাহের কথা চলছিল। ভানুমতী তা জেনে একদিন রাতে পুরুষের ছদ্মবেশে পলায়ন করে এক বৃদ্ধার গৃহে আশ্রয় নেয়। রানী ফুলেশ্বরী (ঔপন্যাসিকের মতে অম্বিকাদেবী) মোয়ামরীয়াদের অপমান করেন, ফলে মোয়ামরীয়া মহন্তগণ প্রতিশোধ নিতে উঠে পড়ে লাগে। ভানুমতী এই বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়ে। বৃদ্ধারগৃহে ভানুমতী দেড়বছর থাকার পর একদিন সর্প দংশন করল তাকে। ভানুমতীর স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ল। পিতা এসে কন্যাকে নিয়ে গেলেন। ভানুমতী পালিয়ে যাওয়ার জন্য রাজা চারু গোহাঞিকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং 'চাওডাঙ'কে আদেশ দিলেন চারুকে কেটে ফেলতে। গোপনে ভানুমতী কারাগার থেকে নায়ককে মুক্ত করতে প্রয়াস পায়। কিন্তু চারু বন্দীশালা থেকে পলায়নে অনিচ্ছুক। শেষে তার বজ্রপাতে মৃত্যু হয়। ভানু উন্মাদিনী হয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়। চারুকে আরও একটি মেয়ে মনে প্রাণে কামনা করত, তার নাম তরা আই দেউ। চারুকে না পেয়ে সে সন্ন্যাসিনী হয়েছে।

ইতিহাসের সঙ্গে সম্বন্ধ গভীর না হলেও ইতিহাসই এই উপন্যাসের পটভূমি। এতে দু'টি কাহিনী আছে। এক শিবসিংহ - চারু গোহাঞি - ভানুমতীর কাহিনী, অপরটি চারুগোহাঞি — ভানুমতী - তরা আই দেউর কাহিনী। এতে নায়ক নায়িকার বাল্যপ্রেমই যৌবনের প্রেমে পরিণত হয়েছে। সন্ন্যাস অথবা সন্ন্যাসিনী প্রসঙ্গও এতে আছে। যেমন তরা আই দেউ সন্ন্যাসিনী হয়েছে। তরা আই দেউ রাজকন্যা। সে নায়ককে কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে চেয়েছিল। রাজকন্যার রাজশত্রুর সঙ্গে প্রণয় ভূদেবের' অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র শিবাজী রোসিনারাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, স্মরণ করিয়ে দেয় বঙ্কিমের 'দুর্গেশ নন্দিনী'র আয়েষার প্রেমকথাকে।

তরা আই দেউ আদর্শ প্রেমিকা। এই প্রেম বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখরের'

দলনী বেগমের প্রেমের স্মারক । ভানুমতী পুরুষের ছদ্মবেশে দেড়বছর এক বৃদ্ধার গৃহে কাটিয়েছেন । যুদ্ধ তথা বিদ্রোহের ব্যাপারও এতে রয়েছে , যেমন মোয়ামরীয়া বিদ্রোহ ।

বঙ্কিমের উপন্যাসে নায়ক নায়িকার আবেগময় সংলাপ উপভোগ্য । (যেমন প্রতাপ-শৈবলিনী , নবকুমার - কপালকুণ্ডলার সংলাপ) । গোহাঞি বরুয়ার উপন্যাসেও আবেগপ্রবণ সংলাপ বিদ্যমান । যেমন —

গোহাঞিদেব — ভানু

মই - প্রাণনাথ

গোহাঞিদেব - ন কবা সি কথা

মই ---- - - -হেজার বার কম , লাখবার কম । (ভানুমতী -- পঞ্চম অধ্যায়)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় 'ভানুমতী' উপন্যাস বঙ্কিমের আঙ্গিক দ্বারা কতটা প্রভাবিত । পদ্মনাথের অন্য উপন্যাস 'লাহরী'র পটভূমি মানরাজত্বের শেষ সময় । (অসমে বর্মীগণ 'মান' বলে অভিহিত) । নায়ক কমল , নায়িকা লাহরী । বদন বর ফুকনের বংশের উপর অত্যাচার করার সময় কমলের পিতা নৌকা যোগে পলায়ন করছিলেন সপরিবারে । সেই সময় কমল জলে পড়ে যায় । পরে উদ্ধার পেয়ে সে পামপুরের কৃষ্ণরাম গোহাঞির ঘরে মানুষ হতে থাকে । লাহরীর সঙ্গে কমল একই স্কুলে পড়ে । গড়ে উঠে উভয়ের বাল্যপ্রেম যার পরিণতি যৌবনের প্রণয় । লাহরীর পিতা কমলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অনিচ্ছুক , সুতরাং তাদের মিলনে বাধা ঘটে । এদিকে রত্নেশ্বর নামে এক তরুণ লাহরীর রূপ সৌন্দর্যের কথা শুনে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিল । লাহরীর মা দূরদেশে মেয়ের বিয়ে দিতে অনিচ্ছুক । কারণ লাহরী তার একমাত্র কন্যা । শেষে পামপুরেই এক তরুণ ধনবরের সঙ্গে লাহরীর বিয়ে ঠিক হল । লাহরী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে ঠিক করল ।। কিন্তু বিবাহের দিন 'ন - পমুয়া মানের সাহায্য নিয়ে রত্নেশ্বর লাহরীকে হরণের চেষ্টা করে । এই সংঘর্ষে ধনবরের মৃত্যু হয় । মানগণ রাত্রে নিদ্রিত হলে লাহরী পালিয়ে গিয়ে উঠল কমলের পিতামাতার কাছে । কমলের সঙ্গে লাহরীর বিবাহ হল । এর উপকাহিনী গড়ে উঠেছে বিধবা রানীর কন্যা জয়ন্তী ও পূর্ণ গোহাঞিকে

বঙ্কিম তাঁর প্রতিটি উপন্যাসের পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন , পদ্মনাথ ও তাই করেছেন । তবে পদ্মনাথ 'পরিচ্ছেদে'র পরিবর্তে 'আধ্যা' কথাটি ব্যবহার করেছেন । অদৃশ্য শক্তি বঙ্কিমের উপন্যাসে অনেক সময় কাহিনীকে পরিচালিত করে থাকে । যেমন মতিবিবির দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া । 'লাহরী'র কমলের জলে পতন , নব পর্যায় মানের আক্রমণ , ভানুমতীর সর্প দংশন ইত্যাদি অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতবাহী । বঙ্কিমের উপন্যাসে চিঠিপত্র প্রসঙ্গ থাকেই । যেমন 'দুর্গেশনন্দিনী'র একটি পরিচ্ছেদের নাম , 'বিমলার পত্র'। ভানুমতীর চতুর্থ 'আধ্যা'র নামও চিঠিপত্র ।

'লাহরী'র পঞ্চম 'আধ্যা'র শেষে আছে --'' অহঃ কিনো মোহন যুগল মূর্তি । গোপ গোপিনী বিলাকে ইফালর পরা সিফাললৈ বিহার করি ফুরিছে , রাধাকৃষ্ণর যাজত রাধাকৃষ্ণ ।'' পদ্মনাথের এই বর্ণনাশৈলী বঙ্কিমকে স্মরণ করিয়ে দেয় । একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি – '' আহা কী দেখিলাম , জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না । দূরাদয়শ্চক্র --- ---'' ইত্যাদি । (কপালকুণ্ডলা , ১ । ১) । অন্যায় করলে শাস্তি পেতেই হবে । 'চন্দ্র শেখরে'র শৈবলিনী প্রায়শ্চিত্ত করেছে । পদ্মনাথের রত্নেশ্বরও ('লাহরী'র) উন্মাদ হয়েছে ।

রজনী কান্ত বরদলৈ

অসমীয়া সাহিত্যে রজনী কান্ত বরদলৈ , (১৮৬৭ – ১৯৩৯) 'উপন্যাস সম্রাট' বলে অভিহিত । বরদলৈ কলকাতা সিটি কলেজের ছাত্র । এখান থেকে তিনি ১৮৮৯ সালে এফ - এ . পাশ করেন । অসমীয়া ঐতিহাসিক উপন্যাসকে ইনিই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন । বরদলৈর রচনায় ইংরেজী সাহিত্যের স্কট ও বাংলা সাহিত্যের বঙ্কিমের প্রভাব অপরিসীম ।

রজনী কান্ত বরদলৈ তাঁর 'দন্দুয়া দ্রোহ' উপন্যাসের 'পাতনি'তে লিখেছেন, '' কলেজত থা কোঁতে চার ওয়াল্টার স্কটর নভেলশ্রেনী আরু বঙ্কিম চাটুর্য্যার উপন্যাস

শ্রেণী পাতিছিলো। এই চহরর সিপারে (?) পাহার দেখি আরু আমার অসমর সকলো চহরতে নদী, নালা, নিজরা, বিল, পুখুরী, পাহার, আরনি, এই সকলো বিলাকলৈ মনত পরি চার ওৱাল্টার স্কটর সেই Land আরু Lowland বিলাকলৈ মনত পরিছিল। ভাব হৈছিল —' হায় মোর অসম জননী, তুমি কেনে প্রকৃতির কাম্য কানন। তোমার কোলাত স্কটলেণ্ডর দরে high Land, low land, hills, dales, lakes সকলোবিলাক আছে। তোমার কানর বুরঞ্জী নানা ঘটনারে পরিপূর্ণ। কিন্তু তোমার এই সমস্ত স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতীত বুরঞ্জীর উপন্যাস লেখিবলৈ চার ওৱাল্টার স্কটর নিচিনা বা বঙ্কিম চাটুর্য্যার দর উপন্যাস কারক প্রতিভাশালী সাহিত্যিক ক'ত?”

ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ শর্ম্মা তাঁর 'অসমীয়া উপন্যাসর ভূমিকা' গ্রন্থ বলেছেন– 'ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কাল হোৱাত বঙ্গদেশর সাহিত্য ক্ষেত্রত বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়র একচ্ছত্রী প্রভাব।.....বঙ্কিম চন্দ্রর রচনাবলীয়ে আরু উপন্যাস-রাজিয়ে ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করিছিল। তেওঁর রচনাই বিশেষকৈ উপন্যাস শ্রেণীয়ে বঙালীর জাতীয় চৈতন্য সজাগ আরু সতেজ করি আত্মপ্রতিষ্ঠার পথত আগবাঢ়িবলৈ অনুপ্রেরণা দান করিছিল। বঙ্কিমচন্দ্রর সমসাময়িক চিভিলিয়ান রমেশচন্দ্রর 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা, 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' 'মাধবী কঙ্কণ' আদি ঐতিহাসিক উপন্যাস কেইখনো এই প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। এই ইতিহাস বিমণ্ডিত গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী সমূহে বঙালী জীবনর স্থির জলাশয়ত যেন হঠাতে স্বদেশপ্রীতির তরঙ্গোচ্ছ্বাস আনি দিলে। কলিকাতাত থাকোঁতে ছাত্র অবস্থাত বরদলৈ নিশ্চয় বঙ্কিম - রমেশচন্দ্রই বঙালী জীবনত সৃষ্টি করা ভাবোচ্ছ্বাসর তড়িৎ প্রবাহ লক্ষ্য করিছিল। নিজ মাতৃভূমিতো সাহিত্যর যোগেদিতেনে ভাবোচ্ছ্বাসর প্রবাহ সৃষ্টি করিবলৈয় গুপুত অভিলাষ নিশ্চয় পোষণ করিছিল। [৮]

ডঃ শর্মা উক্ত গ্রন্থ আরো লিখেছেন -' কলিকাতাত বি.এ. পরীক্ষা দি অসমলৈ ঘূরি আহিবর সময়ত বিদায় লবলৈ যাওঁতে বরকাকতীয়ে হেনো বরদলৈক প্রশ্ন করিছিল যে অসমলৈ উভতি গৈ লক সাহিত্যর হকে তেওঁ কি করিব। তার উত্তরত বরদলৈ দেবে কৈছিল যে তেওঁ অসমীয়া ভাষাত বঙ্কিম চন্দ্রর দরে একানি উপন্যাস লিখিব। [৯]

ডঃ শৈলেন ভরালী তাঁর 'অসমীয়া সাহিত্যর ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থে বলেছেন -
'' স্কট আরু বঙ্কিমচন্দ্রর নিচিনাকৈ বরদলৈর উপন্যাসো রোমান্স প্রধান । - - - -
বঙ্কিম চন্দ্রর উপন্যাসর দরে বরদলৈর উপন্যাসত রোমান্সর পরিবেশন করা হৈছে যাইকৈ
প্রণয়র কাহিনীর যোগদি । .... বঙ্কিম চন্দ্র আরু তেওঁর সময়র বঙালী ঔপন্যাসিক
সকলর দরে সাধু - সন্ন্যাসী চরিত্রই বরদলৈর উপন্যাসতো ভূমিকা গ্রহণ করিছে ।'' ১০
এই মন্তব্য সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বরদলৈর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রর উপন্যাসের প্রভাব
কতখানি তা' আলোচনা করব ।

বরদলৈর 'মনোমতী' ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয় । এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস । ঐতিহাসিক পটভূমি মানের তৃতীয় আক্রমণ । নায়ক লক্ষ্মীকান্ত , নায়িকা মনোমতী । লক্ষ্মীকান্তের পিতার নাম হলকান্ত । মনোমতী চন্ডীবরুয়ার ধর্মকন্যা । বরপেটার দোলোৎসবে লক্ষ্মীকান্ত মনোমতীর প্রতি আকৃষ্ট হয় । হলকান্ত বরুয়া ও চন্ডীবরুয়ার মধ্যে বনিবনা নাই । হলকান্ত চন্ডীবরুয়ার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে মানসেনাকে চন্ডী বরুয়ার হাউলিতে নিয়ে আসে । লক্ষ্মীকান্ত সৈন্য সংগ্রহের জন্য ও মনোমতীকে দেখার জন্য বরনগর যায় । চন্ডীবরুয়ার ঘরে তখন শান্তিরাম ও পমীলা আশ্রিত । মানের আক্রমণে চন্ডীবরুয়ার স্ত্রী ও অন্য দু'একজন পলায়ন করে । চন্ডীবরুয়ার গৃহস্থিত লক্ষ্মীকান্ত , মনোমতী , শান্তি রাম ও পমীলাকে মানসৈন্য বন্দী করে । পুত্র লক্ষ্মীকান্তকে মুক্ত করতে গিয়ে হলকান্তও বন্দী হয় । শান্তিরামের পূর্ব প্রণয়িনী পদুমীর চেষ্টায় শান্তিরাম বন্দীশালা থেকে পলায়নে সক্ষম হয় । পরে শান্তিরামের সহায়তায় অন্য সবাই মুক্ত হয় । রাত্রির অন্ধকারে হলকান্তকেও চন্ডীবরুয়া ভ্রমে মুক্ত করা হয় । পরের দিন বন্দীশালায় একা পড়ে থাকা চন্ডীবরুয়াকে মানসেনারা হত্যা করে এবং পদুমীর বিচার করে , দ্বার বন্ধ করে ঘরে আগুন দিয়ে পদুমীকে পুড়িয়ে মারে । ইতিমধ্যে ইংরেজের হস্তে পরাস্ত হয়ে মানসৈন্য পালাতে সুরু করে । লক্ষ্মীকান্তরা মানকে বাধা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয় । মানসৈন্য চলে গেল । লক্ষ্মীকান্ত ও মনোমতীর মিলন হল , শান্তি রাম এবং পমীলার মধ্যেও বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটল । লজ্জায় অপমানে হলকান্ত বরুয়া সন্ন্যাসী হয়ে গেল । ইতিহাস হল এখানে মানের তৃতীয় আক্রমণ , অন্যটি

শান্তি রাম – পদুমী – পমীলার। স্বপ্নের মাধ্যমে বিপদের সংকেত দেওয়ার রীতি বঙ্কিমের উপন্যাসে দেখা যায়। যেমন –'' কপাল কুণ্ডলা' উপন্যাসে কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন। এই স্বপ্ন 'মনোমতী' উপন্যাসেও আছে। কমল আতৈ স্বপ্ন দেখেছেন (২। ২১). এই স্বপ্ন দর্শন ভাবী বিপদের সংকেত দিয়েছে।

এতে সাধু - সন্ন্যাসী প্রসঙ্গও আছে। যেমন – জটীয়া বাবাজীর মন্ত্রণা, হলকান্ত মনোকষ্টে সন্ন্যাসী হয়েছেন ('সামরনি') । মানগণ বুদ্ধ পূজা করেছে। (২।২৪)।

বঙ্কিমের উপন্যাসে নায়ক - নায়িকার রূপের কাব্যিক বর্ণনা পাওয়া যায়। (যেমন 'কপালকুণ্ডলা'র কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি প্রভৃতি) । মনোমতী উপন্যাসেও রূপ বর্ণনা বিদ্যমান। (১।১) । বরদলৈ বঙ্কিমচন্দ্রের মত একাধিকবার 'পাঠক' কে সম্বোধন করেছেন। (১।৬ ইত্যাদি) । বঙ্কিমের উপন্যাস নানা খণ্ডে বিভক্ত, মনোমতী দুই খণ্ডে বিভক্ত। বঙ্কিমের মত বরদলৈও প্রতি পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন। যেমন – মানর মেল, নাওত ইত্যাদি। তবে পরিচ্ছেদের নাম এখানে 'অধ্যায়'। 'মনোমতী'র এয়োদশ অধ্যায়ের নাম 'পমীলার দৌত্য'। স্মরণীয় 'কপাল কুণ্ডলা' উপন্যাসের পদ্মাবতী মেহের উন্নিসার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। (৩। ৩)।

'দন্দুয়া দ্রোহ' (১৯০৯) উপন্যাসে বদন বরফুকনের বিরুদ্ধে হরদত্ত – বীরদত্তের বিদ্রোহ বর্ণিত হয়েছে, সেই সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে হরদত্ত দুহিতা পদ্মকুমারী ও মহীরামের প্রণয় কাহিনী। বদন চন্দ্র বর ফুকন কামরূপের প্রজার উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন। ফলে জনগণ হরদত্ত ও বীরদত্তের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়। এই ঐতিহাসিক পটভূমি নিয়ে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াও উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাসে বদন বরফুকনের নাম নেই, আছে কলীয়া ভোমোরা বরফুকনের নাম। বরদলৈর উপন্যাসে এই বিদ্রোহ বদন বরফুকনের শাসনকালে আরম্ভ হয়ে কলীয়া ভোমোরার শাসনকালে থেমে যায় বলে বর্ণিত হয়েছে। বরফুকন বিশিষ্ট রাজকর্মচারী। বর ফুকনের সৈন্য ও হরদত্তের সেনার সঙ্গে সংঘর্ষ এখানে বর্ণিত হয়েছে। মহীরাম ও পদ্মকুমারী শৈশবে এক সঙ্গে খেলেছে। তাদের বাল্যপ্রেমই যৌবনের প্রেমে পরিণত হয়, শেষে উভয়ের বিবাহ হয়। নায়কের পিতামাতা বঙ্কিম উপন্যাসে উপেক্ষিত, এখানে মহীরামও শৈশবে পিতা ও মাতাকে হারায়। বঙ্কিমের

উপন্যাসের মত এখানেও বাৎসল্যরস নেই । নায়ক নায়িকার সন্তান - সন্ততির কথা নেই । মহীরাম আহোম সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দেয় , বঙ্কিমের প্রতাপও যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করে ('চন্দ্র শেখর') । পদ্মকুমারী ব্রহ্মপুত্রে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ করে , কপাল কুণ্ডলা নদীর পার ভেঙ্গে নদীতে পড়ে গিয়েছিল । সেখানেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি । 'দস্যুর দ্রোহ' উপন্যাসেও ধর্ম প্রসঙ্গ আছে । এই উপন্যাসেও নায়িকার নিবাস নায়কের হৃদয়রাজ্যে । সংসারের সঙ্গে তার প্রাণের টান নেই ।

বরদলৈর 'রঙ্গিলী' (১৯২৫) মানের প্রথম আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত । এতে চার জোড়া যুবক - যুবতীর প্রণয় কথা আছে । তন্মধ্যে সংরাম - রঙ্গিলীর কাহিনীই মুখ্য । শান্তি রাম - পদুমী , জয় রাম — কেতেকী ও বিচিত্রী - মনাইর ঘটনা হল উপকাহিনী । সংরাম ও রঙ্গিলীর বাল্য প্রেম পরিণত বয়সের প্রেমে পরিণত হয় । উচ্চপদ পাওয়ার পর সংরাম রঙ্গিলীর প্রতি উদাসীনতা দেখালেও রঙ্গিলী সংরামকে বিস্মৃত হতে পারেনি । শান্তিরাম ও পদুমীর মিলনে বাধা ছিল পারিবারিক বিরোধ । বুঢ়া গোঁহাই সংরামের মতি গতি ও কার্য্য কলাপে সন্তুষ্ট ছিলেন না । বুঢ়া গোঁহাই ও বর ফুকনের মধ্যে বিরোধ হয় । ফল স্বরূপ মানের আক্রমণের সময় সংরাম ও শান্তিরাম বুঢ়া গোঁহাইর বিরুদ্ধে মানের সঙ্গে যোগ দেয় । যুদ্ধে সংরামের মৃত্যু হল । আহত হল শান্তিরাম । বর ফুকন মান সেনাপতির হাতে পদুমীকে অর্পণ করেন । ফলে শান্তিরাম দারুণ মনোকষ্ট পায় এবং বৈরাগ্য অবলম্বন করে । রঙ্গিলী নিরন্তর সংরামের মূর্তিকে ধ্যান করে । শেষে সেও সন্ন্যাসিনী হয়ে বৃন্দাবন চলে যায় । সং রাম ও রঙ্গিলীর বাল্য প্রেম , যুদ্ধে সং - রামের মৃত্যু মনে করিয়ে দেয় বঙ্কিমের প্রতাপ শৈবালিনীর বাল্য প্রেমকে এবং যুদ্ধে প্রতাপের মৃত্যুকে । ('চন্দ্র শেখর') ।সংরামের সঙ্গী উপকাহিনীর অন্যতম নায়ক শান্তি-রাম বৈরাগ্য অবলম্বন করে । বঙ্কিমের গোবিন্দলালও বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিল । ('কৃষ্ণ কান্তের উইল') বরদলৈর রঙ্গিলীও বৈরাগ্য অবলম্বন করে, বৈষ্ণবী হয়, এবং বৃন্দাবন যায় । রঙ্গিলী চতুরা ও সাহসী , অনেকটা বঙ্কিমের 'পদ্মাবতীর মত । ('কপালকুণ্ডলা')। বঙ্কিমের মত সুন্দর রূপ বর্ণনা এই উপন্যাসেও বিদ্যমান । রঙ্গিলীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক লিখেছেন —"' ছোয়ালী জনী , গাভরু , নিয়মিত ওথ , শরীর হৃষ্টপুষ্ট , বরণত বগা, অথচ গোটেই গায়ে যেন তেজে ফুটি যাওঁ ফুটি যাওঁ করা ।

গাল দুখানি টুল টুলীয়া রঙা যেন সেন্দুর হে সানি থৈছে । হাত ভরি বিনাক নোদোকা অথচ নিপোটল । চকুযুরি উজ্বল – । চুলি কোছা বৈপরা । স্বভাবতে ছোয়ালীজনী বর স্ফূর্তির, সদায় হাঁহি মুখি , আনকি ন যতা মানুহরো মাত উলিয়ার পরা বিধর , খুহুতালি কথা কোয়াত পার্গত ।'' 'রঙ্গিলী' তে রাজার অন্তঃপুরের বর্ণনা আছে । পরিবেশ সৃষ্টি ছাড়াও এই বর্ণনা উপন্যাসকে রোমান্সগন্ধী করে তোলে । বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের রচনায় মোগল অন্তঃপুরের কাল্পনিক বর্ণনা রোমান্সরস পরিবেশনে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করেছে । বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্নকে উপন্যাসের মূল কাহিনীর সঙ্গে দক্ষতার সঙ্গে গ্রথিত করেছেন । যেমন –'কপালকুণ্ডলায়' কপালকুণ্ডলার স্বপ্নদর্শন (৪।৩) । কপালকুণ্ডলা এই স্বপ্নের মাধ্যমে তার ভাবী বিপদের সঙ্কেত পেয়েছে । বরদলৈর রঙ্গিলীও তা' পেয়েছে । তাই সে সংরামকে অষ্টমী পূজার দিন রাজ দরবারে যেতে নিষেধ করেছে । ডঃ শৈলেন ভরালী তাঁর'অসমীয়া সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থে লিখেছেন --'' বঙ্কিমচন্দ্রর উপন্যাসর দরে বরদলৈর উপন্যাসরো এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল স্বপ্ন দর্শন । সপোনর যোগেদি বরদলৈয়ে যাইকৈ বিপদর পূর্বাভাস দিয়ে ।'' ১১

' রাধা - রুক্মিণীর রণ'(১৯২৫) উপন্যাসটি মোয়ামরীয়া বিদ্রোহ নিয়ে রচিত । রাধা নাহরের প্রথমা পত্নী , দ্বিতীয়া পত্নী রুক্মিনী । এই দুই বীরাঙ্গনার সহায়ে মোয়ামরীয়াগণ কীর্তিচন্দ্র বর বরুয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে । (এতে অবশ্য 'মাজিউ গোঁহাইরও অবদান আছে) । রমাকান্ত রাজা হন , রাঘব বর বরুয়া হন । (বর -বরুয়া – বর ফুকনের মতই বিশিষ্ট রাজকর্মচারীর পদ) । রাঘবের অত্যাচারে প্রজাগণ অতিষ্ঠ । 'বুঢ়া গোঁহাই' (বিশিষ্ট রাজকর্মচারীর পদ) ছদ্মবেশে রাজপরিবারের খবরাখবর নেন । ইতিহাসের এই ঘটনার সঙ্গে আছে রাঘব রুক্মিনীর প্রণয় কাহিনী । তারা দুজন বাল্যকাল থেকেই ঘনিষ্ঠ । একসঙ্গে খেলাধুলা করেছে , বেড়িয়েছে । বিহুতে (অসমীয়াদের জাতীয় উৎসব) উভয়েই নেচেছিল । তাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও রাঘব লাজুক বলে তা আর ব্যক্ত হয় না । নাহরখোরা সরাগ রুক্মিনীকে বিবাহ করে । রাঘব রুক্মিনীকে পিতৃগৃহে নিয়ে যাওয়ার সময় সব কথা খুলে বলে । নাহর সন্তান - সন্ততি না হওয়ায় রুক্মিনীকে পরিত্যাগ করে । রুক্মিনী

'গোঁসাই'র সম্মতি নিয়ে রাঘবকে গ্রহণ করবে স্থির করে । রাঘব যুদ্ধে জয়লাভ করে বর বরুয়া হয়ে রাজার তিনজন রানীকে পেয়েছে । আত্মীয়া কন্যা বলে সে আর রুক্মিনী-কে গ্রহণ করল না । রুক্মিনী রাঘবের মঙ্গল চিন্তা করে রানীত্রয় থেকে সাবধান থাকতে বলে , এবং শংকর মাধবের নাম নিয়ে জীবন কাটাতে থাকে ।এই উপন্যাসেও ছদ্মবেশ আছে , তবে নারীর নয় , পুরুষের । বুঢ়া গোঁহাই ছদ্মবেশে রাজ অন্তঃপুরের খবরাখবর নিয়েছিলেন । এখানে ইতিহাসের সঙ্গে বাল্যপ্রণয় কাহিনীও যুক্ত হয়েছে । নায়িকা নিঃসন্তানা অতএব বাৎসল্যরসও অনুপস্থিত । বঙ্কিম - উপন্যাসে বাল্যপ্রেম অভিশপ্ত , এই উপন্যাসেও নায়ক - নায়িকার মিলন হয়নি । রুক্মিনীর সঙ্গে কপালকুণ্ডলার পদ্মা - বতীর খুব সাদৃশ্য আছে । উভয়েই প্রথম বিবাহে অসুখী ও সন্তানের জননী হতে পারেনি। উভয়েই প্রথম পতিগৃহ পরিত্যাগ করেছে । (স্বেচ্ছায়ই হোক বা অনিচ্ছাতেই হোক)। উভয়েই দ্বিতীয়বার বিবাহে ইচ্ছুক । দ্বিতীয় বার বিবাহের বাসনা কারো পূর্ণ হয়নি । পদ্মাবতী বাঞ্ছিতকে যে যেকোন প্রকারে পেতে ইচ্ছুক । রুক্মিনীর সঙ্গে এখানেই তার ব্যতিক্রম । রুক্মিনী বাঞ্ছিতকে না পেয়ে ধর্মজীবনে প্রবেশ করেছে । রুক্মিনীর প্রথম স্বামীর দুই স্ত্রী (তাকে নিয়ে) । 'কপালকুণ্ডলা'র নায়কেরও দুই স্ত্রী । একজন বিতাড়িতা পদ্মাবতী , অন্যজন কপালকুণ্ডলা । পদ্মাবতী প্রথম স্বামীর ঘরে সুখ পায়নি , রুক্মিনীও পায়নি । পূর্ব প্রণয়ী রাঘব রুক্মিনীকে গ্রহণ করেনি , প্রত্যাখ্যান করেছে । নবকুমারও পূর্ব পত্নী পদ্মাবতীকে প্রত্যাখ্যান করেছে । ~~নবকুমারও পূর্ব পত্নী পদ্মাবতীকে প্রত্যাখ্যান করেছে~~ । তবে নবকুমার চরিত্রবান , রাঘবের চরিত্রের বালাই নেই । বঙ্কিমের মত 'পাঠক'কে স্মরণ এই উপন্যাসেও লক্ষণীয় ।

'নির্মল ভকত' (১৯২৬) মানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত । নির্মল ও রূপহী ছেলেবেলায় এক সঙ্গে খেলেছে , পুতুল খেলায় নির্মল বর ও রূপহী কনে সেজেছে । এই ভাবে তারা বড় হয়েছে । তাদের বাল্যপ্রেম পরে প্রণয়ে পর্যবসিত হয়েছে ।নির্মলের পিতা নির্মলের অন্যত্র বিবাহের ব্যবস্থা করলে নির্মল ও রূপহী পলায়ন করে উঠল নির্মলের মাসির বাড়িতে । পরে মাসির প্রচেষ্টায় উভয়ের বিবাহ হয় । বিবাহের দুই বছর পর মানের দ্বিতীয় আক্রমণে নির্মল দেশের জন্য

যুদ্ধ ক'রে বন্দী হয় এবং মান - দেশে (ব্রহ্ম) নীত হয় । নির্মল মানদেশে অবস্থান কালে মানের তৃতীয় আক্রমণ ঘটে । এই আক্রমণে আসামের মানুষের কষ্টের অবধি থাকেনা । সবাই প্রাণ রক্ষার জন্য যেদিকে পারে পালিয়ে যায় । নির্মলের গ্রামের মানুষ বোকাঘাটের দিকে যায় । ছোটবেলা থেকেই রূপহীকে ভালবাসত অনিরাম নামে তরুণ । রূপহীর জন্য সে অবিবাহিতই রয়ে গেছে । মানের আক্রমণের সময় অনিরামের চেষ্টাতেই রূপহীর প্রাণ রক্ষা হয় । দীর্ঘ বারো বছর পর নির্মল না আসায় রূপহীর সঙ্গে অনিরামের বিবাহ হয়ে গেল । তার দুই বছর পরে নির্মল মান - দেশ থেকে স্বগ্রামে এল । 'ভকত'র বেশ ধারণ করে নির্মল ঘুরতে থাকে এবং এক বৃদ্ধের কাছ থেকে জানতে পারে অনিরাম-রূপহীর বিবাহের কথা, ও তাদের সংসারে নবাগত সন্তানটির কথা । রূপহীও অনিরামের সংসারে কোনো অশান্তি যাতে না হয় সেই জন্য নির্মল ভিখারী 'ভকতে'র বেশে তাদের দেখে আসে । তারপর সংসার জীবনের চিন্তা একবারে পরিহার করে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং পবিত্র জীবন যাপন করতে থাকে । শত বছরেরও বেশী সময় কাল ধরে আসন অবস্থাতে নির্মলের প্রাণ বায়ু নির্গত হয় । রূপহী এবং অনিরাম সব কথা জানতে পারে এবং নির্মলের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় সাশ্রু নেত্রে যোগ দেয় ।

এই উপন্যাসে নায়ক - নায়িকা পলায়ন করেছিল , উঠেছিল নায়কের মাসির বাড়িতে । বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার পোলিয়ে উঠেছিল অধিকারীর গৃহে । নির্মল ও রূপহীর বিবাহে সহায়তা করেন মাসি । নবকুমার - কপালকুণ্ডলার বিবাহে সহায়তা করেন অধিকারী । নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা এক বছরেরও কিঞ্চিৎ অধিক সময় গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেছে , তাদের সন্তান হয়নি । নির্মল এবং রূপহীও প্রায় দু'বছর স সংসার করেছে , তাদেরও সন্তান হয়নি । নির্মল ও অনিরাম যেন বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর ও প্রতাপ । প্রতাপ নিষ্ঠাবান প্রেমিক , নির্মলও তাই । নির্মল চন্দ্রশেখরের মত ধর্মপ্রাণ শান্ত ধীর স্থির । চন্দ্রশেখর বিবাহিত , নির্মলও বিবাহিত । প্রতাপ মনোদুঃখে শৈবলিনীর জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করেছে । অনিরাম রূপহীকে না পেয়ে চির কৌমার্য ব্রত গ্রহণ করেছিল । প্রতাপকে শৈবলিনী সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসলেও তাতে যেন একটু খাদ ছিল । নইলে যখন নদীতে ডুবে মৃত্যু বরণ করার কথা উঠল , তখন শৈবলিনী ডুব

দিয়ে মরতে পারলনা কেন ? অনুরূপ খাদ রূপহীর মধ্যেও ছিল , তাই সে অনিরামকে বিবাহ করতে পেরেছে । অবশ্য দীর্ঘ বারো বছর নির্মলের জন্য সে অপেক্ষা করেছে , এবং অনেক কায়িক শ্রম তাকে করতে হয়েছে । 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমর গোবিন্দলালকে ক্ষমা করতে পারে নি । তাই গোবিন্দলাল সংসার অসার মনে করে সংসার পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেছে । পুতুল খেলার সময় রূপহী অনিরামকে বলেছিল , আজকের পুতুল খেলায় নির্মলই বর হোক । কালকে যখন খেলব , তখন তুই বর হবি । উভয় দিনই কনে রূপহী । এই ভাবে এই উপন্যাসের পরিনতির প্রতি লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের উপক্রমনিকায় (প্রথম পরিচ্ছেদ – বালক বালিকা) ভাগরথী তীরে আম্রকাননে বালক প্রতাপ ও বালিকা শৈবলিনীর কথা স্মরণ করা যায় । বন্য কুসুম চয়ন করে মালা গেঁথে শৈবলিনী বালকের (প্রতাপের) গলায় পরিয়ে দিল , আবার খুলে আপন কবরীতে পরল । আবার খুলে বালকের গলায় পরাল । স্থির হলনা – বালিকার এই মালিকার যথার্থ অধিকারী হবে কে ? শেষে বালিকা শৈবলিনী স্থির করতে না পেরে নিকটে এক 'গাই' এর শৃঙ্গে তা পরিয়ে দিল । এই ভাবে লেখক 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের পরিণতি কী হবে , তার একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাঠককে দিয়েছেন ।

বঙ্কিমের উপন্যাসের মত স্বপ্ন দর্শন ব্যাপার এখানেও রয়েছে । নির্মলের মাসি স্বপ্ন দেখেছেন । মাসি স্বপ্নে নির্মলকে বলেছেন –'' বাছা তই ঠিক বৈকুণ্ঠতে বৈষ্ণব সকলর লগত আছ , কিন্তু বাছা । যোতিয়া তই এই নশ্বর দেহ এরিবি তেতিয়া বাছা । তই এই বৈকুণ্ঠতকৈও আরু ভাল বৈকুণ্ঠ পাবি ।'' এই ভাবে বরদলৈ স্বপ্নের মাধ্যমে কাহিনীর পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছেন । নির্মল ও একাধিকবার স্বপ্ন দর্শন করেছে । এই উপন্যাসের শেষের দিকে (প্রায় ২২ - ২৫ অধ্যায় পর্যন্ত) লেখক ধর্মালোচনা করেছেন – যেমন - প্রায়শ্চিত্তের কারণ , গুরু গ্রহণের আবশ্যকতা , ব্রহ্মচর্য অক্ষুন্ন রাখার উপায় ইত্যাদি । 'নির্মল ভকত' যখন প্রকাশিত হয় তখন বরদলৈর বয়স ঊনষাট , সুতরাং ধর্মপ্রবণতা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক নয় । বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও বিশেষ করে তাঁর শেষ জীবনে রচিত উপন্যাস গুলিতেও (যেমন 'দেবী চৌধুরানী'তে

গীতাটি্র ও হিন্দ্নারীর যথার্থ স্থান সম্বন্ধে উপদেশাদি) এই ধর্মালোচনার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে ।'তাম্রেশ্বরীর মন্দির' (১৯২৬) উপন্যাস মানের তৃতীয় আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত , সেই সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে ধনেশ্বর — আঘনীর প্রণয় কথা । ধনেশ্বর আঘনীকে ভালবাসে । আঘনীকে আরো একজন যুবক কামনা করে , সে মানেশ্বর । সদিয়ার তাম্রেশ্বরীর মন্দিরে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল । 'চুতিয়া'দের রাজা রত্নধ্বজ রত্নপুর নগরে রাজধানী স্থাপন করেন । রত্ন ধ্বজ তাঁর পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য গৌড়রাজ্যে রেখেছিলেন । কিছুদিন পর এই রাজকুমারের মৃত্যু হয় । গৌড়েশ্বর রাজকুমারের শবদেহটি এই রত্নপুরে পাঠিয়ে দেন । সেই থেকে এই নগরটির নাম 'শ(ব)দিয়া' [১২]। ধনেশ্বর কে মায়ের নিকট বলিদানের ব্যবস্থা হয় । জনৈক বৈষ্ণবী ধনেশ্বরকে সন্তানের মত দেখতেন । নরবলি যুক্তিহীন — এই কথা সে তাঁরই কাছে শুনেছিল । শেষ পর্যন্ত ধনেশ্বর বলি হলনা । সে মান যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে । যুদ্ধে মান সৈন্য সম্পূর্ণ ভাবে পরাস্ত হয় । সদিয়াখোয়া গোঁহাইর কন্যা ফুলেশ্বরী । সদিয়াখোয়া গোঁহাইর সেনাপতি কমলেশ্বর । অষ্টমী পূজার দিন ধনেশ্বরকে বলি দেওয়া স্থির , সদিয়া খোয়া গোঁহাইর প্রচেষ্টায় ধনেশ্বর শেষে রক্ষা পায় । জানা গেল মান - সৈন্য সদিয়ার দিকে আসছে । 'তয়াময়া' রণে মানসৈন্য সম্পূর্ণ ভাবে পরাস্ত হল , জয়ী হল আহোমসৈন্য । এই যুদ্ধে কমলেশ্বরের অবদান অনেক । কমলেশ্বর ও ফুলেশ্বরীর বিবাহ হল । সদিয়াখোয়া গোঁহাইর সম্মতিতে ধনেশ্বর আঘনীর বিয়ে হয়ে গেল । বঙ্কিমের উপন্যাসে সাধুসন্ত - থাকেই , যেমন —'চন্দ্রশেখরের রামা - নন্দ স্বামী । বরদলৈর এই উপন্যাসেও বৈষ্ণবী আছে । ধনেশ্বর প্রেমিক , বীর । বঙ্কিমের প্রতাপও প্রেমিক , বীর । আঘনী ধনেশ্বরকে বলেছিল তার পোষাক পরে পালিয়ে যেতে । আঘনী নিজে ধনেশ্বরের পোষাক পরে বন্দীশালায় প্রবেশ করে । এই দৃশ্য ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' ও বঙ্কিমের 'দুর্গেশ নন্দিনী'কে স্মরণ করিয়ে দেয় । কারণ কারাগার থেকে নায়ককে মুক্ত করার শুভ ইচ্ছা ওই দু'টি উপন্যাসেও বিদ্যমান । প্রতাপ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করেছে । ধনেশ্বর রণনৈপুণ্য দেখিয়ে সদিয়াখোয়া গোঁহাই ও কমলে - শ্বরের সহানুভূতি আদায় করেছে । কমলেশ্বর মানযুদ্ধে ধনেশ্বরের বীরত্ব দেখে প্রশংসায় x পঞ্চমুখ , রমানন্দ স্বামী ও ('চন্দ্র শেখরে)গ্রন্থ শেষে প্রতাপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ । xxxxxxxxxx বৈষ্ণবী ধনেশ্বরকে ধর্মকথা বলেছেন , 'নাংফাই ' কে শুশ্রূষা করতে

করতে ধর্মের উপদেশ দিয়েছেন , তাকে দীক্ষিত করেছেন , সামাজিক কুপ্রথা তুলে ধরেছেন , শঙ্করদেব - মাধবদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন । আগেই বলা হয়েছে , এই যে ধর্ম ভাবের প্রকাশ তা' বঙ্কিমের শেষ বয়সের অনেক উপন্যাসে বিদ্যমান । বঙ্কিমের উপন্যাসে উপদেশ দেওয়ার প্রবণতা আছে । যেমন - '' তুমি অধম , তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন ?'' (কপাল কুণ্ডলা - ১।৩) । এই উপদেশ দেওয়ার প্রবণতা বরদলৈর উপন্যাসেও বিদ্যমান । ধনেশ্বরীর প্রতি বৈষ্ণবীর একটি উক্তি । - '' বাছা এই নরবলি অনুষ্ঠান টোয়েই এটা মোহ বা অজ্ঞানর , অথবা অন্ধবিশ্বাসর পরা ওপজা এটা অনুষ্ঠান । গোসানীয়ে কম্মিন কালেও রজা বা দেউরী সকলক কোয়া নাই 'মোক বলি দে' । ..... ধনেশ্বর বন্দীশালায় সপ্তমীর দিন প্রাতে স্বপ্ন দেখেছে , তাম্রেশ্বরী দেবী এক সুন্দরী মেয়ের বেশে তাকে বলছেন -'' ধনেশ্বর তই পরম ভক্ত । তই কৃষ্ণভক্ত যেতিয়াই , তেতিয়াই তই মোর ভক্ত । বাছা , মই , মই সকলোরে মাতৃদেহ । মই কেতিয়াও মানুহর তেজ (রক্ত) মঙহ (মাংস) না খাওঁ ।' বামাচারী তান্ত্রিক বলির পক্ষে । সদিয়া খোয়া গোঁহাই ধনেশ্বরকে মুক্ত করে দিতে বলেছিলেন , কিন্ত xxxxxxxx বামাচারী তাতে কর্ণপাত করেন নি । তিনি ধনেশ্বরকে xxxx টেনে নেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেন , তাই সদিয়াখোয়া গোঁহাই বামাচারীর মস্তক ছেদন করেন । তান্ত্রিকের সঙ্গে সদিয়াখোয়া xxxxxx গোঁহাইর এই ঘটনায় রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জনের' (১৮৯০) দূর প্রভাব থাকা ও অসম্ভব নয় । অবশ্য ভাব সাদৃশ্য একেবারেই নাই । বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮৪) ও 'দেবীচৌধুরানী'তে আছে মনোরম গার্হস্থ্য কাহিনীর অন্তরালে গীতাতত্ত্বে নিষ্ণাত তাত্ত্বিক বঙ্কিমের এক প্রকার সূক্ষ্ম ধর্মীয় অনুভূতি ও হিন্দুর সামাজিক আচার আচরণ ঘটিত তত্ত্ব কথা । 'নির্মল ভকত' ও 'তাম্রেশ্বরীর মন্দির' উপন্যাস দু'টিতেও তেমনি বরদলৈর ধর্মবোধ প্রকাশিত হয়েছে । বরদলৈর 'রহদৈ xxxx লিগিরী'র (১৯৩৩) পটভূমি মানের প্রথম আক্রমণ । রহদৈ নায়িকা , নায়ক দয়ারাম । একই গ্রামে তাদের জন্ম ও এক সঙ্গে তারা মানুষ । তাদের বাল্য প্রেম যৌবনের প্রেমে পরিণত হয় । রাজা চন্দ্রকান্তর দৃষ্টি পড়ে রহদৈর উপর । তিনি জোর করে তাকে ধরে আনেন ও অন্তঃপুরে রাখেন । রাজার বিবাহ হয় পরে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে , যার নাম মাহিন্দ্রী । কিন্ত রাজা রহদৈর আশা পরিত্যাগ করতে পারলেন না । গোপনে বিবাহের

ষড়যন্ত্র করলে রাজমাতা ('রাজমাও') বাধা দিলেন । রহদৈ অসুস্থ । দয়ারাম বৈদ্যের ছদ্মবেশে সেখানে এলেন । রাজা তাদের প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করে দু'জনকেই মুক্তির আদেশ দেন । রাজমাতা চক্রান্ত ক'রে রূপসিংয়ের হাতে রহদৈকে সমর্পণ করতে চাইলেন । রহদৈ বুঝতে পেরে নিজ গৃহে যায় । পিতা ও ভ্রাতা মৃত , তাই সে দয়ারামের মাসির গৃহে আশ্রয় নেয় । মাসির ব্যবহারে তার জীবন দুর্বহ হয়ে উঠল । এই সময় রূপ সিং লোকজন নিয়ে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সে নদীতে ঝাঁপ দেয় । সন্ন্যাসী স্বামী আগমানন্দ তাকে জলথেকে তুলে আশ্রমে নিয়ে যান । এখানে রহদৈ কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হয় , যোগ সাধনের বলে সে স্বরূপ পরিবর্তন করে বৃথা কৃষ্ণ দাসী বৈষ্ণবীতে পরিনত হয় । রাজা মুক্তি দিলে রাজমাতা দয়ারামকে ~~দয়ারামকে~~ নাগা ~~পাহাড়ে~~ পাহাড়ের দিকে তাড়িয়ে দেন । দয়ারামও ইতিমধ্যে সাংসারিক জীবনের আশা ছেড়ে বৈষ্ণব হয়েছে । 'কমলাবারী সত্রে' এখন সে দীনবন্ধু আতৈ নামে পরিচিত । কৃষ্ণদাসী (রহদৈ) ঘুরতে ঘুরতে কমলাবারী সত্রে এল , এখানে উভয়ের সাক্ষাৎ হল , ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনাও হল , কিন্তু উভয়েকে উভয়কে ছেড়ে গেল । কৃষ্ণদাসী মানের আক্রমণের ইঙ্গিতে দিয়ে বেড়ায় ও বৈষ্ণব ধর্মের মন্ত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে , যুদ্ধে আহত লোকদের সেবা করে । পরে সে বৃন্দাবন গমন করে ।

চন্দ্রকান্ত রহদৈকে ধরে আনেন । রূপ সিং ও দয়ারামের মাসির গৃহ থেকে লোকজন নিয়ে রহদৈকে ধরে আনতে গিয়েছিল । এই সব বৃত্তান্ত বঙ্কিমের 'চন্দ্র শেখরের' লরেন্স ফষ্টরকে স্মরণ করিয়ে দেয় । লরেন্স ফষ্টর শৈবলিনীকে চন্দ্র শেখরের গৃহ থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল লোকজন নিয়ে এসে । বঙ্কিমের উপন্যাসে স্বামীজীর অবতারণা একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । (যেমন -'চন্দ্র শেখরের রমানন্দ স্বামী) বরদলৈর উপন্যাসেও পাই স্বামী আগমানন্দকে । এই উপন্যাসে একাধিক স্বপ্নের উল্লেখ রয়েছে । বর ফুকনের স্বপ্নে তার ভাবী বিপদের আভাস আছে । রহদৈর বেশীর ভাগ স্বপ্নই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহ ।

আমরা দেখতে পেলাম , বরদলৈর ঐতিহাসিক উপন্যাস সমূহের পরিকল্পনা , উপস্থাপনা ও চরিত্র চিত্রণে বঙ্কিম চন্দ্রের প্রভাব বেশ গভীর , তা সত্ত্বেও আসামের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস গুলিতে তাঁর স্বকীয়তা অব্যক্ত থাকে নি ।

:::::::::::

। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া ।

অসমীয়া সাহিত্যে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার খ্যাতি যতটা কবি ও নাট্যকার হিসেবে, ততটা ঔপন্যাসিক হিসেবে নয় । তথাপি অসমীয়া ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনায় তাঁর নাম উল্লেখ করতেই হয় , কারণ সাহিত্যের এই বিভাগেও তিনি পদচারণা করেছেন , যার পটভূমি ইতিহাস । লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রয়াস পেলেও তাতে তাঁর আশানুরূপ সফলতা মেলেনি । বেজবরুয়ার উপন্যাসটির নাম 'পদুম কুঁয়রী , প্রকাশ - কাল ১৯০৫ সাল । স্মরণীয় রজনীকান্ত বরদলৈ ১৯০৯ সালে একই বিষয় নিয়ে 'দন্দুয়া দ্রোহ' লিখেছেন । পদ্মনাথ ও রজনীকান্তের মত লক্ষ্মীনাথও মূলতঃ বঙ্কিম প্রভাবিত ।

'পদুম কুঁয়রীর' পটভূমি দন্দুয়াদ্রোহ , সেই সঙ্গে আছে , সূর্য কুমার ও হরদত্ত দুহিতা পদুমের প্রণয় কাহিনী । নায়ক সূর্য কুমার পিতৃমাতৃহীন , হরদত্তের কাছে মানুষ । হরদত্তের কন্যা পদুমের সাথে সে বড় হয়েছে । উভয়ের বাল্যপ্রীতি যৌবনের প্রেমে পরিণত হয়েছে । বঙ্কিমের উপন্যাসে যেমন পিতা মাতা গৌণ , এই উপন্যাসেও তাই । বঙ্কিমের উপন্যাসে বাল্যপ্রেম যৌবনের প্রেমে রূপান্তরিত হয় ; এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই । হরদত্তের কামরূপ উদ্ধার বাসনায় যে দেশপ্রেম সূচিত হয়েছে , তা বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'কে স্মরণ করিয়ে দেয় । হরদত্তের ইচ্ছা কোচবিহারের রাজপুত্রের সাথে পদুমের বিবাহ হয় । তাই সূর্যকুমারের সঙ্গে পদুমের প্রণয়ের কথা শুনে তিনি রেগে যান এবং সূর্যকে বাড়ী থেকে বহিষ্কার করেন । সূর্য কুমার বরফুকনের ঘরে আশ্রয় নেয় । বরফুকনের কন্যা হল ফুল । সূর্য কে তার ভাল লেগে যায় । সূর্যের খবর না পেয়ে এদিকে পদুম ব্যাকুল । বর ফুকন বিশিষ্ট রাজ কর্মচারী । তার হাতে হরদত্ত বীরদত্ত নিহত হয় । বর ফুকনের সেনাপতি কুমেদান বডালের (বিদেশী) হাত থেকে সূর্য কুমার পদুমকে রক্ষা করে । সূর্যকে দেখার সাথে সাথে পদুমের মনো - বাঞ্ছা পূর্ণ হয় , সে অঙ্গুলি রক্ষিত বিষ ভক্ষণ করে । এই দৃশ্য দেখে সূর্য কুমার স্বীয় অসি স্ববক্ষে বসিয়ে দেয় এবং মৃত্যুর কোলে এলিয়ে পড়ে । ফুল বর ফুকনের অনুমতি নিয়ে সূর্য - পদুমের কবরের ব্যবস্থা করে এবং সেই কবরের উপর আত্মহত্যা করে ।

পদ্ম কুমারীর পরিণতি বড় করুণ। নায়ক নায়িকা উভয়েরই মৃত্যু ইংরেজী 'রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডী'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সূর্য্য কুমার, ফুল, পদ্ম — এদের কারোরই সংসারের সাথে প্রাণের টান ছিল না। এরা হৃদয়-রাজ্যের অধিবাসী। যেমন বঙ্কিমের প্রতাপ, দলনী, শৈবলিনী, পদ্মাবতী ইত্যাদি।

যুদ্ধ বা সংঘর্ষ প্রসঙ্গ যা বঙ্কিম উপন্যাসে সচরাচর দেখা যায়, তা বেজবরুয়ার এ উপন্যাসেও বিদ্যমান। হরদত্ত — বর ফুকন সংঘর্ষে হরদত্ত ও বীরদত্ত নিহত হন। ফুল, বর ফুকন তথা বিশিষ্ট রাজ কর্মচারীর কন্যা। সূর্য কুমারের সঙ্গে তার প্রণয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র রোসিনারা, বঙ্কিমের দুর্গেশ নন্দিনী'র আয়েষাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, সেই সাথে স্কটের' আইভান হো' উপন্যাসের কথাও মনে পড়া স্বাভাবিক। এই উপন্যাসে আইভান হো তার পিতা সেড্রিকের আশ্রিতা রাওয়েনাকে ভালবেসে বিবাহ করতে চাইলেন। পিতার ইচ্ছা পুত্রের বিবাহ দেন স্যাকসন রাজবংশের কারোর সঙ্গে। প্রথম রিচার্ডের হয়ে যুদ্ধ করেন আইভান হো। এই যুদ্ধে আইভান যে আহত হলে ইহুদি আইজাক-কন্যা রেবেকা তাকে শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলেন। দুর্বৃত্ত রেবেকার সর্বনাশ করতে এলে আইভান হো রেবেকাকে রক্ষা করেন। আইভান হোর সাথে রাওয়েনার মিলন হল। রেবেকার প্রেম ভীরু কৃষ্ণকলির মত ফুটেই ঝরে পড়ল। বেজবরুয়ার এই উপন্যাসে হরদত্ত ও সেড্রিকের মত পদ্মকে ভাল বংশে (কোচরাজবংশ) বিবাহ দিতে চেয়েছেন - । আইভান হো তা মানেনি, পদ্মও মানেনি। ফুল রেবেকার মতই নিষ্ঠাবতী প্রেমিকা। রেবেকাকে দুর্বৃত্ত আক্রমণ করলে আইভান হো তাকে রক্ষা করেন। এখানে কুমেদানের হাত থেকে সূর্য কুমার পদ্মকে রক্ষা করেন। বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রতাপ লরেন্স ফস্টরের কবল থেকে শৈবলিনীকে উদ্ধার করেছিলেন। (২১৫)। এতদ্ব্যতীত বঙ্কিমের মত নায়িকার কাব্যিক রূপ - বিশ্লেষণ, একাধিক বার 'পাঠককে' স্মরণ ইত্যাদি তো বেজবরুয়ার উপন্যাসে আছেই।

।। হিতেশ্বর বরবরুয়া ।।

হিতেশ্বর বরবরুয়া অসমীয়া সাহিত্যে ঔপন্যাসিক হিসেবে ততটা খ্যাত নন, তাঁর খ্যাতি কবি হিসেবে। তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মালিতা'র (১৯১৪) পটভূমি আহোমকছারী সংঘর্ষ, সেই সঙ্গে মালিতা - অভয়ের প্রেমকথা বর্ণিত হয়েছে। অভয় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় সংকল্প। অভয়ের পিতৃহন্তা ভীমবল মালিতার দাদা। কছারী - আহোম যুদ্ধে আহোমের পক্ষে অংশ গ্রহণ করে অভয়। মালিতার উভয় সংকট। কারণ সে কছারী রাজকন্যা। নিরুপায় হয়ে সে মহামায়ার মন্দিরে যায়, এবং দেবীকে সাক্ষী রেখে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। অভয় এসে মালিতাকে নিবৃত্ত করে। যুদ্ধে ভীমবল পরাভূত হয়। তিনি অভয়কে সন্ধির আশা দেখিয়ে অন্যায় ভাবে বধ করেন। অভয়ের মৃত্যু সংবাদে মালিতা হয়ে যায় উন্মাদিনী। সে অভয়ের মৃতদেহের অন্বেষণে যুদ্ধক্ষেত্রে যায়, এবং মৃতদেহ খুঁজে পায়। পরলোকে অভয়ের সঙ্গে মিলন হবে এই আশায় মালিতা আত্মহত্যা করে।

মালিতা রাজকন্যা, রাজশত্রু অভয় রাজকন্যার প্রেমিক। এক্ষেত্রে স্বভাবতঃই আমাদের বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'র আয়েষা ও ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ের' রোসিনারার কথা মনে জাগে।

বঙ্কিমের উপন্যাসের মত যুদ্ধ এই উপন্যাসেও বিদ্যমান। কছারী - আহোম যুদ্ধে ভীমবল পরাভূত হয়। বঙ্কিমের উপন্যাসে মন্দির নায়ক - নায়িকার মিলন ও বিবাহের স্থল। এখানেও মালিতা মহামায়ার মন্দিরে এসে দেবীকে সাক্ষী করে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখরের' প্রতাপের মৃত্যু হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। এখানে অভয়েরও মৃত্যু হয় যুদ্ধ ক্ষেত্রে। বঙ্কিমের নায়ক নায়িকার সংসারের সঙ্গে নাড়ীর টান নেই, তাদের নিবাস হৃদয়রাজ্যে। অভয় - মালিতারও সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললেই চলে, তাদেরও নিবাস পরস্পরের হৃদয়রাজ্যে। বঙ্কিমের উপন্যাসে চিঠি পত্র প্রসঙ্গ থাকেই, এখানেও আছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে অভয়ের শবদেহ অন্বেষণে বের হওয়ার প্রাক্কালে মায়ের জন্য মালিতা একটি চিঠি লিখে রেখে গিয়েছে। বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখরে' লরেন্স ফষ্টর শৈবলিনীকে বলপূর্বক নিয়ে যায়, এখানেও রূপসন্দিকৈ বলপূর্বক রাজার উদ্যান

থেকে মালিতাকে নিয়ে আসে । মালিতা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছে শবদেহ খুঁজতে , এবং খুঁজে পেয়েছে । 'চন্দ্রশেখরে' রমানন্দ স্বামীও যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন প্রতাপের শবদেহ অন্বেষণ করতে , তিনিও তা' খুঁজে পেয়েছিলেন । (৫।৮) । মালিতাকে হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় অভয় প্রত্যক্ষ করে । স্মরণীয় বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলাও নবকুমারকে দেখেছিল গাছের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় । ('কপাল কুণ্ডলা') । প্রতাপ প্রেমিক , অভয়ও প্রেমিক । প্রতাপের মৃত্যুর মূলে শৈবলিনী , অভয়ের মৃত্যুর মূলে মালিতা । মালিতার কথাতেই ভীমবল অভয়ের সঙ্গে দেখা করে ও সন্ধির প্রস্তাব দেয় । ভীমবল অবশ্য বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধ লাগিয়ে অভয়কে বধ করে । সুতরাং 'মালিতা' উপন্যাসেও বঙ্কিমের প্রভাব নানা ভাবে পড়েছে দেখতে পাই ।

::::::::::::::::::::::::::::::::::

।। হরিনারায়ণ দত্ত বরুয়া ।।

হরিনারায়ণ দত্ত বরুয়া পুরাতত্ত্ববিদ্ । তাঁর 'চিত্রদর্শন' (১৯৩১) উপন্যাসটির পটভূমি আহোম - মোগল সংঘর্ষ , সেই সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে কয়েক জোড়া নরনারীর প্রণয়কথা । দরঙ্গী রাজার মন্ত্রী মোগলের সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত হয়ে সন্ন্যাসী হন । তাঁর কন্যা ভবানী উদয় নারায়ণের চিত্র দেখেই তাঁকে ভালবেসে ফেলে । এই উপন্যাসের আরেক নায়ক দণ্ডধর অসুস্থ হলে ভানুমতী ও ভবানী তাঁর শুশ্রূষা করে । এখানে স্কটের 'আই ভান হো'র রেবেকার দূর প্রভাব আছে বলে মনে হয় । দণ্ডধরের প্রেমিকা ভানুমতী। ভবানীর প্রতি দণ্ডধরের দৃষ্টি পড়ল এবং দণ্ডধর তাকে প্রেম নিবেদন করল । ভবানী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে । ভানুমতী বালকের ছদ্মবেশে মাধব নাম নিয়ে দণ্ডধরের সান্নিধ্যে আসে । বঙ্কিমের 'কপাল কুণ্ডলা'য় পদ্মাবতী ব্রাহ্মণ কুমারের বেশ নিয়ে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে জঙ্গলে দেখা করেছিল । বঙ্কিমের উপন্যাসে ছদ্মবেশ একটি বৈশিষ্ট্য , তা' দত্ত বরুয়ার উপন্যাসেও দৃষ্ট হয় । ভবানীর সন্ন্যাসী পিতা ফকিরের বেশে মোগল শিবিরে

গিয়েছিলেন । (২ ।৩) । ভবানীর সখি বাসন্তী যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে মৃত সৈনিকদের মধ্য থেকে তার প্রেমিক ভীম সিংহের দেহ খুঁজে বের করেছে । বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখরে' রমানন্দ স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আহত প্রতাপকে খুঁজে বের করেন । উদয় নারায়ণ ও দন্ডধরের মধ্যে বীরত্ব ও দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে । বঙ্কিমের 'আনন্দমঠে' এই দেশাত্মবোধের প্রকাশ সুপরিচিত । বাসন্তী মনে মনে ভীমসিংহকে পতি হিসেবে বরণ করেছিল । সেই স্বামীর চিতায় সে নিজেকে আহুতি দিয়েছে । প্রেমিক ভালবাসল কি কিনা দেখার দরকার নেই , বাসন্তী এই শ্রেনীর প্রেমিকা । বঙ্কিমের 'দুর্গেশ নন্দিনী'র আয়েষা , 'চন্দ্র শেখরে'র দলনীও এই শ্রেনীর প্রেমিকা ।

'চিত্র দর্শনে' ধর্মকথা তথা নামধর্মের কথা , শক্তি পূজার কথা প্রভৃতি বঙ্কিমের শেষ বয়সের উপন্যাস গুলির তত্ত্বালোচনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় ।'চন্দ্র - শেখর' উপন্যাসে রমানন্দ স্বামীর উপস্থিতি রয়েছে একটি বিরাট অংশ জুড়ে ।'চিত্র - দর্শন উপন্যাসে ভবানীর সন্ন্যাসী পিতার উপস্থিতিও তদনুরূপ । এই উপন্যাসে বাৎসল্য রস নেই , নায়কনায়িকাদের জীবনে সন্তান আসেনি । তাদের নিবাস হৃদয়রাজ্যে , সংসারের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই । এই সব বঙ্কিমের উপন্যাসেও বিদ্যমান । যুদ্ধ বিগ্রহ যা বঙ্কিমের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য তা' এই উপন্যাসেও দেখতে পাই । (২।৫) ভানুমতী মাধব বেশে দন্ডধরের কাছে কাছে থেকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দন্ডধরকে রক্ষা করেছে । দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে ছায়াও চন্দ্রগুপ্তকে অনুরূপ সহায়তা করেছে । কুমুরী ও ভবানীর সংলাপ 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র সীতা ও সরমার কথোপকথনকে স্মরণ করিয়ে দেয় । (১।১) । ভবানীর সখী বাসন্তীর নামটিও মেঘনাদ বধ কাব্যে'র প্রমীলার সখী বাসন্তীর স্মৃতি বিজড়িত । বঙ্কিমের মত দত্ত বর্য়াও 'পাঠক'কে নানা স্থানে সম্বোধন করেছেন । (৫।৬, ২।৬)। দুর্গ প্রসঙ্গ, নদীতে ঝাঁপ দেওয়া প্রভৃতি বঙ্কিমের উপন্যাসের মত এখানেও আছে । (২।৬) । বঙ্কিমের মত এই উপন্যাসও নানা খন্ডে বিভক্ত । এর মোট খন্ড সংখ্যা ছয় ।

।। শরৎ চন্দ্র গোস্বামী ।।

শরৎচন্দ্র গোস্বামী (১৮৮৭ - ১৯৪৪) ছোটগল্পের রচয়িতা হিসেবে প্রখ্যাত। তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'পানিপথের' (১৯৩০) পটভূমি প্রথম পানিপথের যুদ্ধ, সেই সঙ্গে আছে কয়েকজন নারীর প্রণয় ঘটনা । এখানেও ছদ্মবেশ, ষড়যন্ত্র ; যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি প্লট তথা বঙ্কিম চন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দেয় । নারী চরিত্র তিনটি -- গুলজার, বিমলা ও ফিরোজা বিবি । ফিরোজা বিবি কুতুব খাঁর ভগিনী । ফিরোজা দৌলতকে ভালবাসেন । হরলাল স্বদেশ প্রেমিক যুবক, বিমলা তার বাক্‌দত্তা । দৌলত খাঁর পত্নী গুলজার ব্রাহ্মণ পন্ডিত শিবনাথের ঘরে আত্মগোপন করে শেষে মেবার অভিমুখে যাত্রা করে, এবং পথে কামুক যুবক জেলাল কর্তৃক আক্রান্ত হন । জেলাল যেন বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের লরেন্স ফস্টরের (যে শৈবলিনীকে বলপূর্বক হরণ করেছিল) প্রতিরূপ । গুলজারের এই শোচনীয় অবস্থার সঙ্গে (তিনি সাধারণ নারী নন, পাঞ্জাবের বিদ্রোহী শাসন কর্তা দৌলত খাঁর পত্নী) 'চন্দ্র শেখর' উপন্যাসের রাজমহিষী দলনী বেগমের অসহায় অবস্থা তুলনীয় । ছদ্মবেশে দৌলত খাঁ ষড়যন্ত্র করে ফিরছিলেন । ছদ্মবেশ-প্রসঙ্গ বঙ্কিমের উপন্যাসেও আছে । ফিরোজা বিবি খুব করিৎ কর্মা অর্থাৎ কর্ম চঞ্চলা । বন্দীশালা থেকে কুতুব ও দৌলত খাঁকে তিনি মুক্ত করেছেন নিজে বন্দিনী অবস্থায় থেকে । মেবার, লাহোর, কাবুল ঘুরেছেন, দৌলত খাঁকে প্রেম নিবেদন করেছেন । তাঁর এই সব কর্মের দ্বারা তাঁকে 'কপাল কুন্ডলা'র পদ্মাবতীর (মতিবিবি) মত কর্মচঞ্চলা মনে হয় । মতিবিবি নবকুমারকে চেয়েছে, পায়নি, ফিরোজা বিবিও দৌলত খাঁকে চেয়েছে, পায়নি । মতিবিবি সম্রাটকে পেয়ে খুশী নয়, সে চায় নবকুমারকে, তার পূর্ব স্বামীকে।ফিরোজা বিবিও কুতুব খাঁকে পেয়ে খুশি নয়, সে চায় দৌলতকে । গুলজার ব্রাহ্মণ পন্ডিত শিবনাথের ঘরে আত্মগোপন করে থাকে । বঙ্কিমের কপালকুন্ডলাও কাপালিকের চোখে ধুলো দিয়ে নবকুমারকে নিয়ে অধিকারীর বাড়িতে গিয়ে উঠে । অধিকারী ও ব্রাহ্মণ, শিবনাথও ব্রাহ্মণ । 'পানিপথ' উপন্যাসেও বঙ্কিম নানাভাবে অনুসৃত হয়েছেন দেখতে পাই ।

****

সামাজিক উপন্যাস

।। রজনীকান্ত বরদলৈ (১৮৬৭ - ১৯৩৯)

রজনীকান্ত বরদলৈ শুধু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাই নয়, সামাজিক উপন্যাসেও তিনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। 'মিরিজীয়রী' (১৮৯৬) বরদলৈর প্রথম উপন্যাস। উত্তর লক্ষ্মীমপুরে সাব - ডেপুটী কালেক্টর হয়ে থাকার সময় তিনি মিরি ভাষা শিখে মিরি উপজাতির সামাজিক রীতিনীতি গভীর ভাবে জানবার প্রয়াস পান। ১৮৯৪ সালে নৌকো যোগে উত্তর লক্ষ্মীমপুর থেকে বরপেটা আসার পথে নৌকোর মধ্যে বরদলৈ এই উপন্যাস রচনা করেন। নায়ক নায়িকা জংকি ও পানেই শৈশবে সোবনশিরির বালিতে খেলেছিল, গীত গেয়েছিল। তাদের আশৈশবের নীরব ঘনিষ্ঠতাই যৌবনের প্রণয়ে রূপান্তরিত হয়। পানেইর পিতার ইচ্ছা তাঁর নির্বাচিত পাত্র কুমুদের হাতে কন্যাকে সম্প্রদান করেন। ফলে জংকির সঙ্গে পানেই পলায়ন করে এবং ধরা পড়ে। পিতার কাছে কন্যা ফিরে এল। কুমুদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করলে পানেই পুনরায় পলায়ন করে। তার অন্বেষণে যায় জংকি। উভয়েই 'গাছি মিরি'র হাতে বন্দী হয়। অসভ্য গাছি মিরির বিচারে বিশেষ করে পানেইর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী রেবাওের প্রতিশোধ মূলক প্রয়াসে তাদের উভয়ের প্রাণদন্ড হয় এবং তাদেরকে সোবনশিরির জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

এই উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের বালক বালিকা জংকি — পানেই বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখরে'র প্রতাপ — শৈবলিনীকে মনে করিয়ে দেয়। বাল্যপ্রেমে অভিশাপ আছে এই কথা যেমন সত্য প্রতাপ শৈবলিনীর জীবনে, তেমনি সত্য জংকি — পানেইর জীবনেও।

বঙ্কিম চরিত্রানুযায়ী রূপ বর্ণনা দিয়েছেন, যেমন পদ্মাবতী, কপালকুন্ডলা, শৈবলিনী ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এই উপন্যাসের জংকি, পানেই, কুমুদ প্রভৃতি চরিত্রের রূপ বর্ণনাও চরিত্রানুগ এবং কাব্যিক। বঙ্কিমের উপন্যাসের মত এই উপন্যাসেও

সাধু প্রসঙ্গ আছে – দেউধাই ও তার দেহে দেবতার ভর করা বিষয়টি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় (তৃতীয় অধ্যায়)। স্বপ্ন ঘটিত অলৌকিকতাও এই গ্রন্থে বিদ্যমান। পানেই, পানেইর মাতা উভয়েই স্বপ্ন দর্শন করেছে। (পঞ্চদশ অধ্যায়, সামরনি)। এই স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন নয়, বঙ্কিমের উপন্যাসের মতই তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের মধ্যে একাধিকবার 'পাঠক'কে সম্বোধন করতে অভ্যস্ত। এই উপন্যাসেও সেই রীতি লক্ষণীয়। (ষোড়শ অধ্যায়, সামরনি)। বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রকৃতির কাব্যিক বর্ণনা দৃষ্ট হয়। যেমন – 'কপাল কুণ্ডলা'র (১।৫) সমুদ্রতটের বর্ণনা। এই প্রকৃতি প্রীতি এই উপন্যাসেও বিদ্যমান। যেমন – সোবন শিরি নদী উপত্যকার বর্ণনা, মিরি গ্রামের বর্ণনা ইত্যাদি। সোবন শিরি উপত্যকা এই উপন্যাসে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র তপোবনের ভূমিকা নিয়েছে। তপোবন ব্যতীত যেমন শকুন্তলার কিছুই থাকেনা, তেমনি সোবনশিরি উপত্যকা বাদ দিলে এই উপন্যাসেরও কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা। বঙ্কিমের উপন্যাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য নদী। নদী এই উপন্যাসেও বিদ্যমান। বঙ্কিমের 'কপাল কুণ্ডলা' উপন্যাসটি নদী দিয়ে শুরু এবং নদীতেই পরি-সমাপ্তি। সেই দিক থেকে 'মিরি জীয়রী'র সাথে 'কপালকুণ্ডলা'র সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই উপন্যাসও নদী দিয়ে শুরু এবং পরিণতি নদীতে।

বঙ্কিমের সংলাপ গদ্যে, কিন্তু তা 'কাব্যময়', কখনো বা আবেগপূর্ণ। বঙ্কিমের উচ্ছ্বাসপূর্ণ সংলাপের একটি নমুনা দিচ্ছি –'' কপালকুণ্ডলা হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন – মৃদুস্বরে কহিলেন, 'তুমি তো জিজ্ঞাসা কর নাই।'' যখন এই কথা হইল তখন উভয়ে একেবারে জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার পশ্চাতে একপদ পরেই জল। এখন জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইয়াছিল। কপাল কুণ্ডলা একটি আড়ুরির উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, '' তুমি তো জিজ্ঞাসা কর নাই।'' নব কুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিলেন, 'চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব – বল মৃণ্ময়ি। বল বল – বল আমায়। – গৃহে চল। ...
... (৪।৯)

এবার' মিরিজীয়রী' থেকে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি আবেগময়তার নিদর্শন হিসাবে –

জড়কি —'' পানেই''

পানেই —'' জড়কি''

জড়কি —'' তই আছিছ''

পানেই —'' আছিছোঁ জড়কি''

জড়কি —'' তোকে এটা কথা সুধিববলৈ মন করিছো ।''

পানেই —'' কি কথা জড়কি সোধ''

জড়কি —'' ক চোন পানেই তই মোক ভাল পাওনে ?

পানেই —'' (হাঁ হি হাঁ হি)'' কেলেই নো লাগিছে তোক এই কথা জড়কি ?''

জড়কি —'' পানেই তই বেজার পালি নেকি ? তেন্তে একোকে নো সোধো ।

পানেই — (আকৌ হাঁ হি হাঁ হি)'' সোধ । নো সোধনো কেলেই —''

জড়কি —'' তেন্তে ক চোন — তই মোক মরম করনে ?''

পানেই —'' মই কব নোয়ারো''

জড়কি —'' মই বুজিলো পানেই । তই মোক ভাল না পাও । নহলেনো আজির নাচত তই মাজে মাজে কুমুদর ফালে কেলেই বারে বারে চাইছিলি ।'' (৩৮ অধ্যায়)

(তৃতীয় অধ্যায়) ।

বঙ্কিমের নায়িকাদের বাস নায়কদের হৃদয়রাজ্যে । বরদলৈর পানেইর দেহটিই থাকে ঘরে , কিন্তু মন পড়ে থাকে জড়কির হৃদয়ে । বঙ্কিমের মত এই উপন্যাসেও সমান্তরাল প্রেম - কাহিনী আছে । একটি জড়কি — পানেইর , অন্যটি জড়কি — ডালিমীর । ডালিমী একজন আদর্শ প্রেমিকা । তার প্রেমের সঙ্গে স্কটের IvanHoe র — রেবেকা , লিটনের The Last Days of Pompei - র'নিদিয়ার প্রেমের সঙ্গে তুলনা করা যায় , তুলনা করা যায় বঙ্কিমের আয়েষা , দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের ছায়া চরিত্রের সঙ্গে । এই সব চরিত্র প্রেমসর্বস্ব , এদের

পায়ে মাটির ঘ্রাণ নেই । এরা দিতেই আসে , পায়না । যদিও বা কিছু পায় , প্রতিদানে দেয় অনেক বেশী ।

নায়িকা চরিত্র সম্যক্ পরিস্ফুটনের জন্য দাসী বা সখী জাতীয় চরিত্র বা সমবয়স্কা আত্মীয়া বঙ্কিমের উপন্যাসে দেখা যায় । সংস্কৃত সাহিত্যেও তা বিদ্যমান । যেমন – অনসূয়া প্রিয়ংবদা চরিত্র বাদ দিয়ে শকুন্তলা চরিত্রের কথা ভাবা যায় না । বঙ্কিমের উপন্যাসের লুৎফুন্নেসার পেষমন , কপালকুণ্ডলার শ্যামাসুন্দরী ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 'মিরি জীয়রী' উপন্যাসের xxxx পানেইর রত্নী তেমনি একটি চরিত্র । বঙ্কিমের নায়ক নায়িকা কদাচিৎ জনক জননী । পানেই-জঙ্কির মিলনই হয়নি , কাজেই বাৎসল্য রসের অবকাশ সেখানে কোথায় ? বঙ্কিম পরিচ্ছেদের নামকরণ করেন , যেমন কপালকুণ্ডলার প্রথম খণ্ডের xxxx প্রথম পরিচ্ছেদের নাম –' সাগর সঙ্গমে' । এই উপন্যাসেও সে রীতি অনুসৃত । যেমন প্রথম অধ্যায়ে 'নৈর পারত', দ্বিতীয় অধ্যায় 'লক্ষ্মীমপুর নগরের ওপরত' ইত্যাদি ।

বারেগাম নায়ক নায়িকার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন । সেই কথা শুনে জঙ্কি কাঁদছে , কাঁদছে পানেইও । পানেই কাঁদতে কাঁদতে তখন জঙ্কির উদ্দেশ্যে এই বিহুগানটি গেয়েছিল - - - -

ন করিবয়ে ঐ
না কান্দিবিxxxxx চেনেও ঐ
মনলৈ যে নানিবি শোক
ইপুরি যে এরি ঐ
পামেগৈ যেরে পাম ঐ
দুখরে যে পরিব ওর । (ষোড়শ অধ্যায়)।

- এ দৃশ্য বিস্মৃত হওয়া যায় না ।

বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা'র নায়ক - নায়িকার নদীতে পতন ও নিরুদ্দেশ হওয়ার দৃশ্য বড়ই করুণ । কিন্তু এই কারুণ্যও ম্লান হয়ে যায় জঙ্কি – পানেইর মর্মান্তিক মৃত্যুর কাছে । নদী জলে ভাসমান জঙ্কি – পানেইর মৃত দেহের বর্ননা বরদলৈ

এই ভাবে দিয়েছেন -- (জল থেকে তোলার পর দেখা যায়)'দ্যো যোরা নগা । তৈজ ইটোর ওপরত সিটো তলে ওপরে বান্ধা । সিহঁত দুইরো পলেদি এডাল শেল । বুকুত এ ভাল কঁকালত এ ভাল । ('সামরনি') ।

বঙ্কিমের উপন্যাসে একটি শুচিশুভ্র পরিমণ্ডল সর্বদা বিরাজিত । 'মিরিজীয়রী' তেও তা বিদ্যমান । এখানে কেবল শুচি শুভ্র পরিবেশই রচিত হয়নি, মাঝে মধ্যে লেখকের অধ্যাত্ম ভাবুকতারও পরিচয় মিলে । যেমন -'' জগদীশ্বর তুমি সিহঁতক প্রয় সুখর বাটলৈ আনিছিলা, কিন্ত হঠাতে নো আকৌ কেলেই এনে বিসংগতি ঘটালা ? প্রভু, তোমার মহিমা বুজা বরটান । (পঞ্চদশ অধ্যায়)।

।। নবীন চন্দ্র বরদলৈ ।।

নবীন চন্দ্র বরদলৈর (১৮৭৫ - ১৯৩৬) 'শেয়ালি' উপন্যাসটির একটি ভাল উপন্যাস হওয়ার সম্ভাবনা ছিল - লেখক যে ভাবে কাহিনী শুরু করেছেন, তাতে এমন ধারণা করা অসঙ্গত হবে না । কিন্ত এই সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গিয়েছে শেষ পর্যন্ত ।'শেয়ালি' শব্দের অর্থ শৈবাল । নায়িকার নামেই উপন্যাসের নাম । স্মরণ করা যেতে পারে বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নায়িকার নাম শৈবলিনী । প্রতাপ ও শৈবলিনীর যখন বাল্য প্রণয় হয় তখন প্রতাপ কিশোর - বয়স ষোল, আর শৈবলিনীর বয়স আট । 'শেয়ালি'তেও বাল্য প্রেম রয়েছে । সে প্রেম শেয়ালি ও

পলাশের মধ্যে ('2') । বঙ্কিমের উপন্যাসের মত জ্যোতিষ প্রসঙ্গ এই উপন্যাসেও আছে । পুরন্দর শেয়ালির সঙ্গে স্বপুত্রের বিবাহ ঠিক করার পূর্বে কন্যার কোষ্ঠি দেখেন ('১')। বঙ্কিমের উপন্যাসে নায়কের পিতামাতা গৌণ । এখানেও পলাশের পিতা মৃত । মা যদিও আছেন , তবে তাঁকে বাদ দিলেও গল্পের স্বাদ গ্রহণে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না ।

পলাশের সঙ্গে চন্দ্রশেখরের সাদৃশ্য আছে । উভয়েই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ । উভয়েরই বিবাহে অনিচ্ছা , তবু উভয়েই বিবাহ করেছেন । চন্দ্রশেখর যখন বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স তিরিশ উত্তীর্ণ । চন্দ্রশেখর ও পলাশ উভয়েরই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে । চন্দ্রশেখর বলেছিলেন তিনি সুন্দরী বিবাহ করবেন না , কিন্তু সুন্দরীকেই বিবাহ করেছেন। পলাশের 'ধনুর্ভঙ্গ পণ' তিরিশ বছর বয়স না হলে বিবাহ করবেন না , তিনি তিরিশের পূর্বেই বিবাহ করেছেন ।

শৈবলিনীর বিবাহ প্রত্যাশিত ছিল প্রতাপের সঙ্গে , হল চন্দ্রশেখরের সঙ্গে । শেয়ালির বিবাহ হবার কথা পুরন্দর বাবুর পুত্রের সঙ্গে , হল পলাশের সঙ্গে । 'চন্দ্র শেখরে' শৈবলিনীর একটি স্নানের দৃশ্য আছে (১।২) ।'শেয়ালি'তেও অনুরূপ দৃশ্য আছে । (২)। স্নানরতা শৈবলিনী সুন্দরী , স্নানরতা শেয়ালিও সুন্দরী । উভয় লেখকের রূপ বর্ননা মনোরম এবং কাব্যিক ।

বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসের মত এই উপন্যাসের নায়িকাও সন্তানবতী নয় ।

বঙ্কিম স্থানে স্থানে 'পাঠক'কে স্মরণ করেন , বরদলৈওতা করেছেন ।(৪)

~~(৪)~~ । বঙ্কিমের উপন্যাসে চিঠি প্রসঙ্গ প্রায়ই দেখা যায় । এই উপন্যাসেও চিঠি

প্রসঙ্গ আছে । পুরন্দর শেফালির পিতাকে চিঠি দিয়েছে (৩) । শেফালির পিতাও পুরন্দরকে চিঠি দিয়েছে । ('৬') । তবে উপন্যাসটি রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি বলে এই সব সাদৃশ্য নেহাৎ বহিরঙ্গ বিষয়রূপে প্রতিভাত হবে ।

****

।। দৈবচন্দ্র তালুকদার ।।

দৈবচন্দ্র তালুকদারের (১৯০০ - ১৯৬৭) উপন্যাসে সামাজিক সমস্যার সঙ্গে জড়িত হয়েছে আদর্শবাদ ও স্বাদেশিকতা । তালুকদারের' ধুমুনী কুঁমুনী'তে (১৯২২) নায়ক চেয়েছিল কদমীকে , কিন্তু পেল বীণাকে । শেষে বীণাকে পিতৃ গৃহে প্রেরণ করে নিজে গৃহত্যাগ করল , পরে অসুস্থ অবস্থায় এক গণিকার সেবা লাভ করল । এই গণিকা প্রেমে ব্যর্থকামা । তাই সে নায়ক নোমলের উপর প্রতিশোধ নেয় , ফলে নায়ককে জেল বাস করতে হয় । জেল থেকে বেড়িয়ে নায়ক আবার নিরুদ্দেশ হল । শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও গল্পে পতিতারা নতুন মর্যাদা পেয়েছেন । অন্যান্য সাহিত্যের অনেক ঔপন্যাসিকও তাঁদের উপন্যাসে - গল্পে গণিকা চরিত্র তুলে ধরে বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছেন ।

' আগ্নেয়গিরি' (১৯২৪) উপন্যাসের কনক শৈশবে খুব দুষ্ট ছিল । বিধবা মায়ের মৃত্যুর পর সে দূর সম্পর্কীয় মামার ঘরে আশ্রয় নেয় । মাতুলালয়ে অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারে সে বুঝতে পারে এই ভাবে জীবন কাটালে চলবে না । ফলে তার পাঠে মনোযোগ আসে । মাতুলালয়ে অত্যাচারের সময় প্রতিবেশী যদু বরুয়ার কন্যা আইকনের সহানুভূতি সূচক দু'একটি কথা তার মনে রেখাপাত করে ।কলেজের শেষ

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হাকিম হন কনক । ইতিমধ্যে আইকনের বিবাহ হয়ে গেল ।

বিবাহের আগের দিন কনকের সাথে দেখা করার ইচ্ছা ছিল আইকনের , তা' আর হয়ে উঠল না । কনক বদলি হয়ে অন্যত্র গেল ।আইকন পতিগৃহে অতীব কষ্টে দিন কাটায় । সুরাধিক্যের কারণে আইকনের পতির মৃত্যু হয় । বিধবা আইকন পিতৃগৃহে আসে । কনক আইকনকে নিজের কাছে রাখে , তার জন্যে সমাজে কুৎসা রটে । তা' শুনে আইকনের দাদা আইকনকে নিতে আসে । কনক তখন সমাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় ও আইকনকে বুকে টেনে নেয় ।

কনক বিধবা আইকনকে বিবাহ করেছে । এই কাহিনীতে শরৎচন্দ্রের কাহিনীর প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয় । শরৎ চন্দ্রের 'বড়দিদি' (১১১৩) গল্পের নায়িকা মাধবী সুরেন কে ভালবাসত । বিধবা বিবাহ সম্পর্কে মাধবীর যে সংকোচ ছিল সুরেন্দ্রের মৃত্যুতে তা' ধুয়ে মুছে গিয়েছে । এখানে কনকের মধ্যেও যে সংকোচ ছিল , তা অপসারিত হয়েছে । কনক শৈশবে দুষ্ট ছিল । তার মা ছিল বিধবা । মায়ের মৃত্যুর পর মামার কাছে সে মানুষ (যদিও দূর সম্পর্কীয়) । কনকের এই সব বৃত্তান্ত রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের ফটিককে স্মরণ করিয়ে দেয় । ফটিকও দুষ্ট ছেলে । তার মাও বিধবা । সেও মামার কাছে পড়তে আসে । মামীর অত্যাচার তাকেও সহ্য করতে হয়েছে । আইকন - কনক পরস্পর পরস্পরকে শৈশব থেকে ভালবাসে , তাদের বাল্যপ্রেম যৌবনের প্রেমে পরিণত হয় । কনক বিবাহ করে বিধবা আইকনকে । রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' উপন্যাসটিতে বিধবা বিবাহ সমর্থিত হয়েছে । মূলতঃ বিধবা বিবাহ প্রচারই উক্ত উপন্যাসের লক্ষ্য ছিল । দেবচন্দ্র তালুকদার রমেশ চন্দ্র দত্তের 'সংসার' থেকেও এই উপন্যাসের প্রেরণা পেয়েছেন মনে হয় ।

'বিদ্রোহী' (১১৩১) উপন্যাসে কনক - আইকনের পরবর্তী জীবন কথা বিবৃত করেছেন তালুকদার । রমেশ চন্দ্র দত্ত ও তাঁর 'সংসার' উপন্যাসের কাহিনী টেনে এনেছেন 'সমাজে' । সমাজের ভ্রূকুটি ভ্রূক্ষেপ না করে কনক আইকনকে বিয়ে করে দেশোদ্ধারের কার্যে ব্রতী হন । গ্রামে - গঞ্জে কনক যে বিদ্রোহের আয়োজন

করেছিলেন তার বিবরণ সারা উপন্যাস জুড়ে । ছদ্মবেশে কেবল দেশের ভিতর নয় দেশের বাইরে চীন , আফগানিস্তান রাশিয়াতেও কনক গিয়েছিলেন । বলা বাহুল্য কাহিনীর এই অংশে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসকে স্মরণ করিয়ে দেয় । 'পথের দাবী' উপন্যাসের নায়ক বিপ্লবী সব্যসাচীও ছদ্মবেশে বিভিন্ন স্থানে গিয়েছিলেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অনেকউপন্যাস বঙ্গ সাহিত্যে রচিত হয়েছে । অসমীয়া সাহিত্যেও বৈপ্লবিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচিত হয়েছে । 'বিদ্রোহী' তার মধ্যে একটি । তালুকদারের 'অপূর্ণ' (১৯৩১ - ৩২) 'আবাহন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । এই উপন্যাসটিও বৈপ্লবিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত । এটি রচিত হয় অসহযোগ আন্দোলনের সময় । এতে প্রেমধর ও পূর্ণিমার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে অযথা কলঙ্ক রটার জন্য প্রেমধর গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে । তখন তার জীবনে আসে অধ্যাপক কন্যা হেমপ্রভা । প্রেমধর , কার্তিক , হেম ও অধ্যাপকের আলাপ আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে লেখকের ব্যক্তিগত ধারণা ও আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে । প্রেমধর - পূর্ণিমার প্রণয় কথার সমান্তরাল আরো একটি প্রণয় কথা আছে - তা হল হেম প্রভা ও কার্তিকের প্রণয় কথা । অবশ্য দ্বিতীয় প্রণয় কাহিনী দানা বেঁধে উঠতে - না-উঠতেই লেখক হেমের জীবন থেকে কার্তিককে সরিয়ে আনেন । প্রেমধরের সঙ্গে হেমের নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি হয় । ফলে কার্তিক বৈষয়িক জগৎ থেকে দূরে চলে এসেছে , এবং আদর্শ - মরীচিকার পশ্চাধাবনের সুযোগ পেয়েছে । সেই সঙ্গে উপন্যাসে আছে আফিম সেবনের কুফল , স্বদেশীবস্ত্রের প্রচলন ইত্যাদি বিষয় । কার্তিক বিলাত ফেরত । এই চরিত্রের মাধ্যমে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার কথা ব্যক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন । 'জয় বলিয়া' এই উপন্যাসের একটি পার্শ্বচরিত্র । তার মুখে শ্লোগান - 'আজি আরু কালি' । পরোপকারী এই চরিত্রটি নিমজ্জমান নৌকো রক্ষা করেছে , বশিষ্ঠের পাথর থেকে পিছলে পরা হেমকে আচম্বিতে এসে রক্ষা করেছে । আসন্ন মটর - চাপার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে গিয়ে আহত হয়েছে । মিথ্যা আদর্শের প্রতীক ভেঙ্গে সে চুরমার করেছে । প্রেমধর ও পূর্ণিমার প্রণয় কথার মধ্যে লেখক প্রেমধরকে সহরে এনে পূর্ণিমার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন , ওদিকে কার্তিকের জীবন থেকে হেমকে সরিয়ে এনে প্রেমধরের জীবনের সঙ্গে কেন যুক্ত করলেন ? 'গোরা'র গোরা -

সুচরিতা, বিনয় - ললিতার মত হবে বলে ? এই উপন্যাসে নায়ক নায়িকার প্রেম যেন দেশোদ্ধারের আদর্শবাদে প্রতিষ্ঠিত । প্রেমধর - হেমের বিবাহ ঠিক হল । কন্যার ঘরে প্রেমধর মূর্চ্ছা গেল, জ্ঞান ফিরে পেয়েছে নায়ক । বিবাহ সম্পন্ন হল কিনা, তা' বুঝা গেল না । 'গোরা' উপন্যাসের গভীরতর আদর্শ অবশ্যই এই উপন্যাস অনুসৃত হয়নি, গল্পাংশের ও চরিত্রের কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে এইমাত্র । দৈবচন্দ্র তালুকদারের 'আদর্শ পীঠে' (চতুর্থ দশকে রচিত) একজন আদর্শবাদী যুবকের সংস্কার প্রচেষ্টা ও স্বাবলম্বী উদ্যোগের শোকাবহ পরিণতি দেখানোর প্রয়াস আছে । গ্রামের মৌজাদারের শিক্ষিত পুত্র শ্রীধর । সে পিতার ইচ্ছানুযায়ী সরকারী চাকরী না নিয়ে গ্রামের উন্নতি সাধন করতে দৃঢ় সংকল্প হয়, ফলে পিতা তাকে ত্যজ্য পুত্র করেন । কিছুদিন শ্রীধর গারো পাহাড়ে কাটায়, তারপর সরকারের সন্দেহ ভাজন হয়ে জেলে যায় । জেল থেকে বেড়িয়ে সে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করতে মনস্থ করে । দু'একজন গ্রামের তরুণ তাকে সাহায্য করলেও অধিকাংশ গ্রামবাসী তার কুৎসা রটায় । গ্রামের বিধবা কন্যা পার্বতীকে সে শৈশব থেকেই স্নেহ করত । 'আদর্শ-পীঠ' স্থাপনের পর পার্বতীকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করায় শ্রী ধরের বিরুদ্ধে কলঙ্ক রটে । মানসিক দুর্বলতার জন্য শ্রীধর পার্বতীকে আশ্রমে আশ্রয় দেয়না । পার্বতী মনোদুঃখে আত্মহত্যা করে । স্থানীয় লোকের সহানুভূতির অভাবে শ্রীধর অবশেষে আশ্রম ত্যাগ করতে বাধ্য হন । ভগ্নোৎসাহ হয়ে শ্রীধর গ্রাম পরিত্যাগ করে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায় ।

এই উপন্যাসটি স্মরণ করিয়ে দেয় শরৎ চন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসটিকে । শ্রী ধরকে যে সমাজের সঙ্গে লড়তে হয়েছে, সে সমাজ পঙ্গু, নির্জীব ও ব্যাধিগ্রস্ত । শরৎচন্দ্রের রমেশকেও এই সমাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়েছে । শরৎচন্দ্রের রমা সুখী হয়নি, তালুকদারের পার্বতীও সুখী হয়নি । কিন্তু উভয়েই একনিষ্ঠ প্রেমিকা । একজনের প্রেম ব্যক্ত, অন্যজনের অব্যক্ত - এই মাত্র । দু'টি সমাজ সমালোচনা মূলক উপন্যাস ।

****

।। চন্দ্রধর বরুয়া ।।

চন্দ্রধর বরুয়ার (১৮৭৪ - ১৯৬১) খ্যাতি কবি ও নাট্যকার হিসেবে । তিনি উপন্যাসও লিখেছেন , নাম 'শান্তি' । এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে কৃষ্ণকান্ত ও রাধিকার প্রণয়কথা , বিবাহ এবং তাদের দাম্পত্য জীবন । এই উপন্যাসে জ্যোতিষ শাস্ত্র , নদী , মন্দির , সন্তরণ , নদীর পাড় ভেঙে পড়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয় বঙ্কিমের নানা উপন্যাসকে স্মরণ করিয়ে দেয় । বঙ্কিমের মত প্রতিটি পরিচ্ছেদ একেকটি নামে চিহ্নিত । (যেমন 'বলিয়া কুকুর', 'ঘাটত পতা মেল' ইত্যাদি) যদিও পরিচ্ছেদ কথাটি নেই , খন্ড নেই । বঙ্কিমের ভঙ্গিতে চন্দ্রধর বরুয়াও বলেছেন – '' কৃষ্ণক ইমানতে এরিখে , আমি এতিয়া রাধীয়ে অত দিন কি করিলে তার কথা কও'' । ('সম্বাদ' শীর্ষক পরিচ্ছেদ) অন্যত্র বলেছেন – '' পাঠক পাঠিকা সকল । আপনালোকে কিন্ত এওঁ লোকক নুদুষিব '' । (চিনাকি শীর্ষক পরিচ্ছেদ)। রাধিকা যে নদী ঘাটে স্নান করছিল সেই ঘাটে স্নান করার জন্য কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ জানায় । (চিনাকি)এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রতাপ শৈবলিনীর কথা মনে জাগা স্বাভাবিক । 'চন্দ্রশেখরের' উপক্রমণিকার প্রথম পরিচ্ছেদে নদী তীরে (ভাগীরথী) প্রতাপ শৈবলিনীর প্রণয় দৃশ্য আছে । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় । নদী বঙ্কিমের উপন্যাসে একরকম অপরিহার্য ।'শান্তি'তেও নদী বিদ্যমান । প্রতাপ শৈবলিনী যখন ভাগীরথী তীরে বাল্য ক্রীড়া করছিল তখন সেখানে একটি 'গাই' ছিল (উপক্রমনিকা / ১) এই উপন্যাসেও নদীর ঘাটে নায়ক নায়িকা গরুর কথা বলেছে ('যমুনা ঘাট') । বঙ্কিমের উপন্যাসে চিঠির প্রসঙ্গ থাকেই । যেমন মতিবিবি কপালকুণ্ডলাকে চিঠি দিয়েছিল । ('কপাল কুণ্ডলা' - ৪ । ৩) । 'দুর্গেশ নন্দিনী'র ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নাম – বিমলার পত্র । ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের নাম আয়েষার পত্র ইত্যাদি । 'শান্তি' উপন্যাসেও একটি পরিচ্ছেদের নাম 'চিঠি', পরেই 'চিঠির ব্যাখ্যা' নামে আরেকটি পরিচ্ছেদ আছে । স্বপ্ন

দর্শন বঙ্কিম উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'শান্তি' উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদের নাম 'সপোন' (স্বপ্ন)। এই পরিচ্ছেদের রাধী স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নের বর্ননা লেখকের ভাষায় — "। মাজরাতিলৈ রাধীয়ে সপোনত দেখিলে তেওঁ যেন সচাঁজেয়ে সরু নাও এখনত উঠি, নৈয়েদি করবালৈ গৈছে। নৈর কোবাল সোঁতে যেন নাওখন বেগেরে উটাইনি চাক নৈয়াত পেলালেগে। নাও বুরোঁ বুরোঁ হৈছে, পাচ মুহূর্তত তেনেই বুরিব। তেনেতে যেন আন এখন নায়েরে কার পরা কৃষ্ণ ওলাল হি; আরু যেন কৃষ্ণই খাপমারি ধরি তেওঁক নিজর নাওলৈ তুলি লৈ গ'ল। ইয়াকে দেখি রাধীয়ে সারপালে''। এই স্বপ্ন 'কপাল কুণ্ডলা' উপন্যাসের কপাল কুণ্ডলার স্বপ্নটিকে স্মরণ করিয়ে দেয় —'' বাতাস উঠিল বৃহৎপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তরঙ্গ মধ্য হইতে একজন জটাজুটধারী প্রকাণ্ড - কায় পুরুষ আসিয়া কপালকুণ্ডলার নৌকা বামহস্তে তুলিয়া সমুদ্র মধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল। এমত সময়ে সেই ভীমকান্তশ্রীময় ব্রাহ্মণবেশধারী আসিয়া তরী ধরিয়া রহিল। সে কপাল কুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিল '' তোমায় রাখি কি নিমগ্ন করি?'' অকস্মাৎ কপাল কুণ্ডলার মুখ হইতে বাহির হইল, '' নিমগ্ন কর''। ব্রাহ্মণ বেশধারী নৌকা ছাড়িয়া দিল। তখন নৌকাও শব্দময়ী হইল, কথা কহিয়া উঠিল। নৌকা কহিল 'আমি আর এ ভার বহিতে পারি না, আমি পাতালে প্রবেশ করি''। ইহা কহিয়া নৌকা তাহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল।

ঘর্মাক্তকলেবরা হইয়া কপালকুণ্ডলা স্বপ্নোত্থিতা হইলে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, দেখিলেন প্রভাত হইয়াছে।'' (৪১০)

লক্ষণীয় এই যে বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা' শুধু চন্দ্রধর বরুয়াকে নয়, অন্যান্য উপন্যাসিকদেরও প্রভাবিত করেছে। বঙ্কিমের মত এখানেও সন্ন্যাসী প্রসঙ্গ আছে। 'ভ্রমণ' শীর্ষক পরিচ্ছেদে কাশীতে কৃষ্ণের সঙ্গে এক সন্ন্যাসীর দেখা হয়েছে। সন্ন্যাসী বলেছে —'' তোমার ললাটত শান্তি রেখা ওলাইছে। অচিরতে অশান্তি দূর হব।'' এই সন্ন্যাসী রামভজন পাঁড়ে। রামভজনের সঙ্গে রাধীর বিবাহ ঠিক হয়েছিল। রাধী তাকে সব খুলে বলায় রাম ভজন নিরুদ্দেশ হয়ে

যায় । তার কারণ রাধীকে রামভজন ভালবাসে । রাধীকে না পাওয়াই তার সন্ন্যাসের মূল কারণ । কৃষ্ণ কলকাতায় থেকে লেখা পড়া শিখেছে । সেখান থেকেই বি,এল পাশ করে উকিল হয় । রাধী 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা পড়ত । সে খবরের কাগজে জানতে পেরেছে কৃষ্ণ বরুয়া নামে এক যুবক ট্রাম গাড়ীর তলায় পড়ে মারা গেছে । সেই থেকে রাধী বৈধব্য পালন করে করছে । অবশেষে নায়ক নায়িকার মিলন হয়েছে । লক্ষণীয় , এখানে বাংলার সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি সৃষ্টি করেছেন লেখক ।

****

।। হরেশ্বর শর্মা বরুয়া এবং অন্যান্য ।।

হরেশ্বর শর্মা বরুয়ার 'কুসুম কুমারী' ১১০৫ সালে প্রকাশিত হয় । এই ক্ষুদ্র উপন্যাসে প্রমোদকুমার – কুসুমকুমারী ও মোহনচন্দ্র – সেউতীর প্রেম কথা বর্নিত হয়েছে । প্রমোদকুমার ও কুসুমকুমারী একই স্থানে মানুষ , উভয়ে প্রণয়াবদ্ধ । বিধবা রূপহী প্রমোদকুমারের মাসি । তাঁর সঙ্গে দুর্গাচরণ ও বসন্ত ব্যানার্জির অবৈধ ঘৃন্য যৌনাসক্তি বর্নিত হয়েছে । রূপহীর পরিণাম করুণ আর তা'ই স্বাভাবিক । রূপহী 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয় । রোহিনীর বিপরীত ভ্রমর । রূপহী যেমন অসৎ, তেমনি সৎ কুসুমকুমারী ।এতদ্ব্যতীত রোহিনী ও রূপহী দু'জনেই বাল্যবিধবা । দু'জনের পরিনতিই দুঃখজনক ।

চিন্তাহরণ পাটগিরির 'সংসার চিত্রের' (১১২১) নায়ক অমূল্য, নায়িকা প্রতিমা । অমূল্য উচ্চ শিক্ষিত যুবক । সরকারী চাকুরে । শ্বশুর শাশুড়ীর অত্যাচারে 'বধূ' প্রতিমা অতিষ্ঠ । শেষে প্রতিমার মৃত্যু হয় সান্নিক জ্বরে । অমূল্য খুব বাধ্য ছেলে । প্রতিমার চিঠিপত্রে সব জেনেও নীরব ।অমূল্য রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্পের নায়ককে স্মরণ করিয়ে দেয় । এই গল্পের বধূকেও পতিগৃহে শ্বশুর শাশুড়ীর অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে । অমূল্যর

পত্নীর মৃত্যু হয়েছে। 'দেনা পাওনা' গল্পের নায়কের পত্নীরও মৃত্যু হয়েছে। অমূল্য সন্ন্যাসী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নায়কের অবশ্য তা' হয়নি।

নবীন চন্দ্র ভট্টাচার্যের 'চন্দ্র প্রভা' প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে। মাতৃহীনা চন্দ্র প্রভার যথা সময়ে শিক্ষিত চরিত্রবান যুবক প্রসন্নর সঙ্গে বিবাহ হয়। বিবাহে প্রতিশ্রুত যৌতুক না পাওয়ায় শ্বশুরালয়ে বধূর উপর অত্যাচার হয়। এই কাহিনীটিও রবীন্দ্রনাথের 'দেনা পাওনা' গল্পটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

স্নেহলতা বরুয়ার 'বীণা'র (১৯২৬) নায়িকা বীণা সম্ভ্রান্ত বংশজা। পিতা নগেন বরুয়া বিধবা কন্যাকে কলকাতার ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থে পাঠান। বীণার সখী হল অমিয়া। অমিয়ার ভাই প্রকাশের সঙ্গে বীণার প্রণয় হল। নায়ক পিতার অনুমতি না পেয়ে বিলাত যান, তাই তিনি ত্যাজ্য পুত্র। বিলাত থাকতেই তাঁর বালিকা পত্নীর মৃত্যু ঘটে। বীণা কুসংস্কার থেকে অনেকটা মুক্ত হলেও বিধবা বিবাহে তার সংকোচ আছে। একদিকে হৃদয়ের আকর্ষণ অন্যদিকে সামাজিক নিষেধ। অবশেষে অবশ্য নায়ক নায়িকার মিলন হয়েছে। বঙ্কিম বিধবা বিবাহকে অনুমোদন দিতে দ্বিধা গ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু রমেশ চন্দ্রের 'সংসার' উপন্যাসে বিধবা বিবাহ ছাড়পত্র পেয়েছে। 'বীণা' পড়তে-পড়তে এই 'সংসার' উপন্যাসের কথা তাই মনে জাগা স্বাভাবিক। 'বীণা'র নায়কের বাস কলকাতা, নায়িকার শিক্ষা কলকাতায়। 'বীণা' পড়তে-পড়তে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসের কথাও মানসপটে ভেসে উঠতে পারে। 'চোখের বালি'র বিনোদিনী বালবিধবা। তাঁর চিত্তে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার জাগরণ ও তার মানসিক পরিবর্তনের টানা পোড়েন উক্ত উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বরুয়ার বীণা চরিত্রেও এই মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছে।

চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানীর 'পিতৃভিটা' ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। মন্দর চমুয়ার

বদান্যতার ফলে সর্বস্ব হারিয়ে ঋণ গ্রস্ত হয়েছেন। তাঁরই কন্যা মাধবী। সে পিতার মৃত্যুর পর পিতার সম্মান বংশ মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রেমাস্পদ মাধবকে পরিত্যাগ করে দামোদরকে বিবাহ করে। দামোদর মাধবীর কথায় উত্তমর্ণের হাত থেকে মাধবীর পিতার বাস্তুভিটা উদ্ধার করে। মাধবী অভিজাত পড়তি ঘরের মেয়ে। এই মেয়েটির পিতৃকুলের অবস্থা রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগে'র কুমুদিনীর পিতৃকুলের অবস্থাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মরণ করিয়ে দেয় শরৎচন্দ্রের দেবদাস পার্বতীকে। দেবদাস উপন্যাসে শরৎ চন্দ্র দেবদাস ও পার্বতীর বাল্যপ্রেম সহানু - ভূতির সঙ্গে বর্ননা করেছেন। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও দেবদাসের ভীরুতার জন্য এই প্রেম ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু বাল্যপ্রেমের স্মৃতি ছিল তাদের সমগ্র অন্তর জুড়ে। ভুবন চৌধুরীর গৃহিনী হয়ে পার্বতী নিজ স্বামী ও পরিবারের প্রতি কর্তব্য নিখুঁত ভাবে পালন করেছে। দেবদাস নিরাশ প্রেমের তাড়নায় উচ্ছৃংখলতার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। পরিণামে অত্যন্ত করুণ ভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। মাধব ও মাধবী বাল্যকাল থেকেই ঘনিষ্ঠ। দামোদরের স্ত্রী হয়েও পার্বতীর মত মাধবী বাল্যপ্রেমিককে বিস্মৃত হয়নি। দেবদাস ব্যর্থ - প্রেমের জ্বালায় উচ্ছৃংখলতার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। এখানে মাধব মাধবীকে বিস্মৃত হওয়ার জন্য পঞ্চ মকারের উপাসনায় আত্মনিয়োগ করেছে। মাধব ও দেবদাস উভয়েরই ক্ষয়রোগে মৃত্যু হয়েছে। মাধবী মাধবকে শুশ্রূষা করেছিল, যার সুযোগ পার্বতী পায়নি। এই স্থানে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' (১৯১৭-৩৩) উপন্যাসের কথা মনে আসাও স্বাভাবিক। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের বাল্য সখী ও প্রেমিকা – সেও শ্রীকান্তকে সেবা শুশ্রূষা করেছিল।

।। আলোচিত উপন্যাসিকগণ ।।

নাম		পৃষ্ঠা
পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া	—	২০০
রজনীকান্ত বরদলৈ	—	২০৫, ২২৩
লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া	—	২১৭
হিতেশ্বর বরবরুয়া	—	২১৯
হরিনারায়ণ দত্তবরুয়া	—	২২০
শরৎচন্দ্র গোস্বামী	—	২২২
নবীনচন্দ্র বরদলৈ	—	২২৭
দৈবচন্দ্র তালুকদার	—	২২৯
চন্দ্রধর বরুয়া	—	২৩৩
হরেশ্বর শর্মা বরুয়া ও অন্যান্য	—	২৩৫

****

।। সূত্র নির্দেশ ।।

১। অসমীয়া উপন্যাসর ভূমিকা — ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা ; প্রথম অধ্যায়

২। ঐ, পৃঃ

৩। বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা — শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২২, ৫ম সং (১৯৬৫)।

৪। অসমীয়া সাহিত্যত দৃষ্টিপাত — শ্রী হেমন্ত কুমার শর্মা, পৃঃ ২০৮।

৫। অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা — ডঃ মহেশ্বর নেওগ, পৃঃ৩১৩।

৬। অসমীয়া সাহিত্যর ঐতিহাসিক উপন্যাস — ডঃ শৈলেন ভরালী, পৃঃ ১৭।

৭। এই দেশ আসাম — ডঃ দেব রায়, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। পৃঃ

৮। অসমীয়া উপন্যাসর ভূমিকা — ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা, চতুর্থ অধ্যায়। পৃঃ

৯। ঐ, পৃঃ

১০। অসমীয়া সাহিত্যর ঐতিহাসিক উপন্যাস — ডঃ শৈলেন ভরালী, পৃঃ ১০-১১।

১১। ঐ, পৃঃ

১২। এই দেশ আসাম - — ডঃ দেব রায়, পৃ: ৬৭।

****

(ঘ) ছোট গল্প

আধুনিক অসমীয়া ছোটগল্প বাংলা ছোট গল্পের মতই পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শে গড়ে উঠেছে । তবে অসমীয়া সাহিত্যের অনেক পূর্বেই বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্প রচনার সূচনা হয় এবং কয়েকজন প্রথম শ্রেনীর ছোট গল্প লেখকও ইতিপূর্বে সেখানে আত্মপ্রকাশ করেছেন । বাংলা সাহিত্যে যথার্থ ছোটগল্পের স্রষ্টাই তো রবীন্দ্রনাথ । তাই আধুনিক অসমীয়া ছোট গল্প পাশ্চাত্য সাহিত্যের দান হলেও বাংলা সাহিত্যের প্রভাব মুক্ত নয় । এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার গল্প সম্পর্কে ডঃ মহেশ্বর নেওগের একটি মন্তব্য স্মরণ করছি - " লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া পুরাণ সাধু কথা আরু , আধুনিক চুটি গল্পর সংযোজক সেতুর দরে । তেওঁ বহুতো বোর পুরাণ সাধু সংগ্রহ করি তেওঁর নিজর বৈশিষ্ট্য পূর্ণ ভাষাত পুনঃ প্রকাশ দিছিল । আনকালে ইংরেজী বাংলা আদি আধুনিক সাহিত্যর গল্প ধারারে সামঞ্জস্য রাখি বেজবরুয়াই আধুনিক সৃষ্টিত হাত দিছিল । দুই-এটি গল্পত রবীন্দ্রনাথর দূর প্রভাব এটিও লক্ষ্য করা যায়' । "

নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর গল্প আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী বলেন – " জ্ঞান পিপাসু চৌধুরীর বঙালী সাহিত্যর অধ্যয়ন যথেষ্ট আরু এই অধ্যয়নর প্রভাব তেওঁ লিখি থৈ যোয়া কিছুমান গল্পর ওপরত ন পরা কৈ থকা নাই । " [২]

একথা ঠিক যে অসমীয়া কাব্য নাটক উপন্যাসের ক্ষেত্রে যেমন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের প্রভাব ছিল খুবই স্বাভাবিক ও ব্যাপক , অসমীয়া ছোট গল্পের ক্ষেত্রে কিন্তু তা' নয় । তাছাড়া বেজবরুয়াযুগে অসমীয়া ছোট গল্প রচনার সূচনা মাত্র হয়েছে , গল্প রচয়িতার সংখ্যা তখনো স্বল্প , সার্থক ছোট গল্পের আবির্ভাব তখনো অপেক্ষিত । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক থেকে অসমীয়া সাহিত্যে ছোট গল্প পর্যান্ত সমৃদ্ধিতে ভরে উঠে । নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিয়োজিত হয়েছেন নতুন-নতুন কথা সাহিত্যিকগণ, সৃষ্ট হয়ে চলেছে উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প প্রচুর পরিমাণে । বেজবরুয়া-যুগে ছোট গল্প যে দু'চার জনের হাতে শিল্পরূপ পেয়েছে তাঁদের উপর বাংলা

সাহিত্যের ~~সঙ্গে~~ দু'জনের প্রভাবই সর্বাধিক লক্ষণীয়, এক রবীন্দ্রনাথ, দুই শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ তো বিশ্বসাহিত্যের সার্থক ছোটগল্প রচয়িতাদের অন্যতম, আর শরৎচন্দ্র মূলত ঔপন্যাসিক হলেও কয়েকটি উল্লেখ্য সুন্দর ছোটগল্পের স্রষ্টা। ....

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া অসমীয়া ছোট গল্পের জনক। তাঁর গল্প সংকলন তিনটি --'সুরভি' (১৯০৯), 'সাধু কথার কুকি' (১৯১০) ও 'জোনবিরি' (১৯১৩)। বেজবরুয়া প্রাচীন সাধুকথা অর্থাৎ রূপকথা ও আধুনিক ছোট গল্পের সংযোজকের কাজ করেছেন। প্রাচীন সাধুকথা সংগ্রহের পথ দেখান জার্মান পন্ডিত গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়। এঁদের সংগৃহীত সাধুকথা ইংরাজীতে অনূদিত হয়। বেজবরুয়া তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এমন অনুমান করা যেতে পারে। গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের পূর্বেও অনুরূপ প্রয়াস দেখা গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে হার্ডওয়ের 'কালেকশন অব পপুলার সঙ্গস্' (১৭৭৮ - ৭৯) এর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এতদ্‌ব্যতীত লালবিহারীদের 'ফক টেলস্ অব বেঙ্গল' (১৮৫১), ভারতীয় পুরাণ সম্পর্কিত ম্যাকম্মুলারের রচনা, আর. সি. টেম্পলের 'ওয়াইড এ্যাওয়েকস্টোরীস' (১৮৮৪), মেরী ফ্রেয়ারের 'ওল্ড ডেকান ডেইজ' (১৮৮৯) ইত্যাদি গ্রন্থ থেকেও বেজবরুয়া প্রাচীন সাধুকথা ~~সংগ্রহে~~ সংগ্রহে অনুপ্রাণিত হতে পারেন। বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ অভিযান এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বেজবরুয়া রবীন্দ্রনাথের 'বাউলের গান' (১৮৮৩), 'লোক সাহিত্য' (১৯০৭) ইত্যাদি রচনার সঙ্গে অবশ্যই পরিচিত ছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭) এবং 'ঠাকুর দাদার ঝুলি' (১৯০৯) এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। এই ব্যাপারে তাঁর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় বাস ও বাংলা কথা সাহিত্যের অধ্যায়ন তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে বলে অনুমান করা যেতে পারে। বেজবরুয়ার দু' একটি গল্পে রবীন্দ্রনাথের দূর প্রভাব আছে বলে ডঃ মহেশ্বর নেওগ মন্তব্য করেছেন। ৩

আমাদের ধারণা, এই প্রভাব দূর নয়, নিকট।

প্রথমে বেজবরুয়ার 'সুরভি' নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই গ্রন্থের 'গীতা' গল্পের নায়ক ভগবানদাস চেনেহীকে ভালবাসেন। এতে বাদ সাধেন চেনেহীর দাদা। ভগবান দাস চেনেহীর দাদাকে মাথায় একটি 'খরি' দিয়ে আঘাত করেন, ফলে চেনেহীর দাদার মৃত্যু হয়। এর পরিণতি ভগবানদাসের কারাবাস। কয়েদী ভগবানদাস বাবাজীর বাস ছিল পশ্চিমে গোয়ালিওর জেলায়। রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রহমত এক অধমর্ণকে ছুরিকাঘাত করে কয়েদী হয়। ভগবানদাস বাবাজীও খুনের দায়ে কয়েদী হন। উভয়ের বাস পশ্চিমে। এই গল্পে রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের প্রভাব অনুভূত হয়।

'বাপিরাম' গল্পে বাপিরাম পুরাতন ভৃত্য। সে নিজের জীবন বিপন্ন করেও প্রভু কন্যা তিলকাকে স্কট সাহেবের শ্যেন দৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। পুরাতন ভৃত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গল্প আছে, কবিতাও আছে। তাঁর 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্প এবং 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতা সর্বজনবিদিত। রাইচরণ ও কৃষ্ণকান্ত প্রভুর জন্য নিজেকে যেমন ভাবে উৎসর্গ করেছে, তার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। বাপিরাম চরিত্র - চিত্রণে বেজবরুয়া রবীন্দ্রনাথের উক্ত চরিত্র দুয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, মনে হয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি অতিপ্রাকৃত গল্প বিশ্ববিখ্যাত, যেমন — 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা' প্রভৃতি। অতিপ্রাকৃত তথা অতিবাস্তব বেজবরুয়ারও কয়েকটি গল্পে বিদ্যমান। বেজবরুয়ার 'লাও খোলা' গল্পটি এই পর্যায়ের। এই গল্পে একটি পুরুষ একটি বালবিধবা নারীকে উপভোগ করে এবং সেই নারী সন্তান সম্ভাবা হলে তাকে মেরে ফেলে। 'লাওখোলা' শব্দের অর্থ কংকাল। রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' গল্পটিও অতিবাস্তব ঘটনাকেন্দ্রিক। 'লাওখোলা' গল্পে কঙ্কালটি ছিল নারীর। রবীন্দ্রনাথের কঙ্কাল গল্পের কঙ্কালটিও নারীর। উভয় গল্পেই কঙ্কাল দু'টি নারীমূর্তি ধারণ করে লেখককে (গল্পের আমি'কে) স্বীয় জীবনকথা ব্যক্ত করেছে। উভয় নারীই বিধবা। রবীন্দ্রনাথের গল্পের নারীটির স্বামীর মৃত্যু হয়েছে বিবাহের দুই মাস পরে। বেজবরুয়ার গল্পের নারীটির স্বামীর মৃত্যু হয়েছে বিবাহের এক মাস পরে। উভয় গল্পের

What is meant by this remark?

উপস্থাপনারীতিও একই ধরণের । অর্থাৎ এক কল্পিত 'আমি' গল্পটি পরিবেশন করেছে । 'নাওখোলা' গল্পের কঙ্কাল নারীমূর্তি ধারণ করে বলেছে কল্পিত লেখককে--'হেঁগা বাবু মশাই , তোমার কি আর ঘুম ভাঙবে না ? ওঠনা একবারটি , আমার একটু কথা বলবার আছে ..... আমি কে এখনই বলছি , ব্যস্ত হবেন না মশায় ।" লক্ষণীয় নারীটি বাঙালী , তাই তার সংলাপও বাংলায় দেওয়া হয়েছে । পরিশেষে লেখক তার বক্তব্য অসমীয়াতে রেখেছেন । রবীন্দ্রনাথের নারীটিও বলেছে - - " তুমি একলা আছ বুঝি ? তবে একটু বসি । একটু গল্প করা যাক । পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে আমিও মানুষের কাছে বসিয়া মানুষের সঙ্গে গল্প করিতাম । .... সবচেয়ে মজার কথা যদি শুনিতে চাও তো আমার জীবনের কথা বলি ।" বলেই নারীটি উত্তম পুরুষে স্বীয় জীবন বৃত্তান্ত রেখেছেন ।

'ভুরুকি বৌ' গল্পটি দুই বন্ধুকে নিয়ে । একজন বঙ্গ সন্তান অন্যজন আসাম সন্তান । অসমীয়া বন্ধুর পত্নী ভুরুকীর মৃত্যুতে বঙ্গ সন্তান বন্ধুটি দুঃখ প্রকাশ করেন , যদিও এই মৃত্যু সত্য নয় । এই গল্পেও বহু বাংলা সংলাপ আছে । যেমন ---

১। শশী বাবুয়ে টপরাই মাত লগালে --" আমি বরুয়াদের খুব জানি , জানি , বিশেষ রূপে জানি , আমাকে কিছুই বলতে হবে না । এঁরা কায়স্থ , বড়লোক , আসাম দেশের জমিদার ।" ......

২। " বড়ুয়া মশাই চলুন , কায়স্থদের ঘর এই দিকে , কাছাকাছি একসঙ্গে বসা যাবে ।"

৩। " বলনা ভাই বলতে লজ্জা কি ? তোমার লজ্জা দেখে মরে যাই আর কি । মেয়ে মানুষেরও বেশী ।" ইত্যাদি ।

এই গল্পে যে বাংলার প্রভাব আছে তা' সমালোচকও স্বীকার করেছেন ।[৪]

'মাধৈ মালতী' গল্পে এক পোস্ট মাস্টারের(ডাকঘর বাবু) সাথে মাধৈ মালতীর প্রণয় ও পলায়ন বর্ণিত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছোট গল্প'পোস্ট মাস্টারে' এক পোস্ট - মাস্টারকে আমরা পেয়েছি । এই গল্পের রতন অবিস্মরণীয় । মনে হয় 'মাধৈ মালতী' গল্পটির প্রেরণা এই 'পোস্ট মাস্টার' গল্প , যদিও দু'টি গল্পের রস - পরিণতি এক নয় ।

এবার বেজবরুয়ার 'সাধু কথার কুকি' গল্প গ্রন্থের কয়েকটি গল্প নিয়ে আলোচনা করা যাক । 'চোর' গল্পে পশুপতি চোর । প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর লোকেশ্বর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন । এই স্ত্রীর প্রেমিক রাত্রে লোকেশ্বরকে হত্যা করার কথা বলে । স্ত্রী রাজী হয় না । পরে জলে বিষ মিশ্রিত করে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় । রাত্রে ঐ বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে পশুপতি এই কথা অবহিত হয় এবং লোকেশ্বরকে জানায় , তাতে লোকেশ্বরের জীবন রক্ষা হয় । পার্থিব এই ঘটনায় পশুপতির ভাবান্তর ঘটে । পরে সে একজন জ্ঞানী পুরুষ হিসেবে পরিচিত হয় । প্রচলিত একটি বাংলা গল্পে আছে - এক চোর ধরা পড়ার ভয়ে গায়ে ভস্ম মেখে সাধু সেজে বসে বহু মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধা পেয়েছিল । তখন তারও ভাবান্তর ঘটে । নকল সাধুরই এত দাম , আসল সাধুর না জানি কত । এই বাংলা গল্পটিই যেন 'চোর' গল্পে দানা বেঁধে উঠেছে বলে অনুমান হয় ।

'ডাক্তার বাবুর সাধু' গল্পে কয়েকজন ট্রেন যাত্রী ঠিক করল তারা গল্প বলবে , উদ্দেশ্য রাত কাটানো তথা যাত্রার ক্লান্তি অপনোদন করা । এই প্রসঙ্গে চসারের ' দি ক্যান্টার বারি টেলস'- এর কথা মনে পড়া স্বাভাবিক । সাউথওয়ার্কের 'টাবার্ড ইন' থেকে ক্যান্টার বারি যেতে আসতে প্রত্যেক যাত্রীকে দুটো করে চারটি গল্প বলতে হবে - এইরূপ কথা হয়েছিল । আলোচ্য গল্পে রামলোচন - রাজুবালার বাল্য প্রেম , রামলোচনের আত্মহত্যা বর্ণিত হয়েছে । বেজবরুয়া বঙ্কিমের একজন ভক্ত পাঠক । তাই বাল্য প্রেমকে কেন্দ্র করে গল্প রচনার ইচ্ছা বঙ্কিম থেকেও তিনি পেতে পারেন । এই গল্পে সুন্দর বাংলা সংলাপ আছে । নিম্নের উদ্ধৃতিটি বেশ উপভোগ্য - - -

নরেন বাবু - " রাজু বালাটা কে মহাশয় ?"

ডাক্তার - " আমাদেরই এক প্রতিবেশীর মেয়ে ।"

নরেন বাবু - " তার বয়স কত ?"

ডাক্তার - " তখন দশ xxx বৎসর" ।

সভাপতি - " একটা দশ বছরের মেয়ের এত বিদ্যা ?"

ডাক্তার - " xxxx মহাশয় সে যে বঙ্কিম বাবুর নভেল পড়া আজকালকার বাঙ্গালী মেয়ে । "

নরেন - " দেখুন না , আমাদের সাহেব নেপোলিয়ানী ঘুম ঘুমাচ্ছে" ।

এই গল্পটির শেষাংশে মৃত রামলোচনকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে ডাক্তার চিৎকার করে উঠেন । লেখকের ভাষায় - (ডাক্তারর বাবু) -
'' শুনিলো, বাহিরর দুয়ার মুখর পরা ডাক্তর বাবু, xxxx ডাক্তার বাবু ,
বুলি কোনোবা মানুহ এটাই মোক রিঙিয়াই মাতিছে । ....
উঠি তেতিয়াও আকৌ দুবার শুনিলো , ডাক্তর বাবু , ডাক্তর বাবু । 'চবুর কর যাতা হায়' বুলি নরা নরিকৈ আহি চরা ঘরর দুয়ার মেলি দিলো । বাহিরত ফরিং ফুটা জোনাক । দেখিলো রামলোচন চোতালত থিয় হৈ আছে ।। মই 'আইঔ' বুলি চিঙর মারি দিলা । - - - - - - -
রামচরণ চকুর আগতে নাইকিয়া হল ।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রxxx - নাথের 'মণিহারা' গল্পটির কথা স্মৃতি পথে উদিত হতে পারে । ফণী ভূষণের স্ত্রী xxx মণিমালিকার কঙ্কাল xxxx ফণীভূষণকে নদীতে নামিয়েছিল । লেখকের ভাষায় - -'' কঙ্কাল নদীতে নামিল , অনুবর্তী ফনীভূষণও জলে পা দিল । জল স্পর্শ করিবামাত্র ফণিভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল । সম্মুখে তাহার প্রদর্শক নাই । কেবল নদীর পরপারে গাছগুলি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খন্ড চাঁদ শান্ত অবাক্ ভাবে চাহিয়া আছে । আপাদমস্তক বার'বার শিহরিয়া শিহরিয়া স্খলিত পদে ফণিভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেল ।'' .....

সম্ভবত: এইজন্য শ্রী ত্রৈলোক্য নাথ গোস্বামী বলেছেন —'' (ডাক্তর বাবুর সাধু' গল্পের) শেষর অংশত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরর'মণিহারা' গল্পর একাংশর প্রভাব পরিব পারে ।'' [৫] 'মণিহারা' গল্পের বক্তা একজন তৃতীয় ব্যক্তি — ইস্কুল মাস্টার । বেজবরুয়ার গল্পটিরও বক্তা একজন তৃতীয় ব্যক্তি —'ডাক্তর' । উভয় গল্পের উপস্থাপনারীতিও প্রায় একই রকম । অর্থাৎ উভয় গল্পের সূচনায় যে সংলাপ আছে ('মণিহারা'তে আগন্তুক ও ইস্কুল মাস্টারের সঙ্গে , 'ডাক্তর বাবুর সাধু'তে ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে)তার সঙ্গে মূল গল্পের সম্পর্ক নাই বললেই চলে । বেজবরুয়া লিখেছেন —''ডাক্তর বাবুয়ে আরম্ভ করিলে । প্রথমতে কৈ লওঁ , যদিও কথাটো সাধুকথার রীতিত পেলাই কবলৈ গৈছোঁ, কিন্তু ই সত্য ঘটনা ।'' .....

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

'' ইস্কুল মাস্টার কহিলেন -

আমি এই গ্রামে আসার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই বাড়িতে ফনিভূষণ সাহা বাস করিতেন ।'' ....

এইসব দেখে নিশ্চয়ই বলা অসঙ্গত হবে না , বেজবরুয়ার 'ডাক্তর বাবুর সাধু' গল্পে রবীন্দ্রনাথের 'মণিহারা' গল্পের প্রভাব আছে ।

বেজবরুয়ার 'রতন মুন্ডা' একটি সুন্দর গল্প । এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে রতন মুন্ডা ও ঝুমুরীর প্রেম কথা । পণ নিয়ে মতানৈক্য হওয়ায় তাদের বিবাহে বাধা এলো । কিন্তু নায়ক - নায়িকা পালিয়ে এই বাধা অতিক্রম করে । ওরা নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে । সেই জীবন বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই ঝুমুরীর জীবনে নেমে এলো নিঃসীম বিষাদ । রতন মুন্ডা জঙ্গলের জুরির (নদীর) বুকে নিমজ্জিত হল । অসহায়া ঝুমুরী জুরির পারে রতন মুন্ডার প্রত্যাগমনের আশায় বসে থাকে ।বেজবরুয়ার ভাষায় —'' এজনী কোল ছোয়ালীয়ে পানীর ফালে চাই , এটা জুরির পারতে শিল এ চোখরর ওপরত বহি , আগতেপোরা মঙহ ডোখর চেরেক লৈ বিনাই - কান্দিব লাগিছে । নকলেও হব যে , এই ছোয়ালী জনীয়েই

আমার রতন মুন্ডার জুগ্নরী ।'' এই দুটি দৃশ্যটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের 'পোস্ট মাস্টার' গল্পের শেষ দৃশ্যটি । এখানে রতন , পোস্ট মাস্টার ঘুরে এসে তাকে নিয়ে যাবে এই আশায় নদী তীরস্থিত পোস্ট - অফিসের গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভেসে ঘুরে ঘুরেবেড়াচ্ছিল । বিশ্বকবির ভাষায় —'' সে (রতন) সেই পোস্ট - অফিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রু জলে ভাসিয়া ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল । বোধকরি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল , দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে - সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না ।'' শ্রী ত্রৈলোক্য নাথ গোস্বামী যথার্থই বলেছেন —'' ('রতন মুন্ডা') রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোস্ট মাস্টার' গল্পর করুণতা মনে পেলায় ।'' লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথের গল্পের নায়িকারই নাম — রতন । বেজবরুয়ার গল্পের নায়কের নাম — রতন । তাঁর শিবপ্রসাদ' গল্পে রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের দু'টি গানও প্রযুক্ত হয়েছে । যেমন —

১। জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত ।
নবীন বাসনা ভরে হৃদয় কেমন করে ,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত ।
সুখভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায় ,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে —
তাহারে খুঁজিব দিক্ - দিগন্ত । ....

২। আমার পরাণ যাহা চায় ,
তুমি তাই , তুমি তাই গো ।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর
কেহ নাই , কিছু নাই গো । .....

গান দু'টি লেখক বিবৃত করেছেন , গল্পের কোনো চরিত্রের মুখে তা প্রযুক্ত হয়নি ।

'জলকুয়ুরী' গল্পের রূপহীর নদীপ্রীতি ভাবী পতিপ্রীতির থেকে বেশী । পরে তার মধ্যে পরিবর্তন আসে । রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিপ্রীতি বিষয়ক বহু গল্প লিখেছেন , তার মধ্যে 'সুভা', 'শুভদৃষ্টি' 'অতিথি' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মানব মনের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ গভীর । রবীন্দ্রনাথের কবি - প্রকৃতিতে এই ভাব সহস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে । এই প্রকৃতি - প্রেম কাব্যের সীমা পার হয়ে ছোট গল্পের বস্তুপ্রধান পরিবেশের মধ্যেও লালিত হয়েছে । সুভা তার মূক মূঢ় জীবনের আকৃতি নিয়ে বহিঃপ্রকৃতির রাজ্য থেকে মানব জীবনের অশ্রুময় মুখরতায় প্রবেশ করেছে । রূপহীর পরিবর্তনে সুভার দূর প্রভাব অকল্পনীয় নয় । রূপহীর নদী - প্রীতি তথা প্রকৃতি - প্রীতি রবীন্দ্রনাথের সুভা , তারাপদকে (অতিথি) স্মরণ করিয়ে দেয় । বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' বিবাহের এক বৎসর পরেও তার আবাল্য পরিচিত অরণ্যকে বিস্মৃত হতে পারেনি - একথাও স্মরণযোগ্য ।

'গীত' গল্পে একটি গুরু গম্ভীর, উপদেশমূলক গীতের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে । অসমীয়া জাতির দুরবস্থা দেখে লেখক ব্যথিত । এতে লেখকের অসমীয়া প্রীতি সুন্দর রূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে । গীতটির কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করছি —

উঠা এক টিপে অসমীয়া ভাই
বান্ধা কঁকালত টঙালি আটি
লোয়া বীরসাজ দিয়া দলিয়াই
কেচুয়া নরার বাগরি পাতি ....

এই গীতটির স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র 'একটি গীত' প্রবন্ধটিকে স্মরণ করিয়ে দেয় । এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চণ্ডীদাসের - - - -

এসো এসো বঁধু এসো । আধ আঁচরে বসো ,
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি । ... ..

এই গীতটির স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন । তবে লেখক হাস্যরস সহযোগে তাঁর বক্তব্য রাখলেও তা' গাম্ভীর্য মণ্ডিত । বেজবরুয়ার গল্পে যেমন আসাম তথা অসমীয়া প্রীতি প্রকটিত হয়েছে , বঙ্কিমের রচনাতেও তেমনি বঙ্গ তথা বাঙালীর

প্রতি প্রীতি প্রকাশিত হয়েছে । লক্ষ্যণীয় বঙ্কিমের প্রবন্ধের নাম 'একটি গীত' , বেজবরুয়ার গল্পটির নাম 'গীত' ।

বেজবরুয়ার 'জেন্নবিবি' গল্প গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য । 'নাভাল চন্দ্র দাস' গল্পে 'মেচে'র ঝি কামিনী আর নাড়ুলুর কাহিনীর উৎস মনে হয় কমলাকান্ত ও প্রসন্ন গোয়ালিনী । কামিনী সম্পর্কে লেখক বলেছেন - - '' কামিনী ঝির বয়স ৪০ বছরর কম কোনো মতেই নহয় । তাইর বরণ ক'লা, দাঁত উজলা , মুখ গুটি সাঁচেরে ভরা । তেনেজনী 'মহিলা' কাব্য রস বিনোদিত সুরুচিপূর্ণ শিক্ষিত নাভলুর কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হোয়াটা সপোনতো ভাবিবলৈ কেনে যেন লাগে । কিন্তু হলে কি হব ?'' ....

বঙ্কিমের কমলাকান্ত প্রসন্ন গোয়ালিনী সম্পর্কে বলেন —'' .... "প্রসন্ন দেখিতে শুনিতে মোটা সোটা , গোল গাল , বয়স চল্লিশের নীচে , দাঁতে মিসি , হাসি ভরা মুখ ..... পূজারি বামুনের জ্বালায় বাগানে ফুল ফুটিতে পায় না - - আর নিন্দুকের জ্বালায় প্রসন্নের কাছে আমার মুখ ফুটিতে পায় না — নচেৎ গব্যরসে ও কাব্যরসে বিলক্ষণ বিনিময় চলিত ।" ('আমার মন') । যদিও চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর মত সাদৃশ্য নেই তবু মনে হয় কোথায় যেন দু'টিতে মিল আছে । আবার কামিনী ঝি নাভলুর কবিতার কাল্পনিক নায়িকা । বাস্তব কামিনীর কানে কথাটটা গেলে কামিনী অসন্তুষ্ট হয়েছিল । 'আমার মন' প্রবন্ধে কমলাকান্ত একটি যুবতীকে 'তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ' বলে কটূক্তি লাভ করেছিলেন । প্রসন্ন গোয়ালিনীর যে বর্ণনা পূর্বে প্রদত্ত হয়েছে , তাও এই 'আমার মন' প্রবন্ধের অন্তর্গত । সুতরাং মনে হয় এই গল্পে উক্ত দু'টি ঘটনায় 'আমার মন' প্রবন্ধের পরোক্ষ প্রভাব আছে । কামিনীর মুখে বাংলা সংলাপ বসিয়েছেন লেখক। যেহেতু ঘটনাস্থল কলকাতা এবং মেচে'র ম্যানেজার বাঙালী, তাই তারও মুখে বাংলা সংলাপ । স্থানীয় পরিবেশ সৃষ্টির এই প্রয়াস অভিনব বলতে হবে ।

'কাশী বাসী' গল্পটিতে একটি নারীর জীবন যন্ত্রণার কথা আছে ।যন্ত্রণার

কারণ সমাজের অবিচার । মানেরা হাজার হাজার নারী পুরুষকে স্বদেশে নিয়ে যাচ্ছিল । ইংরেজদের সঙ্গে মানের সংঘর্ষ হয় , মানদের আসাম থেকে বিতাড়িত করল ইংরেজ । সেই সময় বহু নর - নারী উদ্ধার পায় মানদের হাত থেকে । তাদের মধ্যে এই গল্পের নারীও একজন । তার স্বামী আছে । কিন্তু যখন সে পতিগৃহে এল , তখন পতি ও শ্বশুর তাকে গ্রহণ করল না । নিরুপায় হয়ে ভিক্ষা করে সে কাশী চলে আসে , সেই থেকে কাশীতেই আছে । নারীর উপর সমাজের এই অত্যাচার বঙ্গসমাজেও ছিল , আর বাংলা সাহিত্যে তার সুস্পষ্ট চিত্রও অপ্রতুল নয় । এই গল্পেও বাংলা সংলাপ প্রযুক্ত হয়েছে ।

'ডোকেন্দু বরুয়ার মধ্যলীলায় গল্পের ডোকেন্দু চরিত্রে পাশ্চাত্য কুফল দেখান হয়েছে । ডোকেন্দু বরুয়ার মধ্যলীলা গল্পের প্রথম 'অধ্যা'র কবিতাটি মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র সূচনাংশকে স্মরণ করিয়ে দেয় । এতে সৃষ্ট কৌতুক রস উপভোগ্য । কবিতাটি নিম্নে প্রদত্ত হল —

সম্মুখ রণত পরি বীর চূড়ামণি
গোন্ধেশ্বর গুচি যেবে গল স্বর্গপুরী
অকলৈ , কোয়াহে দেবী অমৃত ভাষিণী
শোকত করিলে কিবা জেতুকা - ঈশ্বরী
পতি প্রাণা ?

'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র সূচনায় এই রকম আছে —

সম্মুখ সমরে পরি , বীর চূড়ামণি - মণি
বীরবাহু , চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে , কহ , হে দেবি অমৃতভাষিণী
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ?

এতদ্ব্যতীত এই গল্পে 'মেঘনাদ বধ কাব্য', মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইত্যাদিও প্রসঙ্গ ক্রমে এসে পড়েছে ।

'ডোকেন্দু বরুয়ার অন্তলীলা' গল্পের একটি চরিত্র কেতেকী। লেখক লিখেছেন – '' কেতেকীর বয়স ষোল বছর তিন মাহ তিনি ঘন্টা তিনি মিনিট।'' বঙ্কিমের কমলাকান্তকে উকিল জিজ্ঞেস করেছিলেন, '' তোমার বয়স কত ?'' কমলাকান্ত বলেছিলেন, ''আমার বয়স একান্ন বছর দুই মাস তেরদিন চারি ঘন্টা পাঁচ মিনিট।'' বলাবাহুল্য কেতেকীর বয়স নিরূপণে লেখক বঙ্কিমের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এই গল্পে রবীন্দ্রনাথের বাংলা কবিতাও আছে। যেমন –''প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।''

'মৈদাম' 'জোনবিরি' গল্প গ্রন্থের একটি অতিপ্রাকৃত গল্প। এই গল্পে কঙ্কালেরা জীবন্ত মানুষের মত আচরণ করেছে (অবশ্য স্বপ্নে)। তারা তাদের মৃত্যুর কারণ বলেছে। 'লাওখোলার' মত এই গল্পটিও রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্প 'কঙ্কালের' কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, এই গল্পেও কঙ্কাল তার নিজের জীবন কথা নিজে বিবৃত করেছে।

'কেহোঁকলি' বেজবরুয়ার আরেকটি গল্প সংকলন। এর 'মুক্তি' গল্পের সুকুমার পাঠে অমনোযোগী, দুষ্টু। সে কেবল ভাবে –'' ক'ত গছত পকা আম .... মধুরী আম আছে .... ক'ত বরলে বাহ সাজিছে, সেই বরলর বাহ ভাঙি তার টোপলে ক'র পুখুরীত বরশী বাই পুঠি মাছ ধরা যাব, ক'ত গছর বাহর পরা চরাই পোয়ালি আনি পুহিব লাগিব .... ।''

সুকুমারের এই মানসিকতা আমাদের শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি'র রামকে, রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের ফটিককে মনে করিয়ে দেয়। ফটিক ও মাখন ছিল দুই ভাই। এই গল্পেও সুকুমার ছোট ভাই, বড় ভাই দেবকুমার। ফটিকের মামা ফটিককে পড়াশুনার জন্য নিয়ে যান। বেজবরুয়ার গল্পে দেবকুমার তার ভাই সুকুমারকে তার কাছে নিয়ে যায় পড়াশুনার জন্য। ফটিকের মামা বিশ্বম্ভর বিবাহিত, দেবকুমারও বিবাহিত। ফটিকের উপর তার মামীমা অসদয় ব্যবহার করেছে। 'মুক্তি'র দেবকুমার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভাইয়ের পড়াশুনায় কোনো উন্নতি হলো না, তাই একদিন সে ভাইকে অত্যন্ত প্রহার করে এবং বলে, '' তই আমার বংশর কলঙ্ক।'' সেইদিন রাতেই সুকুমারের জ্বর এল।

ডাক্তার এলেন । ডাক্তারের পরামর্শ মত তার পিতা - মাতাকে তার - যোগে খবর পাঠিয়ে জানানো হল । তাঁরা যখন এলেন তখন সুকুমারের বিকার অবস্থা উপস্থিত । জ্বরের ঘোরে ফটিকের মত সুকুমারও প্রলাপ বকেন -- '' আই তুমি আহিছা ? মই গোহা চরাই আরু আন জন্তু বোর কেনে আছে ? -- মই পঢ়িম আই , তুমি না ভাবিবা । ককাই দেবে মই পঢ়াশুনা না করাত বর বেয়া পাইছে । -- মই পঢ়িম , ডাক্তর মানুহ হম ।'' ... কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফটিকের মত সুকুমারও পরপারে চলে গেল । এই যাওয়াই সুকুমারের 'মুক্তি', যেমন ফটিকের 'ছুটি' । মামা বাড়ি আসার পর ফটিকের বাড়ির কথা , গ্রামের বালকের কথা , নদীর কথা , ধাউস ঘুড়ি উড়ানোর কথা , কত মনে পড়ত । সুকুমারের মনেও অনুরূপ ভাবে উদয় হয়েছিল । তাই তো সেও বলেছে - '' মই গোহা চরাই আরু আন জন্তু বোর কেনে আছে ?'' দুর্গাপূজা প্রসঙ্গ উভয় গল্পে আছে । দেবকুমার ভাইকে নিতে এসেছিল পূজোর ছুটিতে । আর ফটিকের বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল আসছে পূজোর ছুটিতে । ফটিকের বাবা নেই , সুকুমারের আছে । না থাকলেও গল্পের কোন হানি হত না । মূলতঃ 'মুক্তি' গল্পে 'ছুটি' - গল্পের প্রভাব খুবই সুস্পষ্ট ।

....

।। নবীন চন্দ্র বরদলৈ ।।

নবীনচন্দ্র বরদলৈর গল্প 'ভাই' ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয় । একান্নবর্তী পরিবারের ভ্রাতৃবিরোধ এই গল্পের উপজীব্য বিষয় । রবীন্দ্রনাথের ও শরৎচন্দ্রের অনেক গল্প একান্নবর্তী পরিবার - কেন্দ্রিক । বরদলৈর এই গল্পটি পাঠ করতে-করতে বাংলা সাহিত্যের কথা স্ম তথা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক । 'ভাই'র গল্পটি সংক্ষেপে বিবৃত করছি —

এক গ্রামে (চিলা) এক ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল । তারা দু'ভাই । সোনাতন ও ব্রহ্মদেউ । সনাতন বড় , ব্রহ্মদেউ ছোট । সংসার চালানর দায়িত্ব সনাতনের উপর । ব্রহ্মদেউ দুষ্ট ছিল । পিতার কাছে মার খেত , সেজন্য

পাঠে মনোযোগ ছিল না তার । কিন্তু খুব পরোপকারী । গ্রামের সমস্ত মানুষের উৎসবে ব্যসনে সে উপস্থিত । গ্রামের দুষ্টু ছেলেদের শিষ্ট করা বুহ্যু নিজের পবিত্র কর্ম বলে মেনে নিয়েছিল । 'ছোট ভাই' বলে সনাতনের খুব স্নেহ ছিল বুহ্যুর উপর । সনাতন বিবাহ করল । তার পত্নী গোলাপী বুহ্যুকে মোটেই দেখতে পারে না । তার সঙ্গে এসে জুটল গোলাপীর বিধবা খুড়ি । লেখক তাকে সাক্ষাৎ মন্থরা বলেছেন । কম ভাত দেওয়ায় , জামা কাপড় ধুয়ে না দেওয়ায় , বুহ্যু একদিন প্রতিবাদ করল । গোলাপী কেঁদেও জেতে , বকেও জেতে । শেষে বুহ্যু দৌড়ে পালায় , পলায়ন কালে একটি দরজার নিকট রাখা ডাং বুহ্যুর পায়ে লেগে পড়ে যায় ও গোলাপীর খুড়ির পৃষ্ঠদেশে লাগে । তার পরিণতিতে দু'ভাইয়ের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেল । বুহ্যু এর জন্য প্রস্তুত ছিল না , বুহ্যু সমস্ত সম্পত্তি দাদার কাছে গচ্ছিত রেখে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে পড়ল । প্রায় দশ দিন পর বুহ্যু দাদাকে একটি দানপত্র সহ চিঠি দিল । বুহ্যুর সমস্ত সম্পত্তি সনাতন পেল । সনাতন অনুতপ্ত হলের । ঠিকমত কাজ কর্ম না করায় চরম দারিদ্র্য দেখা গেল সংসারে — সেই সময় বুহ্যুর প্রেরিত দুশো টাকা সনাতন পেল । বুহ্যু জানাল এখন থেকে মাসে-মাসে সে পঁচিশ টাকা করে পাঠাবে । তার দশ দিন পর 'তার' এল, বুহ্যু অসুস্থ । পঞ্চাশ টাকা কোমরে বেঁধে সনাতন ভাইয়ের কাছে চলল । ভাই দাদাকে দেখে বলল , 'দাদা ক্ষমা করিছা মো?'' বুহ্যুর মৃত্যু হল । সনাতনের দুই ছেলে হরিদেউ ও সিদ্ধদেউ । এই দুই ভাইয়ের মধ্যে যখন চরম ঝগড়া মারামারি হওয়ার উপক্রম তখন এক জটাজুট ধারী সন্ন্যাসী এল । সে বলল , বৎস , ভ্রাতৃ বিরোধে এই ঘর পুরে ছাই হয়ে গেছে । তোমরা সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করোনা । ভাইয়ের মত আপন কেউ হয় না । তারপরই সন্ন্যাসীর অন্তর্ধান । গোলাপী সন্ন্যাসীকে দেখেছিল । কিন্তু পরে সন্ন্যাসীকে খুঁজে পাওয়া গেল না ।

এখন কাহিনীটি পর্যালোচনা করা যাক্ । বুহ্যুদেউ আর সনাতন দুই ভাই । বুহ্যুদেও দুষ্ট , পরে তাদের সম্পত্তি ভাগ হয়ে যায় । এই কাহিনীতে শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি'র দূর প্রভাব আছে বলে মনে হয় । এই গল্পে গোলাপীর বিধবা খুড়ি যে ভূমিকা নিয়েছেন সেই ভূমিকা রামের বৌদির মাও নিয়েছেন । ডাং লেগে অপ্রত্যাশিতভাবে গোলাপীর খুড়ি আহত হন । 'রামের সুমতি'তেও রামের বৌদি যে আহতা হয়েছিলেন সেটাওছিল অপ্রত্যাশিত । সম্পত্তি বন্টনে তথা আলাদা হওয়ার

ব্যাপারে 'রামের সুমতি' গল্পে রামের দাদাই ছিলেন তৎপর, 'ভাই' গল্পে উদ্যোগী গোলাপী, তার সঙ্গে এসে জুটেছে তার খুড়ি। রামের বৌদির রামের জন্য যে টান সেই টান সনাতনের তার ভাইয়ের জন্য। সনাতন তার স্ত্রীর জন্য ভাইয়ের সঙ্গে আপাততঃ দুর্ব্যবহার করেছে। রামের বৌদি রামের দাদার জন্য একটু রূঢ় আচরণ করতে বাধ্য হয়েছে। তবে তার অন্তরে ছিল স্নেহের ফল্গুধারা তা' সনাতনের মধ্যেও ছিল। রামের বৌদি সব কিছু উপেক্ষা করে (স্বামী, মাকেও) সর্বশেষে রামকে বুকে টেনে নিয়েছেন, সনাতনও ভাইয়ের জন্য সবকিছু ছেড়েছে — সন্ন্যাসী হয়েছে। এর পর যদি বলি 'ভাই' গল্পে শরৎচন্দ্রের প্রভাব আছে, আশা করি তা অসঙ্গত হবে না।

গ্রামে দুষ্ট ছেলে আছে। সেই ছেলেদের শাসন করার দায়িত্ব বুদ্ধ নিজের হাতে নিয়েছে। এতে রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের ফটিকের দূর প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। ফটিক তার ভাইকে মেরেছিল ; যদিও মাখনকে ঠিক দুষ্ট বলা যায় না। বুদ্ধ দুষ্ট ছেলেদের মারত। ভ্রাতৃবিরোধ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বহু গল্প উপন্যাস ও নাটক রচিত হয়েছে। এই পর্যায়ের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'। রচয়িতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রচিত হয়েছে ১৮৭৪ সালে। এই উপন্যাসেরও দূর প্রভাব এই গল্পে থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

....

নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী
(১৮৮১ - ১৯৪৭)

অসমীয়া গল্প সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে 'আবাহন' পত্রিকার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । স্মরণীয় ১৯২৯ সালের কার্তিক মাসে আবাহন পত্রিকার জন্ম হয় । বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় । আবাহনের বহুল প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে অসমীয়া গল্প সাহিত্যেরও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে । 'বাঁহী' ও 'চেতনা'র গল্পে ছিল রক্ষণশীলতার সুর । 'আবাহন' পত্রিকার গল্পে বেজে উঠল মুক্তির উন্মাদনা , কল্পনার স্বতন্ত্রতা । নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর অধিকাংশ গল্প এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ।

চৌধুরী একজন বিখ্যাত অসমীয়া ছোট গল্প লেখক । 'নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর গল্প' শীর্ষক গ্রন্থে সর্ব সাকুল্যে দশটি গল্প আছে । এই গল্পগুলো ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে রচিত । ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে । শ্রী ত্রৈলোক্য নাথ গোস্বামী বলেন -''জ্ঞান পিপাসু চৌধুরীর বঙালী সাহিত্যের অধ্যয়ন আছিল যথেষ্ট আরু এই অধ্যয়নের প্রভাব তেঁও লিখি থৈ যোৱা কিছুমান গল্পের উপরতো ন পরাকৈ থকা নাই '' [৮]

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়', 'শেষের কবিতা' প্রভৃতিতে কাব্যময়তা তথা বাক্ চাতুর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় । মনে হয় চৌধুরী মহাশয় তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন । 'ওস্তাদজী' গল্পে বৃদ্ধ ওস্তাদ, লিলি ও নীলার সংলাপে বাক্ - চাতুর্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় । একটু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক্ - 'লিলিয়ে তাইর কোঁচর পরা চিনা বাদাম ভজা উলিয়াই ওস্তাদজীর মুখর আগত ধরি কলে ''নিয়ক''

চিনিব নোয়ারিলে বুঢ়াই তার বলিহা লগা চকুর মলিন দৃষ্টিত । পুনকতে সুধিলে , কিনো ? চিনা বাদাম টাটকা ভজা , লিলিয়ে কলেফিরিয়ালার সুরত ।

রসর মাত্রা বঢ়াইদি কলে নীলাই , '' ন হয় ন হয় , ই অবাক জলপানে , প্রেমের দানা'' হাঁহি ওস্তাবদজীয়ে কলে , '' তাকলৈ কি করিম ঐ ?''

লিলি - " কেলেই , দাঁত নাই হব পায় ? খুদি খাওক বারু ।"

ওস্তাদ - " দাঁতো নাই রুচিও নাই , পতিকে হেঁপাহো নাই ।"

নীলা - " তেনে হলে কওক - দন্তগত । নহয়, নহয় বসন্তগত ।"

'তামর তাবিজ' গল্পে শ্বশ্রু মাতার পুত্রবধূর উপর অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে । পুত্রবধূর পিতৃগৃহ থেকে প্রাপ্য বস্তু না - পাওয়াই এই অত্যাচারের কারণ । রবীন্দ্রনাথের 'দেনা - পাওনা' গল্পে নিরুপমা এমনি একজন পুত্রবধূ । তবে 'তামর তাবিজ' গল্পের পুত্রবধূর দুঃখ অপনোদিত হয়েছে , নিরুপমার হয়নি । মৃত্যুই - ই তার সমস্যার সমাধান করেছে । 'তামর তাবিজে'র মতো 'মধুমালতী' গল্পেও শাশুড়ীর অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে । 'তামর তাবিজে'র প্রেমধর , মধু মালতীর মাধব, রবীন্দ্রনাথের 'দেনা পাওনার' নিরুপমার বর এরা সবাই অবস্থার দাস , যা যে পত্নীর উপর অত্যাচার করেছে - সেটা বোঝার মানসিকতা এদের নেই । 'তামর তাবিজে'র রুক্মিণী নিরুপমার মত নীরব । 'মধু মালতী'র দুযুরী ও ওদেরি একজন । অবশ্য কারুণ্য রুক্মিণী - নিরুপমার তুলনায় দুযুরীর জীবনে অপেক্ষাকৃত কম ।

....

।। শরৎ চন্দ্র গোস্বামী ।।

শরৎচন্দ্র গোস্বামীর (১৮৮৭ - ১৯৪৪) প্রতিভা একটিমাত্র সাহিত্য শিল্পে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল , তা' হল — ছোট গল্প । গোস্বামী অসমীয়া ছোট গল্পের একজন কৃতী লেখক । তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থ 'গল্পাঞ্জলি' ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয় । তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থের নাম 'মযুনা' (১৯২০) 'বাজিকর' (১৯৩০) । গোস্বামীর মৃত্যুর পর 'পরিদর্শন' গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । গোস্বামীর রচনায় বেজবরুয়ার দীর্ঘ বাক্যরীতি নেই । তাঁর গল্পে পীড়িতের প্রতি , অসহায়ের প্রতি , সামান্য প্রাণীর প্রতি অকৃত্রিম দরদ পরিলক্ষিত হয় । হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস (যা

বৈষ্ণবর্য়ার গল্পে লক্ষিত হয়) তাঁর গল্পে নেই বললেই চলে । ব্যঙ্গোক্তি বা বক্রোক্তির প্রয়োগও তাঁর গল্পে কম । তাঁর গল্পের মূল সুর করুণতা । তাঁর গল্পে অনুভূত হয় নিয়তির দারুণ করুণ পরিহাস । যেমন —'ঘুনুচা', 'ময়না', 'অদৃষ্ট' ও 'নৈর দাঁতিত' প্রভৃতি । স্মরণীয় বাংলা ছোট গল্পকার জগদীশ গুপ্তের গল্পগুলির উপজীব্যও অদৃষ্ট বাদ । দুঃখিনী ঘুনুচার একমাত্র সন্তানের করুণ মৃত্যুতে ঘুনুচার জীবনে দারুণ দুঃখ নেমে এল । এতো আর কিছু নয় — বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস । বেদনার প্রতিমূর্তি 'ঘুনুচা' গল্পের এই ঘুনুচার পুত্র বিয়োগ বেদনা স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের 'রাসমণির ছেলে' গল্পটিকে । রাসমণি ও ভবানী চরণের একমাত্র সন্তান কালীপদ । এই কালীপদর মৃত্যু রাসমণি ও ভবানীচরণের জীবনে নিয়ে এল এক দুঃসহ বিষাদ । স্মরণীয় জে.এ. মিঞ্জের 'রাইডারস্ টু দি সী' একাঙ্কিকা নাটকের পুত্রহীনা মৌরীয়ার মূক বেদনা ।

গোস্বামীর 'ময়না' গল্পটিও করুণ রসঘন । ময়না একটির পর একটি পুত্র এবং পরিশেষে পতিকেও হারাল । এখানেই ইতি নয়, পতির বড় আদরের পাখি ময়নাকে বিধাতা কেড়ে নিল । ভাগ্যের কি বিচিত্র লীলা । এই করুণ রসঘন গল্পটিও রবীন্দ্রনাথের 'রাসমণির ছেলে'র কারুণ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়, স্মরণ করিয়ে দেয় জগদীশ গুপ্তের গল্পগুলিকে । গোস্বামীর 'ব্রহ্মপুত্রের বুকে' একটি সুন্দর গল্প, এই গল্পের নায়িকা অনিন্দ্য সুন্দরী বিবাহিতা নারী । ধন সম্পত্তি ও মান মর্যাদার প্রচুরতার মধ্যে থেকেও যৌবনের অতৃপ্ত পিপাসার তাড়নায় দুঃখিতা । তার স্বামী বিদ্বান, আদর্শবান । তিনি দূরে থেকে পত্নীর সঙ্গে প্রেম-প্রীতির আচরণ করেন, কিন্তু এই আচরণ প্রাণহীন । তাই তাঁর স্ত্রীর মনে অশান্তি । শেষে স্বামীর তরুণ ব্যারিস্টার বন্ধুর সাহচর্য সে পেতে চাইল । এতে তার দেহ ও মন পুলকিত হলেও নৈতিক অধোগতির নিমিত্ত অনুশোচনার অন্ত রইল না । পরিশেষে পতিকে মুখ দেখাবে কেমন করে এই চিন্তায় ব্রহ্মপুত্রের বুকে ঝাঁপ দিয়ে সে নিজের কলঙ্কিত জীবনে ইতি টানে । এই গল্পে জৈবিক বাসনার গুরুত্ব ও তার শক্তির প্রচন্ডতা প্রকাশিত হয়েছে । দৈহিক পরিতৃপ্তির অন্তরালেও সংস্কার ও সামাজিক বিচার ধারার নির্মম আঘাত বিদ্যমান । এই আঘাতেই এই গল্পের নায়িকাকে আত্মহত্যায়

করতে প্রণোদিত করে । এই গল্পের নারীটি পতির কাছ থেকে কাম্য ব্যবহার পায়নি , ফলে তার কামনা অতৃপ্ত রয়েছে । নারীটির পতি বিদ্বান আদর্শবাদী । এইখানে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প 'নষ্টনীড়' এর ভূপতির কথা মনে পড়ে । এই ভূপতিও পতি হিসেবে স্ত্রীর প্রতি যে নৈতিক কর্তব্য আছে – তা' করেন নি । ফলে তাঁর পত্নী চারুলতা দেবর অমলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে । উভয় গল্পের নায়িকা বিবাহিতা । উভয় গল্পের পতি স্ত্রীর প্রতি উদাসীন , কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ । উভয় গল্পের পত্নীই অপর তরুণকে ভালবেসেছে । উভয় নায়িকার জীবনই বেদনা বিধুর । গোস্বামীর গল্পের নায়িকার মৃত্যু হয়েছে , রবীন্দ্রনাথের নায়িকাকে বেঁচেই মৃত্যু যন্ত্রণা পেতে হয়েছে । এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথের 'পয়লা নম্বর' গল্পটিকেও স্মরণ করিয়ে দেয় । এই গল্পের নায়িকাও বিবাহিতা । তাঁরও জীবনে এসেছে এক তরুণ – নাম সিতাংশু । অনিলাও তার স্বামীর কাছ থেকে কাম্য ব্যবহার পায়নি । অনিলা তার স্বামীর কাছে চিঠি রেখে চলে গিয়েছে । অবশ্য সে সিতাংশুর কাছে যায়নি । যে মনোবেদনা 'ব্রহ্মপুত্রের রক্ত' গল্পের নায়িকা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে , সেই বেদনাই অনিলাকে ঘর ছাড়া বর ছাড়া করেছে । গোস্বামীর তরুণ ব্যারিস্টার আর অমল – সিতাংশু একই মনোভূমি প্রসূত । শ্রী ত্রৈলোক্য নাথ গোস্বামী যথার্থই বলেছেন – '' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প'' 'পয়লা নম্বর'র সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য আছে । ''[1] গোস্বামীর 'সামান্য প্রাণী' গল্পে ইতর জীবজন্তুর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শিত হয়েছে । শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটিও একটি গরু নিয়ে রচিত । রবীন্দ্রনাথের 'শুভদৃষ্টি' গল্পেও একটি মূক বালিকার গৃহপালিত পশু পাখির প্রতি অত্যধিক মায়া ছিল । এসব গল্পের প্রভাব 'সামান্য প্রাণী' গল্পে থাকতেও পারে । গোস্বামীর 'নদরাম' গল্পে কাছারী - জীবনের সরলতা প্রকাশিত হয়েছে । নদরাম যখন ফ্রান্সের যুদ্ধে ব্যস্ত , তখন সে জানতে পারে – তার স্ত্রী পরপুরুষ ভাটিরামের কাছে চলে গিয়েছে । যুদ্ধ থেকে এসে সে স্ত্রীকে আনতে গেল , স্ত্রী এল । কিন্তু নদরাম যখন দেখল তার স্ত্রীর ভাটিরামের প্রতিই আকর্ষণ বেশী , তখন সে স্ত্রীকে ভাটিরামের কাছে যেতে অনুমতি দিল । পতি হিসেবে নদরামের এই ঔদার্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । নদরামের এই উদার মন শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহে'র মহিমকে স্মরণ করিয়ে দেয় । নদরাম যা করেছে

হয়তো মহিমও তাই করত , যদি সুরেশ বেঁচে থাকতো । তদুপরি মহিম অচলাকে দ্বিচারিনী জেনেও গ্রহণ করেছে । এতদ্ব্যতীত বিবাহিতা নারীর পর - পুরুষে আসক্তি রবীন্দ্রনাথের 'পয়লা নম্বরে'র অনিলাকেও স্মরণ করিয়ে দেয় । অনিলার জৈবী তাড়নায় সংযমের প্রলেপ আছে , নন্দরামের দ্বিচারিণী স্ত্রীর তার বালাই নেই ।

গোস্বামীর 'রক্তবীজ' গল্পে গ্রাম্য - কলহের একটি সুন্দর চিত্র আছে । এই গল্পে প্রতিবেশী দুই বৃদ্ধ জগন্নাথ ধামে গেল তীর্থ করতে । এসে দেখে দুই পরিবারের মধ্যে কলহ হয়েছে । বৃদ্ধদ্বয়ের পুত্র যদু ও মণি , তাদের পিতার মত মিলেমিশে থাকার মন নেই । দুই পরিবারের কলহকে কেন্দ্র করে গ্রামটাই দুটো দলে বিভক্ত হয়ে গেল । এই গল্পে মুখ্য চরিত্র চারটি — দুই পুত্র , দুই পিতা । দুই পিতা মিলেমিশে থাকেন ভাইয়ের মত । কিন্তু তাদের দুই পুত্র বিপরীত । এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথের 'ব্যবধান' গল্পটিকে স্মরণ করিয়ে দেয় । এই গল্পেও মুখ্য চরিত্র চারটি । দুই পিতা হরচন্দ্র ও গোকুলচন্দ্র । দুই পুত্র বনমালী ও হিমাংশুমালী । হরচন্দ্রের পিতা বনমালী । গোকুল চন্দ্রের পিতা হিমাংশুমালী । রবীন্দ্রনাথের গল্পে পুত্রদ্বয় মিলমিশে থাকার পক্ষপাতী । হরচন্দ্র ও গোকুলচন্দ্র পুত্রদ্বয়ের বিপরীত । যেমন গোস্বামীর গল্পের যদু ও মণি । উভয় গল্পে কলহের কারণ অতি তুচ্ছ এক ব্যাপার । গোস্বামীর গল্পে কলহের উৎস — এক কথায় গরুর ধান খাওয়া । মণিদের গরু যদুদের ধান ক্ষেতে ঢুকে ধান খেয়ে যায় । রবীন্দ্রনাথের গল্পে কলহের উৎস — একটি নালা / ও পাতি নেবুর গাছ । উভয় গল্পের কলহের সূত্র হলো ভৃত্য । গোস্বামীর গল্পের দুই বৃদ্ধ পুত্রদের ব্যবহারে যারপর নাই ব্যথা পেয়েছে । অনুরূপ ব্যথা পেয়েছে বনমালী ও হিমাংশু । বনমালীর ব্যথা প্রকাশিত , হিমাংশুর ব্যথা অবশ্য অতটা স্পষ্ট প্রকাশিত নয় । সুতরাং বলা যায়, গোস্বামী নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের 'ব্যবধান' গল্পটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন । গোস্বামীর এই গল্পটির সঙ্গে টলস্টয়ের ' এ স্পার্ক নেগলেকটেড বার্নস দি হাউস' — গল্পটির সাদৃশ্য আছে ।

শরৎচন্দ্রের গোস্বামীর গল্পে প্রধানতঃ করুণরসের প্রাধান্য পরিলক্ষিত

হয়। এই করুণরসের প্রাধান্য বাঙালী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যেও খুববেশী করে অনুভূত হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যে অন্যায় ও অবিচারের চিত্র তুলে ধরেছেন। এই অন্যায় ও অবিচার গোস্বামীরও গল্পের বিষয়। লক্ষণীয় উভয় কথাকারেরই নাম এক।

....

।। সূর্য কুমার ভূঞা ।।
(১৮৯৪ - ১৯৬৪)

সূর্যকুমার ভূঞার গল্পগুচ্ছের নাম 'পঞ্চমী' (১৯২৭)। এতে পাঁচটি গল্প আছে। এই গল্পগুচ্ছের একটি সুন্দর গল্প 'শিলা নহয় ফুল'। শিক্ষিত যুবক পুষ্প বৃদ্ধ মায়ের আদেশে বরুণা নামে একটি ছোট মেয়েকে বিয়ে করে। বরুণা ধীরে ধীরে যুবতী হল। বরুণা পুষ্পকে চিঠি লিখল। পুষ্প বুঝতে পারল বরুণার হৃদয় পাষাণ নয়, কুসুম। বলাবাহুল্য নায়ক নায়িকার মিলন হল। এই গল্পটি স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পটিকে। এই গল্পে বিবাহের পর দুর্দান্ত প্রকৃতি পুরুষ-স্বভাবা বালিকার প্রেয়সী তরুণীতে রূপান্তরের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। পুষ্প শিক্ষিত যুবক। রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পের অপূর্বও শিক্ষিত। সে আইন পড়ে। বরুণার মত মৃন্ময়ীও বিবাহ ও তার অর্থ সম্যক্ বুঝতে পারে নাই। সময়ে উভয়েই বুঝতে পেরেছে এবং উভয়েরই পতির সঙ্গে মিলন হয়েছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় লেখক রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। শ্রী ত্রৈলোক্য নাথ গোস্বামী ও এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেছেন -''রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরর সমাপ্তি' গল্পর একাংশর প্রভাব ইয়াৰ ওপরত স্পষ্ট।''[১০]

আলোচিত গল্পকারগণ

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া — ২৪১
নবীনচন্দ্র বরদলৈ — ২৫২

নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী — ~~২৪৬~~ ২৫৫

শরৎচন্দ্র গোস্বামী — ~~২৪৭~~ ২৫৬

সূর্যকুমার ভূঞা — ~~২৫১~~ ২৬০

।। সূত্র নির্দেশ ।।

১। অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা — ডঃ মহেশ্বর নেওগ পৃঃ ৩১৮ ।

২। 'নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর গল্প' গ্রন্থর অন্তর্গত 'নগেন্দ্র নারায়ণ ~~XXX~~ চৌধুরীর গল্প' শীর্ষক ভূমিকা । (১৯৬৬)

৩। অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা — ডঃ মহেশ্বর নেওগ, পৃঃ৩১৮ ।

৪। আধুনিক অসমীয়া গল্প সাহিত্য — শ্রী ত্রৈলোক্য নাথ গোস্বামী , পৃঃ ১৪০

৫। ঐ ।

৬। ঐ , পৃঃ ১৪১ ।

৭। 'নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর গল্প' গ্রন্থর অন্তর্গত নারায়ণ চৌধুরীর গল্প শীর্ষক ভূমিকা ।

৮। আধুনিক অসমীয়া গল্প সাহিত্য — শ্রী ত্রৈলোক্য নাথ গোস্বামী , পৃঃ ১৪৭ ।

৯। ঐ , পৃঃ ১৫২ ।

....

(ও) রসরচনা

বেজবরুয়া যুগে অসমীয়া প্রবন্ধ - সাহিত্যও উল্লেখযোগ্য রূপে বিকাশ লাভ করেছে। তবে তার বিকাশের গতি ও প্রাচুর্য কবিতা - নাটক - উপন্যাসের মত নয়। অসমীয়া সাহিত্যের গদ্যশৈলী এবং প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্রমবিকাশে আনন্দ রাম ঢেকিয়াল ফুকন, হেমচন্দ্র বরুয়া, গুণাভিরাম বরুয়া প্রভৃতির নাম পূর্বসূরী রূপে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এখানে আমাদের আলোচ্য রসধর্মী প্রবন্ধ বা রম্য রচনা, সীমাবদ্ধ থাকবে — যাতে সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিচয় মেলে। বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াই এই যুগের অসমীয়া সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখক। বেজবরুয়া সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। মূলতঃ সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক ছিলেন বলেই বেজবরুয়ার হাতে প্রবন্ধ জাতীয় রচনাও রঙ্গব্যঙ্গের রসদ্যুতি স্পর্শে উজ্জ্বল ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তাই বেজবরুয়া রসরাজ বলে অভিহিত, কারণ তাঁর রচনায় হাস্যরসের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, 'শিবসাগর অসম সাহিত্য সভা'র তরফ থেকে প্রখ্যাত ছোট গল্প লেখক নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় বেজবরুয়াকে এই 'রসরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। বঙ্গসাহিত্যে অমৃত লাল বসুও (১৮৫৩ - ১৯২৯) 'রসরাজ' উপাধিতে ভূষিত হন। বেজবরুয়ার অমর রসরচনা হল 'কৃপাবর বরুয়ার কাকতর টোপোলা' (১৯০৪) এবং 'কৃপাবর বরুয়ার ওভোতনি' (১৯০৯)। এ ক্ষেত্রেও বেজবরুয়ার আদর্শ ছিলেন বাংলা সাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিম যেমন 'কমলা কান্তের' মাধ্যমে স্বীয় মনোভাব অকপটে অথচ প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন, তেমনি, বেজবরুয়াও 'কৃপাবর বরুয়া' (পরে 'বর বরুয়া') ছদ্ম নামের মাধ্যমে মনের কথা বলেছেন। উভয়েই দেশপ্রেমিক, মানব প্রেমিক। উভয়েই হাস্যরসের মধ্য দিয়ে সুবক্তব্য পরিবেশন করেছেন। বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর' ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। সুতরাং 'কাকতর টোপোলা' ও 'ওভোতনি' প্রকাশের পূর্বে বেজবরুয়া 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন নিঃসন্দেহ।

এই গ্রন্থটিতে ডি.কুইন্সি, স্কট ও ডিকেন্সের প্রভাব আছে। আফিংসেবী কমলাকান্তের ভাবমূর্তির উৎস ডি.কুইন্সির The Cenfessions of an English Opium Eater.

ভীষ্মদেব খোশনবিশের উৎস স্কটের Tales of my Landlord উপন্যাসের 'জেজেডিয়া ক্লেইশ বোথাম' চরিত্রটি । আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান কমলা-কান্তের উপর ডিকেন্সের 'স্যামওয়েলারে'র প্রভাব আছে । কেউ-কেউ এডিসনের 'রোজার ডি কভার্লির' সাথেও কমলাকান্তের সাদৃশ্য ix আছে বলে মনে করেন । বেজবরুয়ার 'টোপোলা' ও 'ওভোতনি'র মূলেও ঐসব পাশ্চাত্য গ্রন্থ এবং চরিত্রের প্রেরণা থাকিতে পারে । তবে যেহেতু 'কমলাকান্তের দপ্তর' 'টোপোলা' ও ওভোতনি'র বহু পূর্বে রচিত এবং বঙ্কিম বেজবরুয়ার একজন প্রিয় লেখক , সেই হেতু বঙ্কিমের 'দপ্তরের' দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক বলে আমাদের মনে হয় । 'কমলা কান্তের দপ্তরে' হাস্যরসের মাধ্যমে অনেক চিন্তাতত্ত্ব ও বিশ্লেষণ আমরা পাই । বেজবরুয়ার 'টোপোলা ও ওভোতনি'- তে তত্ত্ব কথা আছে ঠিকই , তবে তাতে হাস্য-রসটাই মুখ্য । এই হাস্য সর্বত্র নির্দোষ নয় , অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা' ব্যঙ্গের চাবুকের রূপ পরিগ্রহ করেছে । 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধ হাস্য-রসের মাধ্যমে সুরু । 'কাকতর টোপোলা' ও 'ওভোতনি' এই দুটিতেও দেখি তাই । 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র একটি প্রবন্ধের সূচনা এই রকম — '' আমার মন কোথায় গেল ? কে লইল , কই যেখানে আমার মন ছিল , সেখানেও তো নাই । যেখানে রাখিয়া ছিলাম সেখানে নাই । কে চুরি করিল ? কই সাত পৃথিবী খুঁজিয়া তো আমার 'মন চোর' কাহাকেও পাইলাম না ? তবে কে চুরি করিল ? ('আমার মন') ।
'কাকতর টোপোলা'র একটি প্রবন্ধের সূচনা এবার উদ্ধৃত করছি —'' খায় ঔ । খায় ঔ । । খালে ঔ ।।। চাওক । চাওক ।। চালে ঔ ।। অসমত নতুন । ভারতবর্ষত নতুন ।। পৃথিবীত নতুন ঔ ।। বৃহৎ কাণ্ড । অদ্ভুত কাণ্ড ।। অরণ্য কাণ্ড ঔ ।। বিরাট ব্যাপার । উদ্যোগ ব্যাপার ।। এদার বেপার ঔ ।।। ('বাতরি কাকতর কাহিনী') ।

'অসমীয়া জাতি ডাঙর জাতি' প্রবন্ধে জাতীয় 'ডাঙরতা'র অর্থাৎ বিরাটত্বের লক্ষণ সম্পর্কে কৃপাবর বরুয়া তেজ , বল , সহিষ্ণুতা ইত্যাদি শব্দের স্বকপোল কল্পিত ভাষ্য দিয়েছেন । এই প্রবন্ধটি পাঠ করলে 'দপ্তরে'র 'ইউটিলিটি' বা উদরদর্শন' প্রবন্ধটির কথা স্মৃতি পথে উদিত হয় । সেখানে কমলাকান্তও কয়েকটি শব্দের ভাষ্য দিয়েছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে । কৃপাবরের ভাষ্য এই রূপ —'' বলর পাকেওঅসমীয়াকে

পেলাওতা নাই । কারণ অসমীয়াই শারীরিক বলত কৈ দৈব বল বা কপালর বলত বেছি ভেজা দিয়ে । শাস্ত্ত কৈছে'দৈব বলাৎ এব নাস্য বলং । ' বুঢ়া লোকে কয় '' মাঘ মহীয়া কল পুহ মহীয়া জল খায় ষি তার সাত ভতরার বল'' অসমীয়াক জলে কলে জলা কলা করি থৈছে । মাহেকীয়ার পরা আঠীয়া কলখোয়া বাহুবলী বর বরুয়াই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ।''

এবার 'বলে'র ভাষ্য কমলাকান্ত কী করেছেন দেখা যাক –''দীর্ঘচ্ছন্দ বাক্য, মুখ চক্ষুর আরক্ত ভাব – ঘোরতর ডাক হাঁক – মুখ হইতে অনর্গল হিন্দী, ইংরেজী এবং নিষ্ঠীবনের বৃষ্টি, দূর হইতে ভঙ্গী এবং বিপক্ষের কোন প্রকার উদ্যম দেখিলে অকালে পলায়ন ইত্যাদিকে'বল'বলে । ('ইউটিলিটি বা উদর দর্শন') 'ইউটিলিটি' প্রবন্ধে ইউটিলিটি শিরোনামায় শ্রী ভীষ্মদেব খোশনবিশ তারকা চিহ্ন দিয়ে পরে তাঁর ভাষ্য দিয়েছেন । অনুরূপ প্রয়াস কৃপাবর বরুয়ার টীকা কারও করেছেন 'কাকতর টোপোলা'র 'পোষ্ট মর্টেম' প্রবন্ধের শিরোনামায় তারকা চিহ্ন দিয়ে । এতদ-ব্যতীত 'কমলাকান্তের দপ্তরের' প্রবন্ধের আরও অনেক শব্দের ভাষ্য তারকা চিহ্ন দিয়ে করা হয়েছে । যেমন 'বড় বাজার' প্রবন্ধে'অভাব নামে নারিকেল চতুর্বিধ' প্রসঙ্গে ভাষ্য ইত্যাদি । 'কাকতর টোপোলা'র অন্তর্গত একাধিক প্রবন্ধেও অনুরূপ ভাষ্য বিদ্যমান । যেমন – 'চুমা – বিজ্ঞান', 'কাপ আরু কাকতর কথোপকথন ' প্রভৃতি প্রবন্ধ । কমলাকান্তের দপ্তরের শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন ভীষ্মদেব খোশনবিশ, কখনো বা কমলাকান্ত শর্মা স্বয়ং । কাকতর টোপোলার টীকায় 'টীকাকার' লেখা আছে, টীকাকারের নাম নেই । নামের অভিনব ব্যাখ্যা করার লোভ কমলাকান্তের আছে । তাই পঞ্চানন হয়ে যায় তার কাছে পঞ্চানন্দ । অর্থাৎ মদ্য, মাংস, গাড়ী-জুড়ি, পোষাক ও বেশ্যা – এই পাঁচটি আনন্দ । কাকতর 'টোপোলা' তেও তার নজির আছে । এখানে K. Barooah হয়েছে Cebra. Barooah হয়েছে Lebra. ('অসমীয়া জাতি ভাতর জাতি') কমলাকান্তের বিবাহেচ্ছা হয়েছে যৌবন পেরিয়ে । ('আমার মন') কৃপাবর বরুয়ারও বিবাহের ইচ্ছা আছে তবে এই বিবাহ শর্ত সাপেক্ষ । ('বর বরুয়ার বিয়া')। কমলাকান্ত কবি, কৃপাবর কবি । দপ্তরের প্রবন্ধের মধ্যে কবিতা আছে (যেমন' একটি গীত'), কাকতর টোপোলার অন্তর্গত প্রবন্ধেও কবিতা আছে, যেমন –'ঢেঁকি কবি'।

কৃপাবর বর্‌য়া সনেট লিখেছেন অর্থাৎ কবিতা লিখেছেন। উদাহরণ 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', 'রাজেন্দ্র লাল মিত্র' ইত্যাদি। কমলাকান্ত অনুরূপ স্বতন্ত্র কবিতা লেখেন নি, তাঁর গদ্যই কবিত্বমন্ডিত। এই প্রসঙ্গে 'ফুলের বিবাহ' ইত্যাদি স্মরণীয়। 'কমলাকান্তের দপ্তরের' 'ফুলের বিবাহ' স্বপ্ন কেন্দ্রিক। 'কাকতর টোপোলার' 'সামাজিক' প্রবন্ধও স্বপ্ন কেন্দ্রিক। 'সামাজিক' শব্দের অর্থ স্বপ্ন। কমলাকান্ত নিজেকে নিয়েও কৌতুক করেছেন। যেমন 'আমার মন' প্রবন্ধে কমলাকান্তের বিবাহেচ্ছা। নিজেকে নিয়ে কৌতুক বরবর্‌য়াও করেছেন, 'মোর জন্মরহস্য', 'বর বর্‌য়ার বিয়া' ইত্যাদি প্রবন্ধে। কমলাকান্ত স্বর্গদর্শন করেছেন ('ঢেঁকি প্রবন্ধ'), স্বর্গদর্শন কৃপাবর বর্‌য়াও করেছেন। ('সামাজিক')। এত সাদৃশ্যের পর নিশ্চয়ই কৃপাবর বর্‌য়াকে অসমীয়া সাহিত্যে কমলাকান্ত বললে অন্যায় হবে না।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কৃপাবর বর্‌য়া 'ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর' নামে একটি সনেট লিখেছেন, এটি তাঁর বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পরিচায়ক। বর্‌য়াদেবের আরেকটি সনেটের নাম 'রাজেন্দ্র লাল মিত্র'। রাজেন্দ্র লাল মিত্র একজন মনীষী ব্যক্তি। ইতিহাস পুরাতত্ত্ব সাময়িক পত্র পরিচালনা, নানা সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থের সম্পাদনা প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি যে ধরণের চিন্তা বিচক্ষণতা ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর যুগের পাশ্চাত্য পন্ডিতেরাও তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। ইনিই প্রথম পাশ্চাত্য রীতিতে বাংলা গ্রন্থ সমালোচনা করেন। এই সমালোচনা রীতির দ্বারা বেজবর্‌য়াও প্রভাবিত। 'চন্দ্র বিজ্ঞান', 'জীবিকার উপায়' ইত্যাদি প্রবন্ধে এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মিত্র মহাশয়ের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) ও 'রহস্য সন্দর্ভ' (১৮৬৩) জ্ঞানগর্ভ পত্রিকা দুটির সঙ্গে বেজবর্‌য়া নিশ্চয়ই পরিচিত ছিলেন। আর এই অনুমান দৃঢ় হয় বেজবর্‌য়ার (কৃপাবর বর্‌য়ার) 'রাজেন্দ্র লাল মিত্র' শীর্ষক সনেটটি পাঠ করলে। সনেটটি উদ্ধৃত করা হলো —

ওঠরশ ষাঠি সন ভাদর শেহর পথ,
তিনিখন জাহাজ লাগিল কলিকাতার ঘাটত।
তিনিখন থন্দ খোয়া বিলাতী বিদ্যার
কিলাকিলি মরা মরি লাগিল কিনো তার।

পাইকারি, খুচরা, খরিদ বস্তাই বস্তাই মাল
রাজাই-দুলালে দেখে ঘটিল জঞ্জাল।
পালর পো কৃষ্ণদাস, লাল বিহারী দে
সৈতে ঝিমরিমি কিনে তিনিউ খনকে
পুঠি খলিহা খরিদ্দার বিফল মনোরথে
ঘরা ঘরি পুটি পল নিজ নিজ পথে।
এনুয়া রাজেন্দ্র লাল বঙালীর বিদ্যা
প্রত্নতত্ত্বর খোলাত ভরা জহা ধানের চিরা।
বাহ্বা বাহ্বা মিত্রি মশাই। কৃপা নিপদতি
কি খাই ফুকালে জগে এ নেয়ে সন্ততি।

'কমলাকান্তের দপ্তরে'র সঙ্গে যে ধরণের সাদৃশ্য 'কাকতর টোপোলা'তে লক্ষ করা যায়, তা' কৃপাবর বরুয়ার 'ওভোতনি'-তেও বিদ্যমান। কমলাকান্ত আফিংসেবী, তাই তিনি আফিং এর ঘোরে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। 'ওভোতনি'তে বরুয়া দেব আফিং না খেয়েও (নেশায়) বুঁদ হয়ে আছেন। 'ভারতবর্ষীয় জাতীয় সঙ্গীত' তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্র লাল — এঁরা সবাই লিখেছেন। বেজবরুয়াও লিখেছেন, অবশেষে কৃপাবর বরুয়াকে দিয়েও সেই কর্মটি সম্পন্ন করলেন অত্যন্ত ব্যঙ্গাত্মক ভাবে। বরুয়া দেবের 'ভারত বর্ষীয় জাতীয় সঙ্গীতে'র কিছু পরিচয় দিচ্ছি —

পোয়াঁ নিজর আরু ঘৈনীর জয়
হওক ই ভারত পবিত্র ময়।। ......

বরুয়া দেব অসমীয়া যুবকদের উপদেশ দিয়েছেন এ বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতেই —

পারিলে মদ কিনি খাবি
নোয়ারিলে কি করিবি
ভাহটো কিন্তু সস্তা বোপাই
জাতর ঢাকোন ঢকা হের অসমীয়া ডেকা। ('অসমীয়া ডেকার প্রতি')

কৃপাবর বরুয়া সত্যি রসিক মানুষ । 'টকরুর দৌরাত্ম্য' প্রবন্ধে বরুয়া দেবকে অনেক কয়টি প্রশ্ন করা হয়েছে । একটি প্রশ্ন — সি (কলকাতা) কিমান ডাঙর?

বরুয়াদেবের উত্তর হল —'' আপোনার চিঠি পোয়ার দিনারে পরা মই কলকাতার দীর্ঘ পুতল এহাত — দুহাতকৈ জুখিব লাগিছোঁ আরু তাতে লাগি থকা বাবেই মই আজরি উলিয়ার নোয়ারি আপোনার চিঠির উত্তর দিয়াত পলম করিলোঁ । জোখা শেষ হলেই মই আমার গাঁও লৈ গৈ তাকো জুখি পেলাম তার পিছত জমা খরচ করি অংকের ফল মিটা ওলায় আপোনাকে জনাম ।'' ঐ পত্র — প্রবন্ধে কমলাকান্তের পত্রের প্রভাব আছে । 'এখন মুকলি চিঠি' ও এই শ্রেনীর রচনা । 'মুকলি' শব্দের অর্থ খোলা । তবে কমলাকান্তের পত্রের ('পলিটিক্স', 'কমলাকান্তের বিদায়', ইত্যাদি) সংযম গাম্ভীর্য এতে নাই ।

কৃপাবরের 'বন্দেমাতরম্' ও 'ভারত - উদ্ধার' প্রবন্ধের মূলেও বাংলা সাহিত্যের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক । বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' পড়েই যে বরুয়া দেব 'বন্দেমাতরম্' প্রবন্ধের পরিকল্পনা করেছেন এমন অনুমান করা যেতে পারে । ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত - উদ্ধার' (১৮৭৭) শীর্ষক একটি বিখ্যাত ব্যঙ্গ কাব্যই তো বাংলা সাহিত্যে রয়েছে । বাঙালীর অন্তঃসারশূন্য রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সে যুগের কংগ্রেসী আবেদন — নিবেদনের দীনতাকে বিদ্রুপ করে মাইকেলী ঢঙে ইন্দ্রনাথ 'পঞ্চানন্দ' বা পাঁচু ঠাকুর নামে উক্ত কাব্যটি রচনা করেন । এই জাতীয় রচনা ইংরেজী সাহিত্যে **mock heroic poem** বলে অভিহিত । 'কাকতর টোপোলা' এবং 'ওভোতনি'তে যে ব্যঙ্গাত্মক রচনা পাওয়া যায় , তাতে এই ব্যঙ্গ — কাব্যটিরও প্রভাব থাকা আশ্চর্যের কিছু নয় । কারণ 'ভারত - উদ্ধার' যেমন ব্যঙ্গ — কাব্য , তেমনি 'কাকতর টোপোলা' এবং 'ওভোতনি' ব্যঙ্গ - প্রবন্ধ ।

'বরবরুয়ার বুলনি'ও (মরণোত্তর প্রকাশ ১৯৬৪) হাস্যরস ও ব্যঙ্গ — মিশ্রিত রচনা । এখানে বেজবরুয়া আর কৃপাবর বরুয়া নন , বরবরুয়া । 'বুলনি'র প্রথম প্রবন্ধটির নাম 'বরবরুয়ার হাঁহ চুরির মকর্দমা' । হাঁহ অর্থাৎ হাঁস । হাঁস চুরি নিয়ে রবীন্দ্রনাথেরও একটি হাস্যরসাত্মক নাটিকা আছে , নাম 'রোগের চিকিৎসা', এটি 'হাস্য কৌতুক' (১৯০৭) গ্রন্থের অন্তর্গত । উভয় রচনাতেই হাঁস চুরি প্রাধান্য পেয়েছে । এতে একাধিক বাংলা গানের কলি আছে । একটি উদ্ধৃত করছি —

ও যায় হংসিনী গামিনী ,
হংসিনী গামিনী ,
ধীরে ধীরে যায় গো ,
হংসিনী গামিনী ।
ধীরে ধীরে চলে যায়
নীল বসন উড়ে গায় ,
নীলবসন তিতল ঘামে
কেমনে দাঁড়াবে আমার বামে ?
হংসিনী গামিনী ।।

কমলাকান্তের মত বরবরুয়াও নেশা করেন , এবং বুঁদ হয়ে থাকেন । হংস চুরি করতে গিয়ে বরবরুয়া ধৃত হন । বিচারালয়ে বর বরুয়ার বক্তব্য 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' কে স্মরণ করিয়ে দেয় । জোবানবন্দীতে কমলাকান্তের উক্তি সকলেরই হাসির উদ্রেক করে । এখানে ('বরবরুয়ার হাঁহ চুরি মকর্দমা') বরবরুয়ার উকিলের উক্তিও হাস্যরসাত্মক । তিনি বলেন —'' বাস্তবিক পক্ষে বরবরুয়া হাঁহ চোর ন হয় , হাঁহ হে বর বরুয়ার মন চোর ।''' কমলাকান্তের জোবানবন্দী'তে গরু চুরি নিয়ে হাস্যরস জমে উঠে । হাঁহ বরবরুয়ার মন চুরি করেছে । এই মন চুরি প্রসঙ্গ 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র 'আমার মন' প্রবন্ধের সূচনায় আছে । সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে এই রস-প্রবন্ধ রচনার মূলে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে । 'বুলনি'র অনেক প্রবন্ধে বাংলা কবিতার নানা অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । কয়েকটি কবিতার উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হল —

১। বধূ কি আর কহিব আমি
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হৈও তুমি । ('খইটা ডিমুর সত্ত্বাধিকার')

২। রমনীর মন সরল যেমন
পুরুষ যদি তেমনি হোত
তবে কেন রঘুনাথ জানকীরে
বোনে দিত । ....(ঐ)

৩। আমি শুধু রইনো বাকী।
~~xxxx~~ * * *
আমার বলে ছিল যারা,
কোথায় তারা, দেয়না সাড়া, ... ('সন্ত রাম')

৪। আরে শ্যাম কমল লোচন শ্যাম
শিশু সঙ্গে চলে বৃন্দাবন ....('বর বরুয়ার ভাবোন্মাদ)

৫। ~~ঐxবুঝিxxবাঁশিxবাজে~~ ঐ বুঝি বাঁশি বাজে
~~বনেxমাঝে~~ বন মাঝে কি মন মাঝে। (ঐ)

৬। " যাব কি যাবনা
মিছে এই ভাবনা।
মিছে মরি লোক লাজে।" (ঐ)

৭। শুনেছি কোন কুঞ্জ বনে
~~শুনেছি কোন কুঞ্জ বনে~~
যমুনাতীরে। .... (ঐ)

৮। দেখি যে তোর মুখের হাসি
(তারে) ফুলের মালা পরিয়ে আসি। .... (ঐ)

৯। ও সখি হাস হাস চারু বদনে। ...
(' বর বরুয়ার মালশুম')

১০। তুমি কাদের কুলের বৌ
('' বর বরুয়ার হাতর বিষ'')

১১। ও' আমার সাধের বকুল ফুল
দুপুর বেলা নাইতে গিয়ে
হারালেম দুকূল। (ঐ)

১২। আমি স্বপনে রয়েছি ভোর
সখি আমারে জাগাইওনা, না। (ঐ)

'বরবরুয়ার ষষ্ঠ বিংশতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চ বিংশতি' নামটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সব প্রবন্ধই 'কমলা কান্তের দপ্তরে'র মত হাস্য রস সহযোগে পরিবেশিত, সঙ্গে ব্যঙ্গের কশাঘাতও আছে। 'বরবরুয়ার ভাবের বুরবুরনি' (প্রথম ভাগ, ১৯৫১) গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটির নাম 'মনুষ্য পুরাণ'। 'কমলাকান্তের দপ্তরে'ও 'মনুষ্যফল' নামে একটি প্রবন্ধ আছে। উভয় প্রবন্ধ মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কিত, হাস্যরস সহযোগে পরিবেশিত।

'তিনি মাহাত্ম্য' প্রবন্ধের একস্থানে আছে, "বরঘৈনী, মাজুঘৈনী আরু শব্দ ঘৈনী। বড় লোক ডাঙরীয়া ডাঙরীয়ানী তিনি ঘৈনী। ('ঘৈনী' শব্দের অর্থ স্ত্রী)।

এ জনীয়ে রান্ধে বাঢ়ে এ জনীয়ে খায়
এ জনীয়ে জনীয়ে খংকরি মাকর ঘরলৈ যায়।"

অনুরূপ কবিতা বাংলাতেও আছে —

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টাপুর নদে এল বান।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান।।

বঙ্গের বিবাহিতা নারী বাপের বাড়ি যায়, কিন্তু আসামে বিবাহিতা নারী যায় মায়ের বাড়ি। 'বিচ্ছেদ' প্রবন্ধে রাম প্রসাদী সুরে দু'টি অসমীয়া গান আছে। (ইমান ..... কয়' ও 'প্রেমর বিজ্ঞান ...... উজান ভাটি')।

'বর সবাহ নে সভা ?' প্রবন্ধটির সূচনা রবীন্দ্রনাথের এই গানটি দিয়ে ..

'' শুধু যাওয়া আসা শুধু স্রোতে ভাসা
শুধু আলো আঁধারে কাঁদা হাসা ।
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙা বল ,
প্রাণপণ কাজে পাই ভাঙা ফল ।
ভাঙা তরী ধরে ভাসি ~~পাথা~~ পারাবারে
ভাব কেঁদে মরে ভাঙা ভাষায়'' ,

' নোবেল প্রাইজ' প্রবন্ধটির প্রাণকেন্দ্র রবীন্দ্রনাথ । এই প্রবন্ধ গ্রন্থেও বহু বাংলা কবিতা তথা গান আছে । যেমন —

১। শুধু যাওয়া আসা .... ('' বর সবাহ নে সভা'')।
২। আমি আপনার মনে আপনি হারা ....
('' কবি – বিভ্রাটর ফুর ফুরনি'') ইত্যাদি ।

'বরবরুয়ার ভাবর বুরবুরনির দ্বিতীয় ভাগেও অনেক বাংলা কবিতা আছে । যেমন ....

(১) স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায় .... ('' হরিষত বিষাদ'') ।

(২) আমার গতি কি হবে তারা ।
ভাবিতে ভাবিতে ভয়ে
বহে দু নয়নে অশ্রু ধারা । (ঐ)
বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়
একি ঘোর প্রেম অন্ধ বহে
জীবন যৌবন গ্রাসে । ('ভাল পোয়া তারু প্রেম') ইত্যাদি

'যোগ আর ব্রহ্মচর্য্য' প্রবন্ধের সূচনায় লম্বাইর উক্তির মধ্য দিয়ে যোগ - অভ্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য আচরণের কথা আছে, কেন ? দেশ উদ্ধারের জন্য । এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠের' কথা মনে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক ।

' বরবরুয়ার চিন্তার শিলগুটি' গ্রন্থে ঐ একই ধারা অনুসৃত হয়েছে । এখানে 'বরবরুয়ার চিঠি' নামে একটি প্রবন্ধ আছে । এই প্রসঙ্গে 'দপ্তরের' কমলাকান্তের পত্র পর্যায়ের প্রবন্ধগুলো স্মরণীয় । 'বৃদ্ধ বিবাহ প্রচার সমিতি' শীর্ষক প্রবন্ধের বক্তব্য বৃদ্ধের বিবাহ বিষয়ক কথা । বৃদ্ধের বিবাহ নিন্দনীয়, এই কথাটাই বরবরুয়ার নিজস্ব ঢংএ প্রকাশিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' এই দুটি স্মরণ করা যায় । এখানেও বৃদ্ধের বিবাহের বাসনার নিন্দা করা হয়েছে । এই সকল ভাব 'বৃদ্ধবিবাহ প্রচারণী সভার গীতে', 'কের পাই কোম্পানীর ভেন ভেননি' ইত্যাদিতে পরিলক্ষিত হয় ।

'বাঁহী লৈ বিদায় পত্র' প্রবন্ধটি 'কমলাকান্তের বিদায়' শীর্ষক পত্র - প্রবন্ধটিকে স্মরণ করিয়ে দেয় । 'বরবরুয়ার সাহিত্যিক রহস্য প্রবন্ধ গ্রন্থেও ঐ একই ধারা অনুসৃত হয়েছে । এতেও একাধিক বাংলা গান উদ্ধৃত হয়েছে । যেমন ——

(১) '' আমায় আর গাহিতে বলনা
শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা
শুধা মিছে কথার ছলনা ।' -- রবীন্দ্রনাথ
('বর বরুয়ার কৈফিয়ৎ')

(২) আমায় ক্ষমহে ক্ষম ওহে নিরুপম
ওহে নিরুপম
আ - হা - হা - হা - আ ---- রবীন্দ্রনাথ
(ঐ)

~~(৩) আগে চল আগে চল ভাই~~

(৩) আগে চল আগে চল ভাই
পরে থাকা মিছে মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কি বা ফল ভাই ?
('' বর বরুয়ার ফোরোহনি'')

'বরবরুয়ার ফোরোহনি' প্রবন্ধে একটি বিখ্যাত বাংলা প্রবাদ রয়েছে। প্রবাদটি এই - - - - - -'' খোর বড়ি থাড়া, থাড়া বড়ি খোড়।''

কমলাকান্তের বাক্‌চাতুর্যের প্রভাব বেজবরুয়ার সব কটি প্রবন্ধ গ্রন্থে কম বেশি পরিমাণে বিদ্যমান। [illegible] 'বরবরুয়ার' জোক' প্রবন্ধের লম্বাইর সংলাপ একটু উদ্ধৃত করছি - -

বরবরুয়া। পণ্ডিতর মুখত দাঁত দেখিছা নে ? লম্বাই। দাঁত এটাও নাই।

সোনা।

বরবরুয়া। তেন্তে পণ্ডিত বেদান্তিক নহয় নে ? 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র প্রায় সব প্রবন্ধেই মঙ্গলা গরু, প্রসন্ন গোয়ালিনী, প্রভৃতি বিদ্যমান। বেজবরুয়ার অনেক প্রবন্ধে 'কৃপাবর' অথবা বরবরুয়ার সাথে কয়েকটি চরিত্র দেখা যায়, যেমন লম্বাই, বাপুরাম, প্রিয় দর্শন ইত্যাদি। প্রধানত বঙ্কিম চন্দ্রের 'কমলাকান্তেরই প্রভাব' যদিও বেজবরুয়ার রস-রচনার আদর্শ জুগিয়ে ছিল, তবুও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য রচনা সমূহ সম্পর্কেও সম্ভবত তিনি অবহিত ছিলেন। যেমন — ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত — উদ্ধার' কাব্য এবং ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত উপন্যাস 'কল্পতরু', বঙ্গবাসী সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত পাঁচু ঠাকুরের (ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) রঙ্গ - ব্যঙ্গ সংক্রান্ত চুটকি রচনা (১৮৮৪ - ৮৫ সালের মধ্যে এগুলি পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়)। 'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর ব্যঙ্গ - উপন্যাস 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬ -- ৮৮)। 'চিনিবাস চরিতামৃত' (১৮৮৬), [illegible]

'কালাচাঁদ' (১৮৮৯ — ৯০) — রসরাজ অমৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাট' (১৮৮৪), 'রাজা বাহাদুর' (১৯০৯) 'খাসদখল' (১৯১২) ইত্যাদি । তবে এঁদের প্রত্যক্ষ প্রভাব কিছু আমাদের লক্ষ্য গোচর হয়নি । এঁরা তাঁর রসসিক্ত মনের পুষ্টির সহায়ক হতে পারেন । বেজবরুয়ার এই ধরণের রসরচনায় শুধু তাঁর রসিক চিত্তই ধরা দেয়নি , স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতিও অভিব্যক্ত হয়েছে অতি সুন্দর ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মতই । এই বিষয়ে ডঃ মহেশ্বর নেওগের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য - - -

'' রচনা চাতুর্যত নিহিত হাস্য বা বিট (wit) আরু পাতল - ব্যঙ্গর যোগেদি বেজবরুয়ার দেশপ্রাণতা এই লেখা বোরত বিরিঙি উঠিছে'' । (অসমীয়া সাহিত্যের রূপরেখা — পৃঃ ৩২৬) ।

****

।। উপসংহার ।।

বেজবর়ুয়া য়ুগের অসমীয়া সাহিত্যে (ঊনবিংশ শতাব্দীর নবম দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত) বাংলা সাহিত্যের প্রভাব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা শেষ হল । এই আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম , সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য বিচিত্রভাবে অসমীয়া সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে । বিশেষ করে ঐ সময়কার বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি নাট্যকার ঔপন্যাসিকরাই অসমীয়া সাহিত্যিকগণ কর্তৃক বিশেষভাবে অনুকৃত ও অনুসৃত হয়েছেন । উপসংহারে আমরা অতি সংক্ষেপে তার উল্লেখ করছি ।

কাব্য :— কবিতার ক্ষেত্রে অসমীয়া কবিগণ প্রধানত মধুসূদন , রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন সর্বাধিক । এটাই স্বাভাবিক, কেননা এই তিনজন কবির বিশিষ্ট স্বকীয়তা, ভাব ও প্রকাশরীতির স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং তা অন্যকে অনুপ্রাণিত করার পক্ষে যথেষ্ট । ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় রেনেসাঁর প্রতীক মাইকেল মধুসূদনই বাংলাকাব্যে আধুনিকতার সূচনা করেছিলেন প্রাচ্য - পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণার মধ্যে যোগ সাধন করে । তিনি বাংলাভাষায় পৌরুষ ও গতিবেগ সঞ্চার করেছিলেন, বাংলার সনাতন কাব্যছন্দ পয়ারের ভিত্তিতে অভিনব অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রতিষ্ঠা করে বাংলা কাব্যে ছন্দোমুক্তির সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছিলেন ~~তিনি~~। অসমীয়া কবিগণ এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছিলেন বেশী । তবে একথা স্বীকার্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দের বহিরঙ্গ সৌষ্ঠব বাংলা কাব্যে ও অসমীয়া কাব্যে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হলেও তার অন্তর্গূঢ় ধ্বনিকল্লোল ও প্রবহমানতা অপর কোন বাঙালী বা অসমীয়া কবিই যথাযথ আয়ত্ত করতে পারেননি । তবে অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকৃতির ফলে অসমীয়া কাব্যে ও নাটকে যে বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়েছে তার মূল্যও কম নয় । রমাকান্ত চৌধুরী, ভোলানাথ দাস,

পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া, হেমচন্দ্র গোস্বামী, চন্দ্রধর বরুয়া, হিতেশ্বর বরবরুয়া প্রমুখ কবির অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্য - কবিতা সম্পর্কে বলা যায়, এঁদের উৎকর্ষের তুলনায় নিষ্ঠা ও আন্তরিক প্রয়াসই প্রশংসনীয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছাড়াও মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে যে গভীর বলিষ্ঠ জীবন - প্রত্যয় ফুটে উঠেছে, বিশেষত দেবানুগৃহীত রাম-লক্ষ্মণের দিক থেকে আমাদের দৃষ্টি রাবণ ও মেঘনাদের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি যে নবযুগোচিত মানবধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, তা' অসমীয়া কবিদেরও কতকাংশে অনুপ্রাণিত করেছে, একথা যথাস্থানে প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে। তা ছাড়া মধুসূদনের অনুসরণে সনেট রচনায়ও উদ্যম দেখিয়েছেন প্রধানত পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া, হেমচন্দ্র গোস্বামী এবং হিতেশ্বর বর-বরুয়া। সামান্য ভাবে হলেও মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্য ও ব্রজাঙ্গনা কাব্যের আংশিক অনুসৃতিও দু'একজন অসমীয়া কবির মধ্যে লক্ষ করা গেছে। মোটের উপর দেখতে গেলে চন্দ্রধর বরুয়া এবং হিতেশ্বর বরবরুয়াই মধুসূদনের কবিধর্মের কিছুটা ধারণা করতে পেরেছেন। তাঁর কাব্যাঙ্গিক গ্রহণ করে এঁরা অসমীয়া কাব্যে দৃঢ়তা ও বৈচিত্র্য সম্পাদনের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভার ঐশ্বর্যে ও প্রাচুর্যে ভরে দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের ভান্ডার, তার এমন দিক নেই যা রবীন্দ্র - দানে পুষ্ট হয়নি। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। কাব্যেই তাঁর প্রতিভার সম্যক স্ফূর্তি ও বিকাশ। আবেগের আকুলতা, অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা, প্রাণপ্রাচুর্য, রোমান্টিক মানসিকতা, মর্ত্যমমতা, মানবপ্রীতি, বিশ্বজনীনতার এমন অপূর্ব সমাবেশ আর কারো কাব্যে দেখি না। তাঁর ভাব ও উপলব্ধির এই বৈচিত্র্যই শুধু নয়, তাঁর ভাষা ও ছন্দের মাধুর্যদ্বারা বাঙালী এবং ভারতীয় অন্যান্য ভাষার অনেক বাণী-সাধকই অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছেন। সুতরাং তাঁর অমোঘ প্রভাব অসমীয়া সাহিত্যেও অনিবার্য ভাবে এসে পড়েছে। বাঙলা সাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রানুসারী কবির সংখ্যা অনেক, অসমীয়া সাহিত্যেও তা' কিছু কম নয়। যেমন —লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, চন্দ্রকুমার আগর - ওয়ালা, পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া, রঘুনাথ চৌধারী, অম্বিকা গিরি রায় চৌধুরী, সূর্যকুমার ভূঞা, রত্নকান্ত বরকাকতী, ভৈরবচন্দ্র মাটনীয়ার, নলিনী বালা দেবী,

বিনন্দ চন্দ্র বর‍ুয়া প্রভৃতি । তন্মধ্যে রবীন্দ্রপ্রভাব সর্বাধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় রত্নকান্ত বরকাকতী, ভৈরবচন্দ্র যাটনীয়ার, নলিনী বালা দেবীর কবিতায় । এঁরা রবীন্দ্র কাব্যের বিচিত্র ভাবোপলিব্ধি আত্মস্থ করার প্রয়াস পেয়েছেন । তবে বিরাট রবীন্দ্র - প্রতিভাকে তাঁরা সম্যক অনুধাবণ ও অনুসরণ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না । সমসাময়িক বহু বাঙালী কবির পক্ষেও রবি - কবির উজ্জ্বল কিরণচ্ছটার বৈভব সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি । এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যটি স্মরণীয় – '' তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ , এবং অসম্ভব ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ ।'' (সাহিত্যচর্চা, ১০৭ পৃ:) এই দৃষ্টি কোণ থেকে পূর্বোক্ত অসমীয়া কবিগণ সম্পর্কে ডঃ মহেশ্বর নেওগের নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য — '' বিশ্ববিলীনতাই রবীন্দ্র কাব্যের বৈশিষ্ট্য । এনে বহল ধারণার প্রভাব অসমীয়া কবিতাত নাই'' । (আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য , ৮১ পৃ:) তবে রবীন্দ্রনাথের বহিরঙ্গ প্রভাব , যেমন – প্রকাশভঙ্গি, শব্দচয়ন, চিত্রকল্প প্রভৃতির অনুসৃতি উপরোক্ত কবিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় । রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবোধ, প্রেম - ধারণা , মর্ত্যপ্রীতি, সুন্দর চেতনা , জীবনদেবতা উপলব্ধি প্রভৃতি অসমীয়া কবিদের কবিতায়ও কিছু কিছু প্রতিফলিত হয়েছে , তা আমরা লক্ষ্য করেছি । আরো লক্ষণীয় এই যে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক-ভাবনাপর্যায়ের কবিতা এবং অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতার কবিতা সমূহই তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছে বেশী । বলাকা এবং তৎপরবর্তী কালের কবিতার প্রভাব আমাদের চোখে পড়েনি । যা হোক , তাঁদের কিছু কিছু কবিতা আংশিকভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে, তা' আমরা আলোচনা সূত্রে বলেছি । তবে তা' রবীন্দ্র - সৃষ্টির উত্তুঙ্গতায় উঠতে পারেনি , পারা সম্ভবও নয় । তার জন্যে অসমীয়া কবিদের ব্যর্থ বলা যায় না । রবীন্দ্রানুসৃতি তাঁদের কাব্যসৃষ্টিকে ব্যাপ্তি ও গভীরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে , বিচিত্র ভাবরসে সমৃদ্ধ করেছে । এটি কম লাভ নয় ।

বাংলা কাব্যে রবীন্দ্র - প্রভাবের মধ্যেই উচ্চকণ্ঠ বিদ্রোহের বাণী অগ্নিবীণায় ঝংকৃত ক'রে নজরুল ইসলাম যে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিলেন তা'র স্বাতন্ত্র্য উল্লেখযোগ্য । তাঁর কবিতায় রয়েছে উৎপীড়ক ও শোষকের প্রতি ধিক্কার , সর্ববিধ অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, জাতিভেদ ও ধর্ম - কুসংস্কারের ভণ্ডামির প্রতি ঘৃণা ,

নবসৃষ্টির জন্য ব্যাকুলতা । নজরুলের কাব্যে প্রকাশিত যৌবনের উন্মাদনা , ভাষা ও ছন্দের উদ্দাম রূপের যে তাৎক্ষণিক আকর্ষণ রয়েছে , তাতে গভীরতার চাইতে উচ্ছ্বাসই প্রবল । কিন্তু শুধু বাঙালী নয় , অন্যান্য প্রদেশ-বাসীরাও তার দ্বারা অভিভূত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন । মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে নজরুলের কবিতার প্রতিও প্রবল আকর্ষণ, অনুভব করেছেন অসমীয়া কবিগণ । বলাবাহুল্য , উত্তপ্ত আবেগে বিচলিত হবার মত উপাদান নজরুলের কবিতায় যথেষ্ট রয়েছে যার অনুকরণ অনেকটা সহজসাধ্য । চন্দ্রকুমার আগরয়ালা, প্রসন্নলাল চৌধুরী, নলিনী - বালা দেবী, অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী , বিনন্দ বরুয়া প্রভৃতি কবিগণ নজরুলের কবিতার উদ্দীপনাময় প্রভাব বিশুদ্ধ ভাবেই গ্রহণ করতে পেরেছেন । প্রসন্নলাল চৌধুরীতো অসমীয়া সাহিত্যে 'বিদ্রোহী কবি' রূপেই চিহ্নিত হয়েছেন ।

বাংলার কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার কিছু-কিছু প্রভাবও আমরা অসমীয়া কবি হেমচন্দ্র গোস্বামী, আনন্দচন্দ্র আগরয়ালা , রঘুনাথ চৌধুরী প্রভৃতির কবিতায় লক্ষ্য করেছি । হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকাব্য রচনায় ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ গঠনে মধুসূদনের মত পারদর্শিতা দেখাতে না পারলেও দেশাত্মবোধক খণ্ড কবিতা রচনায় সাফল্য লাভ করেছিলেন । এ ছাড়া তিনি পোপ, ড্রাইডেন, লংফেলো প্রভৃতি ইংরেজ কবির কয়েকটি কবিতার সুন্দর কাব্যানুবাদ করেছিলেন । বলাবাহুল্য , অসমীয়া কবিগণ হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্য' দ্বারা মোটেই প্রভাবান্বিত হননি । তাঁরা প্রধানত হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধক বিখ্যাত 'ভারত - সঙ্গীত' কবিতাটি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন । তাঁর লংফেলোর ' Psalms of Life ' কবিতার সুবিদিত অনুবাদ 'জীবন সঙ্গীতে'র প্রভাবও অসমীয়া কবিদের উপর কম নয় , তা' আমরা আলোচনা কালে লক্ষ্য করেছি ।তাঁর 'চাতকপক্ষীর প্রতি' কবিতাটি আকৃষ্ট করেছিল কবি রঘুনাথ চৌধারীকে । বাংলার কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব অসমীয়া কবি হেমচন্দ্র গোস্বামীর উপরই সমধিকভাবে পড়েছে ।বাঙালী ছন্দনিপুণ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দু'চারটি কবিতার আংশিক অনুসরণ ও ছায়াপাত ঘটেছে কয়েকজন অসমীয়া কবির কবিতায় । তাঁরা হলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া , রত্নকান্ত বরকাকতি । লক্ষণীয় এই যে অসমীয়া কবিরা তাঁর ছন্দোনৈপুণ্য অনুধাবণের তেমন চেষ্টা করেননি ।

তাঁর কয়েকটি কবিতামাত্র, যেমন —'আমরা', 'বারাণসী', 'চাতকের কথা', প্রভৃতি অসমীয়া কবিদের মানসপটে রেখাপাত করেছে দেখতে পাই । তবে কোন অসমীয়া কবিই সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করেননি । তাই অসমীয়া কবিদের ওপর তাঁর প্রভাব সামান্য মাত্র । তা ছাড়া, এখানে সেখানে সামান্যভাবে ভারতচন্দ্রের , ঈশ্বর - গুপ্তের , দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আংশিক অনুকৃতিও আমাদের চোখে পড়েছে ।

নাটক :— অন্যান্য সাহিত্যের মতই অসমীয়া সাহিত্যেও কবির সংখ্যাই সমধিক, তাই আমাদের কাব্য - আলোচনা অংশই হয়েছে তুলনায় বিস্তৃত । তা'বলে অসমীয়া নাট্য সাহিত্যও কম সমৃদ্ধ নয় , নাট্যকারের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও একাধিক নাট্যকার নাটক রচনায় দক্ষতাও দেখিয়েছেন । বাংলা আধুনিক নাট্যসৃষ্টির সূচনায় যেমন ছিল পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চ ও ইংরেজী নাটকের অনুকরণজাত প্রভাব , অসমীয়া আধুনিক নাট্য সৃষ্টির প্রেরণাও তেমনি এসেছিল পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শ থেকে । তবে সরাসরি নয় , সমালোচকের ভাষায় বলা যায় — '' এই পাশ্চাত্য বা ইংরেজী প্রভাব অবশ্যে ইংলণ্ডর পরা পোনে পোনে অহা নহয় । এই বিষয়ত বঙ্গই , বিশেষকৈ কলিকাতাই প্রথমবেপরা নাট্যকার - সকলক প্রভাবান্বিত করিছিল ''। (অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা — ডঃ মহেশ্বর নেওগ , পৃ: ২১৮) সুতরাং অসমীয়া সাহিত্যে বাংলা নাটকের প্রভাব ছিল প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক । এই বিষয়ে আমরা নাটক — অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি । আমরা লক্ষ্য করেছি , কাব্যক্ষেত্রে প্রধানত মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলামই অসমীয়া কবিদের বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছেন , সেই তুলনায় অন্যান্য কবিদের প্রভাব সামান্য বলা চলে । তেমনি নাটকের ক্ষেত্রেও দেখি , বেজবরুয়া যুগের অসমীয়া নাটকে সমসাময়িক কালের খ্যাতিমান বাঙালী নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রভাবই সর্বাধিক, সেই তুলনায় রবীন্দ্র - নাটকের অনুসৃতি অতি সামান্য । বলা বাহুল্য , রবীন্দ্রনাথের ভাবরসনিবিড় নাটকের অনুকরণ বা অনুসরণ ভারতীয় অন্যান্য সাহিত্যেও ততটা হয়নি । গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাপ্লুত পৌরাণিক নাটক ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজের বাস্তব সমস্যা-ভিত্তিক নাটক সমূহ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের সঘাত-সংকুল জাতীয় ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটক সমূহের প্রত্যক্ষ আবেদন সহজেই অনুপ্রাণিত করেছিল অসমীয়া নাট্যকারদের । বাংলা নাটকের

উৎকর্ষ বিষয়ে তাঁদের আস্থা প্রকাশ পেয়েছে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'নোমল' নাটকের সত্রাধিকার প্রভুর (গোঁসাই) মুখে, তিনি তাঁর বাংলা ভাষায় রচিত নাটকের বিষয়ে গর্ব বোধকরে বলছেন — 'বঙলা নাটর বর তেজ'। কৌতূহলের বিষয় এই যে,কোন কোন অসমীয়া নাটকে অসমীয়া সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে বাংলা সংলাপও প্রযুক্ত হয়েছে । রুদ্রাম বরদলৈর 'বঙাল - বঙালনী' নাটকে প্রচুর বাংলা সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে । বেণুধর রাজখোয়ার'দরবার' নাটকে প্রযুক্ত বাংলা সংলাপও উল্লেখযোগ্য । হেমচন্দ্রবরুয়ার 'কানীয়া কীর্তনে' বাংলা গানও দেওয়া হয়েছে । কাব্য আলোচনা কালে দেখেছি , মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ বোধ করেছিলেন অসমীয়া কবিগণ । বাংলা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দ গৃহীত হয়েছিল প্রধানত গিরিশচন্দ্রের ভাঙা অমিত্রাক্ষর বা গৈরিশ ছন্দের মধ্য দিয়ে । অসমীয়া নাট্যকারগণও তাঁদের অনুরূপ নাটকে ভাঙা অমিত্রাক্ষর বা গৈরিশছন্দ সাগ্রহে প্রয়োগ করেছেন । এই ছন্দানুকৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া (জয়মতী , সাধনী), চন্দ্রধর বরুয়া (মেঘনাদ বধ, হরিশচন্দ্র), অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী (জয়দ্রথ বধ), অতুল হাজরিকা (নরকাসুর, দাতাকর্ণ), নকুলচন্দ্র ভূঞা (বদন বরফুকন , চন্দ্রকান্ত)। বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত নাটকগুলিতে এই ছন্দের প্রয়োগ লক্ষণীয় ।

অসমীয়া নাট্যকারদের কোন কোন পৌরাণিক নাটকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারত থেকেও বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছে দেখা যায় । তাই পৌরাণিক নাটকের ভাব - পরিমন্ডল উভয় সাহিত্যেই প্রায় একরূপ । বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বিশিষ্ট নাটককে আদর্শ করে অসমীয়া সাহিত্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক রচিত হয়েছে । অনেক সময় শুধু বিষয় বস্তু নয় , তাদের চরিত্রগত সাদৃশ্যও লক্ষ্য করার মত । আমরা যথাস্থানে তা' বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি । এখানে তেমন কয়েকটি নাটকের নাম উল্লেখ করছি । তুলনীয় অসমীয়া হেমচন্দ্র বরুয়ার 'কানীয়া কীর্তন' ও বাঙালী রামনারায়ণ তর্করত্নের'কুলীনকুল সর্বস্ব', গুণাভিরাম বরুয়ার 'রামনবমী' ও উমেশ - চন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ', ঘনকান্ত বরুয়ার 'উষা' ও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা', নবীনচন্দ্র বরদলৈর 'গৃহলক্ষ্মী' ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের'প্রফুল্ল'। আমরা লক্ষ্য

করেছি, পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার 'জয়মতী' এবং 'সাধনী' ঐতিহাসিক নাটক হলেও গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক 'নলদময়ন্তীর' সঙ্গে তাদের নানা বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। গৈরিশ ছন্দের প্রভাবের কথা তো আগেই বলা হয়েছে । আমরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি , লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'চক্রধ্বজ সিংহ', 'জয়মতী কুঁয়রী', 'বেলিমার' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকে বাঙালী নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পতন', 'রাণা - প্রতাপসিংহ', 'সাজাহান' নাটকের লক্ষণীয় প্রভাব পড়েছে । এই প্রভাব প্রধানত স্বদেশের অতীত গৌরবের অনুধ্যানে , নাট্যপরিস্থিতি রচনায়, সংলাপ ও সঙ্গীত প্রয়োগে , কতকটা চরিত্রসৃষ্টিতেও । নকুলচন্দ্র ভূঞার 'চন্দ্রকান্ত সিংহ' এবং প্রসন্নলাল চৌধুরীর 'নীলাম্বর' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের প্রভাব পড়েছে । বিশেষ করে প্রসন্নলাল প্রায় দ্বিজেন্দ্রলালের রীতিতে ঘটনা - জটিলতা সৃষ্টি করেছেন । চন্দ্রধর বরুয়ার 'মেঘনাদবধ' নাটকটি উল্লেখ্য এই কারণে যে তা' বাঙালী কবি মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র শুধু অসমীয়া নাট্যরূপই নয় , এতে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও নামধাতু প্রয়োগের অনুসৃতি যেমন আছে , তেমনি আছে অনেক ক্ষেত্রে মধু কবির প্রকাশ ভঙ্গির এবং চরিত্রচিত্রণের অনুসৃতি । আমরা জানি, বাংলায় গিরিশচন্দ্র 'মেঘনাদবধ কাব্যের' নাট্যরূপ দিয়েছিলেন । এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্র চন্দ্রধর বরুয়ার আদর্শ হতে পারেন ।

উপন্যাস :– বাংলা সাহিত্যে যথার্থ উপন্যাসের সূচনা ও পরিপুষ্টি হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে । পাশ্চাত্য উপন্যাস ও রোমান্সের প্রভাবে বঙ্কিচন্দ্র সর্বপ্রথম বাংলা উপন্যাসের কায়া নির্মাণ ও কান্তিবিধান করেন । উপন্যাস - রচয়িতার পক্ষে প্রয়োজন মানবজীবনের অতল অপার রহস্যের প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও নরনারীর জীবন - জটিলতার আবরণ উন্মোচনের ক্ষমতা । এ সমস্ত গুণ তো বঙ্কিমচন্দ্রের ছিলই, তা ছাড়া ছিল বিশেষ দেশকালের পট-ভূমিকায় নরনারী চরিত্র অঙ্কন করলেও তাতে সর্বকালের মানুষের ছবি ফুটিয়ে তোলার দক্ষতা । বঙ্কিমচন্দ্রকে আদর্শ করে কেবল বাংলা নয় , অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার অনেক কথা সাহিত্যিকই উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন, কেউ কেউ সাফল্যও অর্জন করেছেন। আসামের বেশ কয়েকজন কথাসাহিত্যিকও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কাহিনীগঠন এবং নানা আঙ্গিক পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়াস পেয়েছেন । এঁরা হলেন পদ্মনাথ গোহাঞি বড়ুয়া , রজনীকান্ত বরদলৈ, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া , হিতেশ্বর বরবরুয়া, হরিনারায়ণ দত্ত বরুয়া , শরৎচন্দ্র গোস্বামী, চন্দ্রধর বরুয়া প্রভৃতি । এঁদের মধ্যে রজনী কান্ত –

বরদলৈ - ই যথার্থ উপন্যাস রচনা ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন । বঙ্কিমের উল্লিখিত গুণাবলীর কিছু কিছু রজনীকান্তেরও ছিল, তাই এই কথা সাহিত্যিক বঙ্কিমের অনুসৃতিতে অনেকটা সক্ষম হয়েছেন তাঁর 'মনোমতী', 'দন্দুয়া দ্রোহ', 'রঙ্গিনী', 'নির্মলভকত', 'তাম্রেশ্বরীর মন্দির' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসে । রজনীকান্ত ছাড়া আর যে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের অনুসরণে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তিনি 'ভানুমতী' ও 'লাহরী' রচয়িতা পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস 'পদম কুঁয়রী' বঙ্কিমের আদর্শে রচনা করলেও ততটা সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি । অন্যান্যদের প্রয়াসে দেখা যায়, তাঁরা বঙ্কিম - উপন্যাসের বহিরঙ্গ রূপাঙ্গিক নিয়েছেন সত্য, কিন্তু বঙ্কিমের মত ঘটনা ও চরিত্রের গভীরে ডুব দিতে পারেন নি । তবু বঙ্কিমানুসৃতি অসমীয়া উপন্যাসকে দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হবে । এ ছাড়া দৈবচন্দ্র তালুকদারের সামাজিক উপন্যাস 'আগ্নেয়গিরি' ও 'বিদ্রোহী'র কাহিনীগঠনে বঙ্কিম - সমসাময়িক রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' ও 'সমাজ' উপন্যাসের প্রভাব কৌতূহলী পাঠকের চোখে পড়বে ।

বঙ্কিম-পরবর্তী বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলার মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের মানুষের সুখদুঃখ ভরা জীবন কাহিনী দরদ ও সহানুভূতি দিয়ে ফুটিয়ে তুলে শুধু বাংলায় নয়, বাংলার বাইরেও প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন । আপাত দৃষ্টিতে নিন্দনীয় চরিত্র সমূহও তাঁর মানবিক দৃষ্টির রস প্রসাদে উজ্বল হয়ে উঠেছে । এই ঔপন্যাসিকের রচনা দ্বারা যে কয়জন অসমীয়া লেখক প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে হরেশ্বর শর্মা বরুয়া, নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য, স্নেহলতা বরুয়া, চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানী, দৈবচন্দ্র তালুকদারের নাম উল্লেখযোগ্য । এঁরা শরৎচন্দ্রের মানবিক সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি টুকু হয়ত বা নিতে পেরেছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের ব্যাপক ও গভীর জীবন অভিজ্ঞতা, সামাজিক নরনারীর দ্বন্দ্ব সঙ্কুল জীবনের নিপুণ বিশ্লেষণক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারেননি । আর সম্ভবত রবীন্দ্র - নাটকের মত রবীন্দ্র - উপন্যাসও তার দুরবগাহিতার জন্য অনুকরণ বা অনুসরণের পরিধি থেকে দূরে রয়ে গেছে । আলোচনা কালে আমরা দু' একটি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের ক্ষীণ প্রভাব লক্ষ্য করেছি যা তেমন উল্লেখ্য নয় ।

ছোটগল্প :– একথা অনস্বীকার্য যে বাংলা ছোটগল্প খুবই সমৃদ্ধ । যথার্থ বাংলা ছোটগল্পের প্রথম স্রষ্টা ও সার্থক শিল্পী অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ, তথাপি তাঁর পরে বহু কৃতী ছোটগল্প রচয়িতার অসংখ্য ছোটগল্পে বাংলা সাহিত্য ভরে উঠেছে । তাদের বিষয় বৈচিত্র , রসোৎকর্ষ এবং শিল্প নৈপুণ্য প্রশংসার দাবী রাখে । আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, অসমীয়া কাব্য, নাটক, উপন্যাস সংখ্যায় এবং বৈচিত্র্যে যেমন উল্লেখ্য , তেমনি তাদের রচয়িতার সংখ্যাও কম নয় । কিন্তু সেই তুলনায় অসমীয়া ছোটগল্প ততটা সমৃদ্ধ নয়, তার রচয়িতার সংখ্যাও বেশ সীমিত । লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াই প্রকৃতপক্ষে অসমীয়া ছোটগল্পের স্রষ্টা এবং তিনিই কৃতী শিল্পী । বলাবাহুল্য, অসমীয়া ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই সর্বাধিক । আর স্বয়ং বেজবরুয়ার ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ব্যাপক প্রভাব তো সুস্পষ্ট । যেমন – তাঁর 'পীতা', 'বাপিরাম', 'লাওখোলা', 'ডাক্তর বাবুর সাধু', 'রতনমুণ্ডা' 'মুক্তি' গল্পে যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'কঙ্কাল', 'মণিহারা', 'পোস্টমাস্টার', 'ছুটি' গল্পের প্রভাব কৌতূহলী পাঠকের অবশ্যই চোখে পড়বে । এ ছাড়া বেজবরুয়ার দু' একটি ছোটগল্পে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলা - কান্তীয় রঙ্গরসের প্রভাব রয়েছে । মনে হয়, এই প্রভাবই তাঁকে পরে অসমীয়া সাহিত্যে রঙ্গরসপূর্ণ রম্যরচনার শ্রেষ্ঠ রচয়িতা রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে ।

অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম ছোটগল্প রচয়িতা নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর 'অমর তাবিজ' গল্পে রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্পের প্রভাব স্বীকার করতে হয় । শরৎচন্দ্র গোস্বামীর 'ব্রহ্মপুত্রর বুকত' গল্পে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' ও 'পয়লানম্বর' গল্পের ছাপ রয়েছে মনে হয় । তাঁর 'রক্তবীজ' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের 'ব্যবধান' গল্পকে স্মরণ করিয়ে দেয় । সূর্যকুমার ভুঞার 'শিলান্ হয় ফুল' গল্পে রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পের প্রভাব উল্লেখ্য । যেমন –নবীনচন্দ্র বরদলৈর 'ভাই' গল্পে শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' গল্পের এবং শরৎচন্দ্র গোস্বামীর 'সামান্য প্রাণী' গল্পে শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের ছাপ চোখে পড়ে । একথা সত্য যে বেজবরুয়া যুগে অসমীয়া ছোটগল্প অনুকৃতির সীমা উত্তীর্ণ হতে পারেনি । তার সমৃদ্ধি সূচিত হয় বেজবরুয়ার পরবর্তীকালে ।

রসরচনাঃ- বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের মত রস সাহিত্য সৃষ্টিতেও বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষতা তুলনাহীন। বঙ্কিম ছিলেন বাংলার তদানীন্তন বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রধান পুরুষ। সমাজ জাতি ও দেশ সম্পর্কে তাঁর গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণ তিনি শুধু নানাবিধ প্রবন্ধেই ব্যক্ত করেননি, রঙ্গব্যঙ্গের মধ্য দিয়েও তা রমনীয় করে প্রকাশ করেছেন, এবং রস সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারাই তিনি সৃষ্টি করলেন। সেই হিসাবে তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাংলা সাহিত্যে অমর সৃষ্টি। এই অমর রসসাহিত্য দ্বারা অসমীয়া সাহিত্যে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া সবিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে- অসমীয়া সাহিত্যে বেজবরুয়া যুগে রসসাহিত্য স্রষ্টারূপে একমাত্র উল্লেখ্য স্বয়ং বেজবরুয়াই। এই পথে তখন আর বিশেষ কেউ অগ্রসর হননি। বেজবরুয়ার 'কৃপাবর বরবরুয়া চরিত্রের আদর্শই হলো বঙ্কিমের 'কমলাকান্ত। কমলাকান্তের যেমন 'দপ্তর', কৃপাবর বরবরুয়ার তেমনি 'কাকতর টোপোলা' ও 'ওভোতনি'। এগুলির প্রকাশ ভঙ্গিতে, বাকচাতুর্যে, শ্লেষবিদ্রূপে, সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতি উদ্ঘাটন প্রভৃতি পদে পদে 'কমলাকান্তের দপ্তরের প্রভাব সুস্পষ্ট চোখে পড়ে। আমরা বিস্তৃত আলোচনায় তা তুলে ধরেছি। বলাবাহুল্য, এ বিষয়ে বেজবরুয়াকে অবশ্যই বঙ্কিমের সমকক্ষ বলা যাবে না। বঙ্কিমের বিদ্রূপের দীপ্তি আরো শাণিত, চিন্তা ও বিশ্লেষণ আরো গভীর, রসসৃষ্টি আরো সূক্ষ্ম ও উপভোগ্য। তবু অসমীয়া রসরচনা সৃষ্টিতে বেজবরুয়া অনন্য। সেখানে তিনিই প্রথম স্রষ্টা ও কৃতী শিল্পী । তাঁর এই কৃতিত্বে আদর্শ জুগিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্র।

এই সুদীর্ঘ প্রভাব- আলোচনা অনুসরণের সময় মনে রাখতে হবে—ভিন্ন কোন সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া কোন সাহিত্যের পক্ষে অগৌরবের ব্যাপার নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে উত্তমর্ণ- অধমর্ণের প্রশ্নই আসেনা। সজীব প্রাণবন্ত কোন সাহিত্যই শুধু প্রভাব গ্রহণ ও তার স্বীকরণে সক্ষম হয়। এও একটি বিশেষ ক্ষমতা। পৃথিবীর কোন সাহিত্যই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। ইংরেজী অত্যন্ত সমৃদ্ধ ভাষা, এই ভাষায় সাহিত্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন বিশ্ববরেণ্য বহু সারস্বত সাধক। এই ইংরেজী সাহিত্যে গ্রীক ল্যাটিন ও ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব কী কম ? শেক্সপীয়ার কীডের দ্বারা, কীড সেনেকার দ্বারা প্রভাবিত। সেজন্য শেক্সপীয়ার হেয় নন, কীড ও হেয় নন।

মধুসূদন পাশ্চাত্য সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত না হলে বাংলায় 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা সম্ভব হত কী ? রবীন্দ্রনাথেও পাশ্চাত্য প্রভাব রয়েছে, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত মহাকবি কালিদাস দ্বারা বিপুল ভাবে প্রভাবিত । বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে এত গুলো মহৎ উপন্যাস সৃষ্টি করে গিয়েছেন ।

এসব কথা বলার উদ্দেশ্য —প্রভাব হেয় বাচক শব্দ নয়, তা সাহিত্যকে উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় । অসমীয়া সাহিত্য আজ যে এতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে তার মূলে বহুবিধ প্রভাবের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । তবে এই প্রভাবের প্রবাহ কেবল বাংলা সাহিত্য থেকে আসেনি , এসেছে পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকেও । বিশ্বের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ আধুনিক চিন্তাধারাই নবজাগৃতির যুগে বাংলা সাহিত্যে এসেছে ইংরেজী সাহিত্য মারফৎ ।সেই আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে অসমীয়া লেখকরাও পরিচিত হয়েছিলেন দুইভাবে — এক, প্রত্যক্ষ ভাবে ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করে , দুই, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচিতির মাধ্যমে । এই পরিচিতি কী ভাবে ঘনিষ্ঠ হলো তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি । তাতে দেখেছি — [redacted] অসমীয়া সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব ছিল অনিবার্য । বাংলা ইংরেজ শাসকের অধীনে আসে আসামের অনেক আগে , এবং ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষারও প্রসার বাংলায় হয় আসামের অনেক আগেই । ভৌগোলিক অবস্থান , আচার- আচরণ , সামাজিক - রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক ভাবধারা প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা ও আসামের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে সাদৃশ্য রয়েছে । দীর্ঘকাল বাঙালী ও অসমীয়া সহ - অবস্থান করায় একে অপরের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে । আসামের বাঙালীরা বিহুগান শুনলে অত্যুৎ- সাহেই আনন্দিত হয়ে উঠে । আবার এমন অসমীয়া লেখক নেই যিনি মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র , রবীন্দ্রনাথ , নজরুল পড়ে মুগ্ধ হন নি । মূল কথা , এই দু'টি ভাষাভাষীর মধ্যে দেওয়ানেওয়ার ভাবটা এত বেশী যে তা অন্য কোনো প্রান্তীয় ভাষার মধ্যে বিরল । বাংলা সাহিত্যের প্রভাব অসমীয়া সাহিত্যে পড়েছে এবং তা অসমীয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে , একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই । যদি অস্বীকার করা হয় , তবে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া , হেমচন্দ্র বরুয়া , গুণাভিরাম - বরুয়া , হিতেশ্বর বরবরুয়া , নলিনীবালা দেবী , রত্নকান্ত বরকাকতি , রজনী - কান্ত বরদলৈ , পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া , চন্দ্রধর বরুয়া প্রমুখ অসমীয়া স্ব

সারস্বত সাধকদের অসমীয়া সাহিত্য থেকে বাদ দিতে হয়, অথচ তাঁরাই তো আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যকে গড়ে তুলেছেন, বিশ্বের অপরাপর সাহিত্যের সম মর্যাদায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই প্রতিষ্ঠা-যজ্ঞে তাঁরা সজ্ঞানে সোৎসাহে সমিধ আহরণ করেছেন অন্যান্য সাহিত্য থেকে। প্রতিবেশী প্রদেশের সাহিত্য থেকে যদি তাঁরা অধিক পরিমাণে প্রেরণা পেয়ে থাকেন, তবে বুঝতে হবে – সেই সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ তাঁদের কতটা আন্তরিক ছিল, তার অভিনিবেশ পূর্ণ অধ্যয়নই বা কত গভীর ছিল।

উল্লেখ্য এই যে যতই দিন যাচ্ছে, ততই অসমীয়া সাহিত্যের উপর বাংলা সাহিত্যের প্রভাব তুলনা মূলক ভাবে হ্রাস পাচ্ছে, এটা সুলক্ষণ। ইতিমধ্যে আসামে আধুনিক শিক্ষার প্রভূত প্রসার হয়েছে, বহু উচ্চ শিক্ষিত কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে, যাঁরা আধুনিক বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গণে পাদ চারণা করেছেন। তাঁরা উত্তর – বৈষ্ণবযুগের অসমীয়া সাহিত্যকে বিচিত্র ভাবরসে পুষ্ট করে তুলেছেন, সে পুষ্টিতে বাংলা সাহিত্যের চাইতেও বেশী সহায়তা করে চলেছে পাশ্চাত্য সাহিত্য। বহিঃপ্রভাব অনেক সময় প্রতিভাশালীদের মৌলিক রচনায় প্রেরণা দেয়, এবং তখনই ঐ প্রভাব থেকে সত্যিকারের ফল প্রাপ্তি ঘটে। কীটসের প্রথম দিকের রচনায় ছিল স্পেন্সারের প্রভাব, তার পর প্রকাশিত হল তাঁর স্বকীয় সৃষ্টি **Endimion**, মধুসূদন মিলটনের ভক্ত পাঠক, লিখলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য', তখন খুঁজে পেলেন নিজেকে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনায় ছিল বিহারীলালের প্রভাব, 'প্রভাত সঙ্গীতে' এসে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে খুঁজে পেলেন। রবীন্দ্রচ্ছায়ায় লালিত হয়ে নজরুল সাহিত্য রচনা করেন, কিন্তু 'বিদ্রোহী' রচনার মধ্যেই তিনি নিজেকে আবিষ্কার করলেন। 'বন্দীর বন্দনা'র পূর্বেও বুদ্ধদেব কবিতা লিখেছেন, সে কবিতা রবীন্দ্রচ্ছায়া থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু 'বন্দীর বন্দনা'তেই তিনি নিজের শক্তি সম্মুখে অবহিত হন।

বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অবদান অনস্বীকার্য।

অসমীয়া সাহিত্যের ক্রমবিকাশেও পাশ্চাত্য সাহিত্যের অবদান কম নয় । তবে মনে রাখতে হবে , ঐ প্রভাবও এসেছে বহুক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের মারফৎ । সুখের বিষয় , অসমীয়া সাহিত্যের প্রায় সমস্ত সুধী সারস্বত সাধকই তা অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করেছেন । লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া , রজনীকান্ত বরদলৈ , রত্নকান্ত বর কাকতি, ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা , ডঃ মহেশ্বর নেওগের উক্তি সমূহ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । অসমীয়া সাহিত্য এখন যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে । ভবিষ্যতে এই সাহিত্যেও একদিন বিশ্বসাহিত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সন্দেহ নেই এবং তত্রও এই সাহিত্যের পরিপুষ্টিতে বাংলা সাহিত্যের অবদানও স্মরণীয় হয়ে থাকবে , আশা করা যায় ।

পরিশিষ্ট — (ক)

আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত অসমীয়া গ্রন্থের তালিকা।

অতুলচন্দ্র হাজরিকা	—	নরকাসুর (১৯২৮), দাতাকর্ণ (১৯২৯), নন্দদুলাল (১৯৩০), বেউলা (১৯৩৩), কুরুক্ষেত্র (১৯৩৬), শ্রীরামচন্দ্র (১৯৩৮), সাবিত্রী (১৯৩৯)।
অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী	—	জয়দ্রথ বধ (১৯১১), অনুভূতি (১৯১৪), তুমি (১৯১৫), বীণা (১৯১৬)।
আনন্দ চন্দ্র আগরয়ালা	—	জিলিকনি (১৯২০)।
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	—	চিন্তানল (আগছোয়া) (১৮৯০), শেহছোয়া — (১৯২২)।
গুণাভিরাম বরুয়া	—	রামনবমী (১৮৫৭)।
ঘনকান্ত বরুয়া (?)	—	উষা (?)
চন্দ্রকুমার আগরয়ালা	—	প্রতিমা (১৯১৪), বীণ বরাগী (১৯২৩)।
চন্দ্রধর বরুয়া	—	মেঘনাদবধ (১৯০৪), ভাগ্য পরীক্ষা (১৯১৬), রঞ্জন (১৯২৭), তিলোত্তমাসম্ভব (১৯২৯), রাজর্ষি (১৯৩৭), বিদ্যুৎবিকাশ (১৯৩৮), শান্তি, আহোম সন্ধ্যা (রচনা ১৯৩৬), মোগল বিজয় (রচনা ১৯৩৬), বিয়াবিনৈ (রচনা ১৯২৯), ১৯৭৫ খৃঃ চন্দ্রধর বরুয়া গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হয়।
চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানী	—	পিতৃভিটা (১৯৩৭)।
চিন্তাহরণ পাটগিরি	—	সংসারচিত্র (১৯২১)।
জ্যোতি প্রসাদ আগরয়ালা	—	শোণিত কুঁয়রী (১৯২৫), কারেঙর লিগিরী (১৯৩০)।

দুর্গেশ্বর শর্মা — পার্থ পরাজয় (১৯০৬), বালিবধ (১৯০৮)।

দেবনাথ বরদলৈ — বৈদেহী বিচ্ছেদ (১৯০১)।

দৈবচন্দ্র তালুকদার — ধুমুলী কুঁমুলী (১৯২২), আগ্নেয়গিরি (১৯২৪), বিদ্রোহী (১৯৩১), অপূর্ণ (১৯৩১ - ৩২ খৃঃ আবাহন পত্রিকায় প্রকাশিত), আদর্শ পীঠ — (চতুর্থ দশকে রচিত)।

নকুল চন্দ্র ভূঞা — জেরেঙার সতী (১৯২৪), বদন বর ফুকন (১৯২৭), চন্দ্রকান্ত সিংহ (১৯৩১), স্বয়ংবরা (১৯৩২)।

নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী — নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর গল্প (১৯২৯—১৯৩৩-র মধ্যে রচিত, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৬৩ খৃঃ)।

নবীনচন্দ্র বরদলৈ — গৃহলক্ষ্মী (১৯১১), কৃষ্ণলীলা (১৯৩৩), তীর্থযাত্রী (১৯৫১), প্ৰেম ভাই, শেয়ালি [বরদলৈ রচনাবলীতে (১৯৭৫) প্রকাশ]।

নবীন চন্দ্র ভট্টাচার্য — চন্দ্রপ্রভা (১৯০৮)।

নলিনী বালা দেবী — সন্ধিয়ার সুর (১৯২৮), সপোনর সুর (১৯৪৩), পরশমণি (১৯৫৪), যুগদেবতা (১৯৫৮), অলকানন্দা (১৯৬৭)।

পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া — ভানুমতী (১৮৯২), লাহরী (১৮৯২), জয়মতী (১৯০০), জুরণি (১৯০০), লীলা (১৯০১), ফুলর চানেকি (১৯০১), সাধনী (১৯১১), লাচিত বরফুকন (১৯১৫)।

পদ্মাবতী দেবী ফুকননী — সুধর্মার উপাখ্যান (১৮৮৪)।

পূর্ণকান্ত দেবশর্মা (?)	—	হরিশ্চন্দ্র নাটক (১৮৯৩), হরধনুভঙ্গ বা সীতাস্বয়ংবর (১৮৯৩)।
প্রসন্নলাল চৌধুরী	—	নীলাম্বর (১৯০৩), [illegible]XX অগ্নিমন্ত্র (১৯৫২)।
বিনন্দ চন্দ্র বরুয়া	--	শঙ্খধ্বনি (১৯২৫), প্রতিধ্বনি (১৯০৮)।
বেণুধর রাজখোয়া	—	দরবার (১৯০২), কুরিশতিকার সভ্যতা (১৯০৮), অশিক্ষিতা মৈনী (১৯১২), তিনি মৈনী (১৯২৮), চোরর সৃষ্টি (১৯০১)।
ভবানন্দ দত্ত	—	'কবিতার কাহিনী' (১৯৬৯) গ্রন্থে উদ্ধৃত কতিপয় কবিতা।
ভৈরবচন্দ্র খাটনীয়ার	—	সেবা (১৯২৭)।
ভোলা নাথ দাস	—	কবিতা মালা (আগছোয়া – ১৮৮২, শেহছোয়া – ১৮৮৩), চিন্তাতরঙ্গিনী (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড – ১৮৮৪), সীতাহরণ(১৯০২)।
মফিজুদ্দিন আহমদ হাজরিকা — [illegible] মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজরিকা	—	জ্ঞানমালিনী (১৮৯৬), তত্ত্বপারিজাত, সান – মিহলি [মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজরিকা রচনাবলীতে (১৯৭০) প্রকাশ]।
মহেশ্বর নেওগ	—	সম্পাদিত অসমীয়া কবিতার সংকলন সঞ্চয়ন (১৯৫৯)।

রঘুনাথ চৌধুরী — সাদরী (১৯১০), কেতেকী (১৯১৮), কারবালা (১৯২৩), দহিকতরা (১৯৩১), নবমল্লিকা (১৯৫৮)।

রজনীকান্ত বরদলৈ — মিরিজীয়রী (১৮৯৬), মনোমতী (১৯০০), দন্দুয়া দ্রোহ (১৯০৯), রঙ্গিলী (১৯২৫), রাধারুক্মিনীর রণ (১৯২৫), নির্মল ভকত (১৯২৬), তাম্রেশ্বরীর মন্দির (১৯২৬), রহদৈ লিগিরী (১৯৩০)।

রত্নকান্ত বরকাকতী — সেয়ালি (১৯৩২), তর্পণ (১৯৫৩), চন্দ্রহার (১৯৬৩)।

রমাকান্ত চৌধুরী — অভিমন্যু বধ (১৮৭৫)।

রুদ্ররাম বরদলৈ — বঙাল বঙালনী (১৮৭১)।

রেভারেন্ড গার্নি — কামিনীকান্ত (১৮৪৭), এলোকেশী বেশ্যার কথা (১৮৭৭)।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া — জয়মতী কুঁয়রী (১৯০০), কৃপাবর বরুয়ার কাকতর টোপোলা (১৯০৪), পদুম কুঁয়রী (১৯০৫), সুরভি (১৯০৯) কৃপাবর বরুয়ার ওভোতনি (১৯০৯), সাধু কথার কুকি (১৯১০), দেবযানী (১৯১১), জোনবিরি (১৯১৩), কদমকলি (১৯১৩), বেলিমার (১৯১৫), চক্রধ্বজ সিংহ (১৯১৫), পদুমকলি (১৯২৩), কৃপাবর বরুয়ার ভাবর বুরবুরণি (১ম ভাগ – ১৯৫১, ২য় ভাগ–

২য় ভাগ — ১৯৬৮-/ ৬৯), বরবরুয়ার চিন্তার শিলগুটি , সাহিত্যিক রহস্য , বর বরুয়ার বুলনি (১৯৬৮ /-৬৯ খৃঃ বেজবরুয়ার রচনাবলীর শত বার্ষিকী সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত) ।

শরৎচন্দ্র গোস্বামী — গল্পাঞ্জলি (১৯১৪) , যমুনা (১৯২০) , বাজিকর (১৯৩০) , পাপিপথ (১৯৩৩) ।

সূর্যকুমার ভূঞা — জয়মতী উপাখ্যান (১৯২০) ,।

স্নেহলতা বরুয়া — বীণা (১৯২৬) ।

হরিনারায়ণ দত্ত বরুয়া — চিত্রদর্শন (১৯৩১) ।

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন — আসাম বুঞ্জি (১৮২৯) ।

হরেশ্বর শর্মাবরুয়া — কুসুম কুমারী (১৯৩৫) ।

হানা ক্যাথারিন মুলেন্স — ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (১৮৫২) ((অসমীয়া অনুবাদ করেন শ্রীমতী রেভারেন্ড গার্নি) ।

হিতেশ্বর বর বরুয়া — ঢোপাকলি (১৯০২) , কমতাপুর ধ্বংস বা সাদরী (১৯১২) , বিরহিনী বিলাপ কাব্য (১৯১২), তিরুতার আত্মদান (১৯১৩) , মালিতা (১৯১৪) , আভাস কাব্য (১৯১৪) , যুদ্ধক্ষেত্রত আহোম রমণী বা মূলা গাভরু কাব্য (১৯১৫), ভেচডিমোনা কাব্য (১৯১৭) , মালচ (১৯১৮) , চকুলো (১৯১২) ।

হেমচন্দ্র গোস্বামী — ফুলর প্রথেমর চানেকি (১৯০৭)।

হেমচন্দ্র বরুয়া — কানীয়ার কীর্তন (১৮৬১), আদিপাঠ(?) (১৮৭৩)
বাহিরে রং চং ভিতরে কোয়া ভাতুরী (১৮৭৬),
হেমকোষ (১৯০০)।

পরিশিষ্ট (খ)

আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা ।

অতুল প্রসাদ সেন —	কয়েকটি গান (১৯০৪) ।
অমৃত লাল বসু —	বিবাহ বিভ্রাট (১৮৮৪), হরিশ্চন্দ্র (১৮৯১)।
অক্ষয় কুমার বড়াল —	এষা (১৯১২) ।
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচুঠাকুর বা পঞ্চানন্দ) —	কল্পতরু (১৮৭৪), ভারত উদ্ধার (১৮৭৭) ।
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত —	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা (১৯ শ শতাব্দীর মধ্যভাগ)
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর —	বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), বোধোদয় (১৮৫১), সীতার বনবাস (১৮৬০) ।
উমেশ চন্দ্র মিত্র —	বিধবা বিবাহ (১৮৫৬) ।
কাশীরাম দাস —	কাশীদাসী মহাভারত (১৭ শ শতাব্দী) ।
ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যা বিনোদ —	আলিবাবা (১৮৯৭) ।
কৃত্তিবাস —	রামায়ণ পাঁচালী (আনুমানিক ১৫ শ শতাব্দী) ।
গিরিশ চন্দ্র ঘোষ —	অভিমন্যু বধ (১৮৮১), নল দময়ন্তী (১৮৮৩), প্রফুল্ল (১৮৮৯), সিরাজ — উদ্দৌলা (১৯০৬) ।
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় —	স্বর্ণলতা (১৮৭৪) ।
তারাচরণ শিকদার —	ভদ্রার্জুন (১৮৫২) ।
তারানাথ চক্রবর্তী —	বেউলা (?) ।

দ্বিজেন্দ্র লাল রায় — হাসির গান (১৯০০), প্রতাপ সিংহ (১৯০৫), মেবার পতন (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১)।

দীনবন্ধু মিত্র — বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৬), জামাই বারিক (১৮৭২)।

দেবেন্দ্র নাথ সেন — অশোক গুচ্ছ (১৯০০), গোলাপ গুচ্ছ (১৯১২)।

~~নজরুল ইসলাম~~
নজরুল ইসলাম — অগ্নিবীণা (১৯২২), বিষের বাঁশী (১৩৩১), সঞ্চিতা (দশমসং আষাঢ় ১৩৬৪)।

নবীন চন্দ্র সেন — পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫), রৈবতক (১৮৮৭), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩), প্রভাস (১৮৯৬)।

নারায়ণ দেব — পদ্মপুরাণ (আনুমানিক ১৫ শ শতাব্দী)।

প্যারিচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর — আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮), মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায় (১৮৫৯), রামারঞ্জিকা (১৮৬১), অভেদী (১৮৭১), আধ্যাত্মিকা (১৮৮০)।

প্রমথ নাথ শর্মা (ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) — নববাবু বিলাস (১৮২৩)।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — দুর্গেশ নন্দিনী (১৮৬৫), কপাল কুণ্ডলা * (১৮৬৬), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫),

রজনী (১৮৭৭), কৃষ্ণকান্তের উইল(১৮৭৮), আনন্দমঠ (১৮৮৪), [illegible] দেবী চৌধু-রানী (১৮৮৪), রাধারানী (১৮৮[illegible]), সীতারাম (১৮৮৭), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫)।

ভারতচন্দ্র রায় কবি
গুণাকর — অন্নদা মঙ্গল (১৭৫২)।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার — শিশুশিক্ষা (১৮৪৯)।

মধুসূদন দত্ত — তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য (১৮৬০), বুড়ো - শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০), মেঘনাদ বধ কাব্য (১৮৬১), ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১), বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২), চতুর্দশপদী কবিতা-বলী (১৮৬৬)।

যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত — কীর্তি বিলাস (১৮৫২)।

যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু — চিনিবাস চরিতামৃত (১৮৮৬), মডেল - ভগিনী (১৮৮৬), কালাচাঁদ (১৮৮৯)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), মানসী (১৮৯০), সোনারতরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালি (১৮৯৬), কথা (১৯০০), কাহিনী (১৯০০), নৈবেদ্য (১৯০১), কল্পনা-

ক্ষণিক কল্পনা (বাংলা ১৩০৭), গীতাঞ্জলি (১৯১৩), গীতিমাল্য (১৯১৪), বলাকা (১৯১৬), পুনশ্চ (১৯৩২), সঞ্চয়িতা (বাংলা ১৩৩৮), বিদায় অভিশাপ (১৩০০ শ্রাবণ), চোখের বালি (১৯০৩), গল্পগুচ্ছ (১৯২৬) সংকলিত গল্প গুলির প্রকাশ কাল আরও পূর্বে), গোরা (১৯১০), ঘরে-বাইরে (১৯১৬), শেষের কবিতা (১৯২৯) ।

রমেশ চন্দ্র দত্ত — সংসার (১৮৮৬), রাজপুত জীবন সন্ধ্যা (১৮৭৯), সমাজ (১৮৯৪) ।

রাজেন্দ্র লাল মিত্র সম্পাদিত -- বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১), রহস্য সন্দর্ভ (১৮৬৩) ।

রামনারায়ণ তর্করত্ন — কুলীনকুল সর্বস্ব (১৮৫৪) ।

রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী — গোসানী মঙ্গল (১৮২৫) ।

রাম প্রসাদ সেন — কালী কীর্তন (অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ) ।

শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত — সিরাজউদ্দৌলা (১৯৩৮) ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বড়দিদি (১৯১৩), রামের সুমতি (১৯১৪), পল্লীসমাজ (১৯১৬), দেবদাস (১৯১৭)। মহেশ (১৯২৬), পথের দাবী (১৯২৬) ।

সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত — তীর্থ সলিল (১৯০৮), তীর্থরেণু (১৯১০), কুহু ও কেকা (১৯১২) ।

হানা ক্যাথারিন ম্যুলেন্স — ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (১৮৫২) ।

৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯

গ্রন্থপঞ্জী

১। অতুল চন্দ্র বরুয়া – সাহিত্য জীবন । প্রথম সংস্করণ , ১৯৬৫ ।

২। অম্বিকা গিরি রায় চৌধুরী —'তুমি' । দ্বিতীয় সংস্করণ , ১৯৩১ ।

৩। অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ডঃ) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত , দ্বিতীয় সংস্করণ , ১৯৬৮ ।

৪। আশুতোষ ভট্টাচার্য (ডঃ) — বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস , ১ম খন্ড , তৃতীয় সংস্করণ , ১৯৬৮ ।

৫। গজেন্দ্র কুমার দেবরায় (ডঃ) এই দেশ আমার , প্রথম প্রকাশ , ১৯৭২ ।

৬। গুণাভিরাম বরুয়া —' রামনবমী নাটক' । অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত , ১৯৬৫ ।

৭। চন্দ্র প্রসাদ শইকীয়া (সম্পাদিত) – পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া । প্রথম প্রকাশ ২৬ নবেম্বর , ১৯৭১ ।

৮। জীবনানন্দ দাস — কবিতার কথা । প্রথম সংস্করণ , ১৩৬২ ।

৯। ত্রৈলোক্য নাথ গোস্বামী — আধুনিক অসমীয়া গল্প সাহিত্য । দ্বিতীয় প্রকাশ , ১৯৭২ ।

১০। দীনেশ্বর ভট্টাচার্য — অসমীয়া কাব্য সাহিত্য আরু জাতীয় জীবনত প্রগতি- বাদী চিন্তা । (প্রথম খন্ড) , ১৯৭২ ।

১১। দীপ্তি ত্রিপাঠী (ডঃ) — আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় । তৃতীয় সংস্করণ , ১৯৬৪ ।

১২। নগেন্দ্র নারায়ণ চোধুরী — নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর গল্প । সংগ্রহ ও সম্পাদনা — শ্রী হেমন্ত কুমার শর্মা । প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬৩ ।

১৩। নগেন শইকীয়া (সম্পাদিত) হিতেশ্বর বর বরুয়া স্মৃতিমালা ।১৯৭৬ ।

১৪। নলিনী বালা দেবী — অলকানন্দা । প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭ ।

১৫। নীহার রঞ্জন রায় (ড:) বাঙালীর ইতিহাস , আদিপর্ব , প্রথম খণ্ড ১৯৮০ ।

১৬। প্রমথ নাথ বিশী — রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ । ষষ্ঠ সংস্করণ । শ্রাবণ , ১৩৭০ ।

১৭। বাণী কান্ত কাকতী (ড:) — রঘুনাথ চৌধারীর 'দহিকতরা'র ভূমিকা । সপ্তম সংস্করণ , ১৮৮৪ শক । প্রথম প্রকাশ ১৯৩১ ।

১৮। বিশ্ব ভারতী পত্রিকা — শ্রাবণ - আশ্বিন , ১৩৭৫ ।

১৯। বুদ্ধদেব বসু — (ক) কালের পুতুল । প্রথম সংস্করণ , ১৩৫৩ ।

(খ) 'যতীন্দ্র সেন গুপ্ত' প্রবন্ধ , কবিতা পত্রিকা , আশ্বিন , ১৩৬১ ।

২০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাময়িক সাহিত্য । বিশ্বভারতী, ১৩৫১ ।

২১। ভট্ট নারায়ণ — বেণী সংহার । অধ্যাপক শ্রী কালী পদ দর্শনাচার্য কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ । দ্বিতীয় সংস্করণ , ১৩৬৪ ।

২২। ভবানন্দ দত্ত — অসমীয়া কবিতার কাহিনী । সেপ্টেম্বর , ১৯৬১ ।

২৩। মফিজুদ্দিন আহমদ হাজরিকা — রচনাবলী । ডক্টর আবদুস সাত্তার সম্পাদিত । ১৯৭০ ।

২৪। মহেশ্বর নেওগ (ড:) (ক) অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা । চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৪ ।

(খ) আধুনিক অসমীয়া অসমীয়া সাহিত্য । প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫ ।

(গ) 'সঞ্চয়ন' — অসমীয়া কবিতার সংকলন । প্রথম সংস্করণ , ১৯৫৯ । তৃতীয় মুদ্রণ , ১৯৬৭ ।

২৫। যজ্ঞেশ্বর শর্মা — রত্নকান্ত বরকাকতী রচিত 'সেয়ালি' কাব্যের পরিক্রমা । তৃতীয় সংস্করণ , ১৯৬২ ।

২৬। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর — (ক) রবীন্দ্র রচনাবলী ১২শ খণ্ড । বিঃভাঃ সংস্করণ । (খ) শিক্ষা (১৩১৫) (গ) আত্মপরিচয় (১৩৫৩ বাং)।

২৭। রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী — গোসানী মঙ্গল ।ডঃ নৃপেন্দ্র নাথ পাল সম্পাদিত । ১৯৭৮ ।

২৮। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া — মোর জীবন সোঁৱৰণ । বেজবরুয়া গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড । ১৯৬৮ । ৬১ ।

২৯। শশী শর্মা — রসরাজ বেজবরুয়া । ১৯৬৭ ।

৩০। শৈলেন ভরালী (ডঃ) অসমীয়া সাহিত্যর ঐতিহাসিক উপন্যাস । ১৮৯৬ শক ।

৩১। শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ডঃ) বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা । পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৬৫ ।

৩২। সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — দ্বিজেন্দ্র লালের 'সাজাহান' — এর ভূমিকা, ১৯৭৪ ।

৩৩। সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা (ডঃ) (ক) অসমীয়া উপন্যাসর ভূমিকা । ১৯৬৫ । (খ) অসমীয়া নাট্য সাহিত্য । তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭০ ।

৩৪। সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (ডঃ) — অসমীয়া সাহিত্য । ১৩৫৯ ।

৩৫। সুবোধ রঞ্জন রায় (ডঃ) — নবীন চন্দ্রের কবিকৃতি ।

৩৬। হরি প্রসাদ নেওগ (সম্পাদিত) — অলকানন্দা ।

৩৭। হরিচন্দ্র ভট্টাচার্য (ডঃ) — অসমীয়া নাট্য সাহিত্যর জিলিঙনি । প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৮।

৩৮। হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন — আসাম বুরঞ্জী (১৮২৯), অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১৩৬১ বাং ।

৩৯। হেমন্ত কুমার শর্মা (ডঃ)–অসমীয়া সাহিত্যত দৃষ্টিপাত । তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭২ ।

৪০। হোমেন বরগোহাঞি (সম্পাদিত) বিংশ শতাব্দীর অসমীয়া সাহিত্য । ১৯৬৭ ।

41. Birinchi K. Barua (dr.) --- History of Assamese Literature , 1964 .

42. Dim Dimbeswar Neog ----- New Light on the history of Assamese Literature , 1962 .

43. Gait E. A. (Sir) ----- History of Assam, 3rd Edition , 1963 .

44. Hem Barua ---- --- Assamese Literature , 1965.

45. S.K. Barpujari (Dr.) & A.C. Bhuyan (Dr.)_____ The Political History of Assam . Vol -- I, First Edition, 1977.

46. Sunity K. Chatterjee(Dr.)-Origin and Development of Bengali Language, Vol - I C.U. 1926.

47. Satyendra Nath Sarma (Dr.) Assamese Drama in a Brochure on Assamese Literature, 1965 .

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
LIBRARY
RAJARAMMOHUNPUR